আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১।	জা'আল হক (১)	মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী
২।	জা'আল হক (২)	"
৩।	সালতানাতে মুস্তাফা	"
৪।	আউলীয়া কিরামের ওসীলায় খোদার রহমত	"
৫।	দরসুল কুরআন	"
৬।	ইলমুল কুরআন	"
৭।	অপব্যাখ্যার জবাব	"
৮।	হযরত আমীরে মুয়াবীয়া (রাঃ)	"
৯।	ইসলামী জিন্দেগী	"
১০।	ঈমানের সঠিক বিশ্লেষণ	আলা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী
১১।	মাতা -পিতার হক	"
১২।	তাজিমী সিজদা	"
১৩।	পীর মুরীদ ও বায়আত	"
১৪।	বাহারে শরীয়ত	মুফ্‌তি মুহাম্মদ আমজাদ আলী
১৫।	কানুনে শরীয়ত	মুফ্‌তি শামসুদ্দীন আহমদ রিজভী
১৬।	কারবালা প্রান্তরে	আল্লামা শফি উকাড়বী
১৭।	যলযালা	আল্লামা আরশাদুল কাদেরী
১৮।	আমাদের প্রিয় নবী	আল্লামা আবেদ নিযামী
১৯।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (১)	আল্লামা আবুন নুর মুহাম্মদ বশীর
২০।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (২)	"
২১।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৩)	"
২২।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৪)	"
২৩।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৫)	"
২৪।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৬)	
২৫।	গ্রন্থ পরিচিতি	মুফ্‌তি আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী
২৬।	সাত মাসায়েলের সমাধান	হযরত এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী
২৭।	হামদে খোদা ও নাতে রসূল	মাওলানা মোহাম্মদ আলী
২৮।	খাজা গরীবে নেওয়াজ	মাওলানা আবদুর রশীদ
২৯।	মুমিন কে?	আল্লামা ড. তাহেরুল কাদেরী
৩০।	গাউসুল আযম	শাহ্‌ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী
৩১।	খুতবাতে ইবনে নাবাতা	হযরত আল্লামা ইবনে নাবাতা

মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ৬১৮৮৭৪

জা'আল হক ৩ মুহাম্মদী কুতুবখানা

প্রকাশনায় ঃ-
নিশান প্রকাশনী
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকালঃ ১৫ অক্টোবর, ২০০৬ ইং
২০১০ ইং

হাদিয়া- ২০০.০০

মুদ্রণেঃ
এনাম প্রিন্টার্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

www.AmarIslam.com

প্রকাশকের কথা

বাংশাদেশের অধিকাংশ মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী। মাযহাব সম্পর্কিত কোন মতভেদ এতদিন আমাদের দেশে ছিল না। ইদানিং আহলে হাদীস তথা লা-মাযহাবীদের কিছু অপতৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। যদিওবা তারা সংখ্যায় খুবই নগন্য, মধ্য প্রাচ্যের আর্থিক সাহায্যের কারণে তারা এখন মাথাছাড়া দিয়ে উঠেছে এবং চারিদিকে ব্যাপক অপপ্রচার শুরু করেছে। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতেও মাঝে মধ্যে তাদের চেহারা দেখা যায়। তারা প্রচার করে যে, তারা কুরআন হাদীসের অনুসারী, ব্যক্তি বিশেষের অনুসারী নয়। একটি মুখচেনা ইসলামের মুখোশধারী রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় এরা বেড়ে উঠেছে। এদের যাবতীয় কর্মকান্ড মাযহাববিরোধী ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পরিপন্থী।

এদের খপ্পর থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য এই প্রয়াস। এ গ্রন্থে লা-মাযহাবীদের আসল স্বরূপ উম্মোচন করা হয়েছে। সাথে সাথে আমাদের মাযহাব সম্পর্কে আরোপিত অপবাদের দাঁত ভাঙ্গা জবাবও দেয়া হয়েছে। পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহ:) বিরচিত "জা'আল হক" এর শেষাংশের অনুবাদ এটা। বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক অধ্যক্ষ মাওলানা নুরুল আলম খান এটা অনুবাদ করেন।আরবী প্রতি বর্ণায়নে গরমিল ও ভাষাগত কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও বিষয়বস্তু পরিষ্ফুটনে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। আশাকরি , যে কোন পাঠক মূল বক্তব্য অনুধাবনে সক্ষম হবে। আজকের এ ফিতনার যুগে গ্রন্থখানা প্রত্যেকের সংগ্রহে রাখা উচিত।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, "জা'আল হক" প্রথম ও দ্বিতীয়ের মত এটাও সুধী পাঠক সমাজের কাছে সমাদৃত হবে। লা-মাযহাবীদের মুকাবিলায় এ একটি গ্রন্থই যথেষ্ট।

প্রকাশক

www.AmarIslam.com

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

www.AmarIslam.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ	
ফজরের নামায ফর্সা হওয়ার পর পড়ুন	২২৯
এ মাসআলার ব্যাপারে আপত্তি ও জবাব	২৩৫
উনবিংশ অধ্যায়ঃ	
যোহর ঠান্ডা করে পড়ুন	২৪১
এ মাসআলার ব্যাপারে আপত্তি ও জবাব	২৪৫
বিংশ অধ্যায়ঃ	
আযান ও তাকবীরের শব্দাবলী	২৫০
এ মাসআলার উপর আপত্তি ও জবাব	২৫৭
একবিংশ অধ্যায়ঃ	
নফল নামায আদায়কারীর পেছনে ফরজ নামায আদায় করা	২৬২
এ মাসআলার বিপক্ষে আপত্তি ও জবাব	২৫৬
দ্বাবিংশ অধ্যায়ঃ	
রক্ত ও বমির দ্বারা অযূ ভেঙ্গে যায়	২৭০
এ মাসআলার ব্যাপারে আপত্তি ও জবাব	২৭৫
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ঃ	
নাপাক কূপ পাক করা	২৮০
কূপ নাপাক হওয়া প্রসঙ্গে	২৮০
এ মাসআলা সংক্রান্ত আপত্তি ও জবাব	২৮৫
উপসংহার	
তাকলীদের গুরুত্ব	২৯১
ওহাবী ও হাদীস	৩০৫
ইমামে আযম আবূ হানিফা (রাদ্বি:) এর প্রশংসাপূর্ণ মর্যাদার বিবরণ	৩১১

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ

দ্বিতীয় খন্ড (তৃতীয়াংশ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ

مُحَمَّدِنِ الْمُصْطَفٰى وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اُوْلِى الصِّدْقِ وَالصَّفَا

বর্তমান যুগ ফিতনা ফ্যাসাদের যুগ। কুফরী, খোদাদ্রোহী ও বিধর্মীদের তৎপরতার লু'হাওয়া বয়ে চলছে। লা-মাযহাবী ও বেদ্বীনরা নতুন নতুন ছদ্মবেশ ধারণ করে আবির্ভূত হচ্ছে। মুসলমানদের পক্ষে ঈমান রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তিই ঈমান সামলাতে সক্ষম হবে, যে আল্লাহর কোন মকবুল বান্দার চরণে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। এ সব ফিতনা সমূহের মধ্যে সব চেয়ে বিপজ্জনক ফিতনা হলো লা-মাযহাবীদের । বাহ্যতঃ এরা সুন্নতের বেশ ভূষা পরে সমাজের নিকট নিজেদের প্রকাশ করে থাকে। এরা 'আহলে হাদীস' নামে খ্যাত। এরা তাদের ছাড়া অন্যদেরকে মুশরিক মনে করে; ব্যক্তি তাক্বলীদকে শিরক বলে।

পরিতাপের বিষয় যে, হাদীস কী, সুন্নত কী, এ খবর যারা রাখেনা, যারা আরবী পড়তে অপারগ, তারা 'আমীন' বড় করে পড়া, রুকূ থেকে উঠার সময় দু'হাত কান পর্যন্ত উঠানোর ব্যাপারে দু'চারটি হাদীস মুখস্থ করে নিজেদেরকে ইমাম আবূ হানীফা (রাদ্বি:) হতেও বেশি বড় বলে মনে করে। অবশ্য আমি স্বীয় গ্রন্থ 'জা'আল হক্ব' প্রথম খন্ডে তাক্বলীদের মাসআলা ও ঐ গ্রন্থের শেষে সংযোজিত অংশে তারাবীহের নামায বিশ রাকআত হওয়া এবং তিন তালাকের মাসআলা সম্পর্কে বিস্তারিত ও বিশদ বিবরণসহ প্রত্যেকটা দিক ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছি। এই গ্রন্থের প্রথম খন্ড লেখার সময় প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে, আমি অতিসত্বর দ্বিতীয় খন্ড লেখার কাজে হাত দেব। দীর্ঘদিন হয়ে গেল, এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার সুযোগ হয়ে উঠেনি। অতঃপর বন্ধু-বান্ধবদের কেউ কেউ বার বার অনুরোধ করতে থাকে যে, দ্বিতীয় খন্ড লিখে গাইরে মোক্বাল্লিদ ওহাবীদের মতামতকে জোরালো ভাষায় খন্ডন করা হোক এবং হানাফীদের পক্ষ থেকে যুক্তি

www.AmarIslam.com

প্রমাণ সহকারে তাদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া হোক। তবে হ্যাঁ, আমার লেখা 'ফতোয়া নাঈমীয়া' গ্রন্থে ও আরবী নাঈমুল বারী' গ্রন্থের হাশিয়ায় গাইরে মুকাল্লিদদের বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা করেছি বিধায় আলাদা কিতাব লেখার প্রয়োজন মনে করিনি। কিন্তু মুরব্বীদের তরফ হতে উক্ত মাসআলার উপর উর্দুতে কিতাব লেখার আদেশ বারবার আসতেই থাকে। তাই আল্লাহর উপর ভরসা করে এ দিকে মনোনিবেশ করা হলো।

এই দ্বিতীয় খন্ডের লেখার নিয়ম পদ্ধতি প্রথম খন্ডের অনুরূপই রইল। অর্থাৎ প্রতি মাসআলার জন্যে আলাদা অধ্যায় থাকবে। আর প্রত্যেক অধ্যায়ের দু'টি পরিচ্ছেদ থাকবে। প্রথম পরিচ্ছেদে হানাফীদের যুক্তি প্রমাণসমূহ থাকবে আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্থান পাবে গাইরে মোকাল্লিদদের প্রশ্নাবলী ও তার জবাব।

গাইরে মোকাল্লিদদের একটি কু অভ্যাস হলো, যে সব হাদীস তাদের মতের বিরোধী হবে, ঐ হাদীসকে দুর্বল (যঈফ) বলা। দ্বিতীয় কুঅভ্যাস হলো, তাদের সপক্ষে কোন যুক্তি প্রমাণ না থাকা অবস্থায় খোঁড়া যুক্তির অবতারণা করা। অথচ মুহাদ্দিসীনদের মতে সন্দেহযুক্ত 'জরহ' (দোষ ত্রুটি) গ্রহন যোগ্য নয়। আর জরহ ও তা'দীলের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব দেখা দিলে গ্রহণের বেলায় তা'দীলকে প্রাধান্য দেয়া, তাছাড়া হাদীসের সনদ দুর্বল হওয়ার দরুন হাদীসের মতন দুর্বল (যঈফ) হওয়া জরুরী নয়। এ বিষয়ে আরো কথা আছে যে, সনদের পরবর্তীদের দুর্বলতা পূর্ববর্তীদের জন্য ক্ষতিকর নয়। এ সব আলোচনা ইনশা'আল্লাহ পেশ কালামে করা হবে। তবে গাইরে মোকাল্লিদদের এ নিয়ে কোন চিন্তা ও মাথা ব্যথা নেই। তারা শুধু যঈফের সবকই শিখেছে। হাদীস সম্পর্কে কেবল যঈফ আর যঈফের ধোয়া তুলে মুসলমানদের মধ্যে হাদীস অস্বীকারকারী সৃষ্টি করে দিয়েছে। এদের মতে কোন হাদীসই গ্রহণ যোগ্য নয়। হাদীস মাত্রই যঈফ। মানতে হবে শুধু কোরআন।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, গাইরে মোকাল্লিদরা হযরত আবূ হানীফা (রাদ্বি:) ও তাঁর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অন্যান্যদের তাক্বলীদকে শিরক বলে। অথচ ইবনে জাওজী ও তাঁর মত নাকেদীন হাদীসদের এত ভক্ত অনুরক্ত ও মোকাল্লিদ যে, তারা যে হাদীসকে যাঈফ বলবে, বিচার বিশ্লেষণ না করে তারা চোখ বুজে তা মেনে নিতে দ্বিধা করেনা। ফলে এ সময়ে এ ফিতনা উত্তরোত্তর বেড়েই চলছে।

তাই আমি তাদের উদ্দেশ্যে কলম ধরতে বাধ্য হলাম।

অবশ্য আমি স্বীকার করি যে, এ জন্যে প্রথমতঃ আমার কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তের অভাব, দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানের স্বল্পতা সত্ত্বেও একমাত্র মহান দয়ালু রব ও তাঁর মেহেরবান হাবীবের ফজল করমের উপর নির্ভর করে এ দিকে অগ্রসর হতে সাহস করেছি। দোআ করি যেন আল্লাহ এ কিতাবকে কবূল করেন এবং আমার গুনাহের কাফফারা ও সদকায়ে জারিয়া হয়।

এর নাম রাখা হলো 'জা'আল হক্ব' দ্বিতীয় খন্ড। যে কেউ এর থেকে উপকৃত হবে তিনি যেন আমার খাতেমা বিল খাইরের জন্য দোআ করেন। তাঁকে আল্লাহ অশেষ কল্যাণ দান করুন। وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

আহমদ ইয়ার খান নঈমী আশরাফী বদায়ুনী

ভূমিকা

মূল কিতাবটি পাঠ করার পূর্বে নিম্ন বর্ণিত নীতিমালাগুলো ভালভাবে জেনে নেয়া বাঞ্ছনীয়। এ নীতিমালাগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

১ নং নীতিমালা : হাদীস বর্ণনাকারীগণের ধারাবাহিক পরম্পরা সনদ অনুযায়ী হাদীস অনেক প্রকার। কিন্তু এখানে আমরা কেবলমাত্র তিন প্রকার হাদীস বর্ণনা করছি :

১। ছহীহ হাদীস, ২। হাসান হাদীস, ৩। যঈফ হাদীস।

১। ছহীহ হাদীসের পরিচয় : ছহীহ ঐ হাদীসকে বলা হয় , যার মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য থাকবে - (ক) হাদীসের সনদগুলোর মুত্ত্বাছল তথা হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কিতাবের লেখক পর্যন্ত কোন রেওয়ায়াতকারী কোথাও ছুটে না যায় , (খ) হাদীসের প্রত্যেক রেওয়ায়েতকারী প্রথম শ্রেণীর মুত্তাকী ও পরহেযগার হবেন। কোন ফাসেক অথবা অচেনা ব্যক্তি হবেন না , (গ) সমস্ত রেওয়ায়েতকারীগণ এমন স্মৃতিশক্তির অধিকারী হবেন যে, কোন শারীরিক রোগ বা বার্ধক্যের দরুন তাঁরা দুর্বল হয়ে না পড়েন, (ঘ) হাদীসে শায অর্থাৎ মশহুর হাদীস সমূহের বিপরীত না হয়।

২। হাসান হাদীস ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার কোন রেওয়ায়েতকারীর মধ্যে ছহীহ হাদীসের রেওয়ায়েতকারীগণের বর্ণিত মহান গুণাবলী উপস্থিত না থাকে। অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর তাক্ওয়া অথবা সর্বোচ্চমানের স্মৃতিশক্তির অধিকারী নন।

৩। যঈফ হাদীস এমন হাদীসকে বলা হয়, যার কোন রাবী মুত্তাকী অথবা অত্যন্ত স্মৃতিশক্তির অধিকারী নন। অর্থাৎ যে সমস্ত গুণাবলী ছহীহ হাদীসের বেলায় গ্রহণযোগ্য ঐগুলোর কোন একটি গুণও না থাকে।

২নং নীতিমালা : প্রথম দু'প্রকার অর্থাৎ ছহীহ ও হাসান হাদীস শরীয়তের বিধান ও ফাজায়েলের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যঈফ হাদীস শুধুমাত্র ফাজায়েলের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য; শরীয়তের বিধি বিধানের বেলায় গ্রহণযোগ্য

নয়। অর্থাৎ যঈফ হাদীস দ্বারা হালাল-হারাম সাব্যস্ত হবেনা। তবে কতিপয় আমল অথবা কোন ব্যক্তির মহত্ব ও ফজীলত সাব্যস্ত হতে পারে।

বিঃ দ্রঃ যঈফ হাদীস মিথ্যা বা অশুদ্ধ বা মনগড়া হাদীসকে বলা হয়না। লা-মাজহাবীরা মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে থাকে। বরং মোহাদ্দেসীনে কেরাম যঈফ হাদীসকে কেবলমাত্র সতর্কতামূলক বর্ণিত প্রথম দুই প্রকার হাদীসের পরের স্তরে অর্থাৎ তৃতীয় প্রকারের মর্যাদা দিয়েছেন।

৩ নং নীতিমালা : যদি যঈফ হাদীস কোন সূত্রে 'হাসান' হয়ে যায়, তাহলে তাও সাধারণতঃ গ্রহণযোগ্য। এ ধরনের হাদীসের দ্বারা শরীয়তের বিধান ও ফাজায়েল সবই সাব্যস্ত হতে পারে।

৪ নং নীতিমালা : নিম্নলিখিত কারণে যঈফ হাদীস 'হাসান' হাদীস হিসেবে পরিগণিত হয়।

(১) দুই বা ততোধিক সনদ দ্বারা বর্ণিত হাদীস, যদিও উক্ত সনদসমূহ দুর্বল হয়। অর্থাৎ যদি একটি হাদীস কয়েকটি যঈফ বা দুর্বল রেওয়ায়েত দ্বারা বর্ণিত হয়, তখন উক্ত হাদীস যঈফ থাকেনা, বরং হাসান হয়ে যায়।

(মিরকাত, মওজুয়াতে কবীর, শামী, মুকাদ্দামায়ে মিশকাত শরীফ মাওঃ আবদুল হক, রিসালা উসূলে হাদীস জুরজানীয়ে আউয়াল, তিরমিযী শরীফ ইত্যাদি।)

(২) বুযুর্গ উলামাগণের আমল দ্বারা যঈফ হাদীস হাসান হাদীস হিসেবে পরিগণিত হয়। অর্থাৎ উলামায়ে দ্বীন যদি যঈফ হাদীস এর উপর আমল শুরু করে দেন, তখন উক্ত যঈফ হাদীস আর যঈফ বা দুর্বল থাকেনা, বরং 'হাসান' হয়ে যায়।

এ কারণেই ইমাম তিরমিযী বলে থাকেন :- هٰذَا الْحَدِيْثُ غَرِيْبٌ ضَعِيْفٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ-

অর্থ- এ হাদীসটি গরীব, যঈফ কিন্তু উলামায়ে কেরাম এর উপর আমল করে থাকেন।

ইমাম তিরমিযীর উক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা এটা নয় যে, এটা যদিও হাদীস কিন্তু যঈফ, যা আমল করার যোগ্য নয়। কিন্তু উম্মতের উলামায়ে কেরাম অজ্ঞতার

কারণে এমন হাদীসের উপর আমল করেছেন, যদ্বারা সবাই পথভ্রষ্ট হয়েছেন (নাউজুবিল্লাহ); বরং ইমাম তিরমিযীর বক্তব্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, হাদীসটি রেওয়ায়েতের দিক দিয়ে দুর্বল ছিল বটে, কিন্তু উম্মতের উলামায়ে কেরামের আমলের দ্বারা হাদীসখানা 'সবল' হয়েছে।

(৩) উলামায়ে কেরামের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং আওলিয়ায়ে কেরামের কাশ্‌ফ দ্বারা যঈফ বা দুর্বল হাদীসও মজবুত হাদীস হিসেবে পরিগণিত হয়। হযরত শায়খ মুহীউদ্দিন ইবনে আরবী (রহ.) একটি হাদীস শুনে ছিলেন যে, যে ব্যক্তি ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) বার কলেমায়ে তাইয়েবা পড়বে, তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

একদা একজন কাশফের অধিকারী যুবক বললেন যে, আমার মৃত মা'কে জাহান্নামে দেখতেছি। (তা শুনে) হযরত শায়খ মুহিউদ্দিন ইবনে আরবী (রহ.) (ইতিপূর্বে) যে সত্তর হাজার বার কলেমায়ে তাইয়েবা পড়ে ছিলেন উহার ছাওয়াব মনে মনে ঐ যুবকের মা' এর জন্য বখশীশ করে দেওয়া মাত্রই যুবক হেসে দিলেন এবং বললেন, এখন আমার মা'কে জান্নাতে দেখছি। শায়খ বলেন, আমি এ হাদীসখানার বিশুদ্ধতা উক্ত যুবক ওলীর কাশ্‌ফ দ্বারা জানতে পারলাম।

(ছহীহ আল বিহারী) তাহযিরুন্নাস কৃত- মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম নানুতুবী এ ঘটনাটিই হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (রহ.) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৫নং নীতিমালা : সনদের দুর্বলতার জন্য হাদীসের মতনও দুর্বল হওয়া অপরিহার্য নয়। সুতরাং এমনও হতে পারে যে, একটি হাদীস এক সনদে 'দুর্বল' দ্বিতীয় সনদে 'হাসান' তৃতীয় সনদে ছহীহ্। এ জন্যই ইমাম তিরমিযী কোন হাদীস সম্পর্কে বলে থাকেন- هٰذَا الْحَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ অর্থ- 'এই হাদীস খানা 'হাসান', ছহীহ্, গরীবও বটে।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্যের মর্ম হচ্ছে- এই হাদীসখানা কয়েক রকম সনদ দ্বারা বর্ণিত। এক সনদ দ্বারা হাসান, দ্বিতীয় সনদ দ্বারা ছহীহ, তৃতীয় সনদ দ্বারা গরীব।

৬নং নীতিমালা : পরের দুর্বলতা পূর্বের মুহাদ্দিস অথবা মুজতাহিদ এর জন্য ক্ষতিকর নয়। তাই, একটি হাদীস ইমাম বোখারী অথবা ইমাম তিরমিযীর নিকট

যঈফ বা দুর্বল হিসেবে আসতে পারে এ কারণে যে, উক্ত হাদীসে একজন দুর্বল রাবী বা বর্ণনাকারী শামিল হয়ে যায়। কিন্তু ঐ হাদীসটিই হযরত ইমামে আজম আবূ হানিফা (রদ্বি.) এর কাছে ছহীহ সনদ হিসেবেই আসতে পারে। তাঁর যুগ পর্যন্ত উপরোক্ত দুর্বল রাবী সনদগুলোর মধ্যে শামিল হয়নি।

অতএব, কোন ওহাবীর পক্ষে এটা সাব্যস্ত করা সহজ নয় যে, এ হাদীসখানা ইমাম আজম পর্যন্ত যঈফ বা দুর্বল হিসেবে এসেছে।

একটি সুন্দর ঘটনা : 'ইমামের পেছনে ক্বিরাআত পাঠ' বিষয়ে আমার সাথে এক লা-মাযহাবী ওহাবীর মা'মুলী বিতর্ক হয়। এ প্রসংগে আমি এ হাদীস খানা পেশ করলাম- قِرَأةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ অর্থাৎ 'ইমামের ক্বিরাআতই মুক্তাদীর ক্বিরাআত'। ওহাবী আলেম বললেন, এ হাদীসটি যঈফ বা দুর্বল। এর সনদ গুলোর মধ্যে জাবের জুহানী নামক একজন যঈফ রাবী রয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, জাবের জুহানী কত হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন? উত্তরে একটু আঁত্‌কে উঠে বললেন, ৩৩৫ হিজরী। আমি বললাম, যখন ইমাম আবূ হানীফা (রাদ্বি.) এ হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তখন জাবের জুহানী তাঁর পিতার পৃষ্ঠদেশেও আসেনি। কেননা ইমাম আজম (রাদ্বি.) এর জন্ম সাল হচ্ছে ৮০ হিজরী। তাঁর ইন্‌তেকাল হয়েছে ১৫০ হিজরী সালে। তাই তৎকালীন সময়ে এই হাদীস সম্পূর্ণ ছহীহ ছিল। পরের মুহাদ্দিসীনের নিকট যঈফ হিসেবে এসেছে। ওহাবী সাহেব এর আর কোন জওয়াব দিতে পারেননি এবং জওয়াব না দিয়েই মৃত্যু বরণ করেন।

অতএব, হানাফী মাযহাবী উলামাগণ ওহাবীদের যঈফ যঈফ কথাটি ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকতে হবে এবং যঈফ শব্দটি বললে, তার কারণ জিজ্ঞাসা করবেন। অতঃপর ইহা নিশ্চিত করবেন, এ দুর্বলতা ইমাম আজম (রাদ্বি.) এর পূর্বের না পরের। তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ ওহাবীজি পানি চাইতে বাধ্য হবেন এবং যঈফ যঈফ এর সবকটি ভুলে যাবেন। কারণ হলো- ইমাম আযম (রাদ্বি.) এর যুগ হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনেক কাছাকাছি। তখন দুর্বল হাদীস অনেক কমই ছিল আর ইমাম আজম (রাদ্বি.) তাবেয়ী ছিলেন।

৭ নং নীতিমালা : নিশ্চিত না হয়ে সন্দেহ বশতঃ হাদীসের সনদ বিষয়ে

কোন রূপ সমালোচনা করা গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ হাদীসের কোন নিরীক্ষক বিশেষতঃ ইবনে জুযীসহ প্রমুখদের এ রূপ মত প্রকাশ করা যে, 'অমুক হাদীস অথবা অমুক রাবী যঈফ বা দুর্বল' ইহা গ্রহণযোগ্য নয়। কেন হাদীসটি যঈফ এবং রাবীর মধ্যে কি দুর্বলতা রয়েছে যতক্ষণ তা নিশ্চিত করে চিহ্নিত না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত মতামত গ্রহণযোগ্য হবেনা। কেননা, দুর্বলতার কারণ বিষয়ে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। একটি বিষয় কারো দৃষ্টিতে দোষ আবার কারো দৃষ্টিতে নির্দোষ হয়ে থাকে। দেখুন! তাদলীস করা অর্থাৎ রাবী তাঁর উস্তাদের নাম গোপন রেখে অন্য একজন প্রখ্যাত রাবীর নাম উল্লেখ করা, এরসাল করা, কোন তাবেয়ী সাহাবীর মাধ্যম ছাড়া সরাসরি রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে হাদীস বর্ণনা করা, ঘোড় দৌড়ে অংশ নেওয়া, রসালাপ করা, কম বয়সী হওয়া, ইলমে ফিক্হ বিষয়ে বেশী ব্যস্ত থাকাকে কেউ কেউ একজন রাবীর জন্য আয়েব বা দোষ বলেছেন, কিন্তু হানাফী মাযহাবীদের নিকট উপরোক্ত বিষয় গুলোকে দোষমুক্ত আখ্যায়িত করেছেন। (নূরুল আনোয়ার বহছে তা'য়ান আলাল হাদীস)

৮নং নীতিমালা : 'জরাহ্' ও 'তা'দীল' এর মধ্যে দ্বন্দ্ব হলে তা'দীলটাই গ্রহণযোগ্য, জরাহ্ নয়। অর্থাৎ কোন মুহাদ্দিস কোন এক হাদীসের রাবীকে যঈফ বা দুর্বল বলেছেন। আবার কেউ সেটাকে ক্বী বা 'সবল' বলেছেন। কোন ইতিহাসে রাবীর পাপচারিতা প্রমাণিত হয়েছে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি অর্থাৎ রাবী মুত্তাকী বা খোদাভীরু সৎকর্মশীল ছিলেন। এমতাবস্থায় রাবীকে মুত্তাকী বলে বিশ্বাস করা যাবে। এবং তাঁর রেওয়ায়েতও 'যঈফ' হবেনা। কেননা কোন মুমিনের মধ্যে তাক্ওয়া বা খোদা ভীরুতাই হচ্ছে মূল।

৯নং নীতিমালা : কোন হাদীস ছহীহ না হলেও যঈফ (দুর্বল) হওয়া আবশ্যক নয়। তাই, কোন মুহাদ্দিস কোন হাদীসের ব্যাপারে 'হাদীসটি ছহীহ নয়' বললে, এর অর্থ যঈফ নয়। সে হাদীসটি 'হাসান'ও হতে পারে। ছহীহ ও যয়ীফের মাঝে অনেক স্তর রয়েছে।

১০নং নীতিমালা : ছহীহ হাদীস মুসলিম, বুখারী অথবা অন্যান্য সিহাহ সিত্তাহ (*) ছহীহ হাদীসের কিতাবের উপরই নির্ভরশীল নয়। এ হাদীসের কিতাবগুলো ছহীহ বলার অর্থ এই নয় যে, এ কিতাব সমূহে লিখিত সমুদয়

হাদীসই ছহীহ এবং এগোলো ব্যতিত অন্যান্য কিতাবের সমস্ত হাদীস দুর্বল। বরং এর অর্থ শুধু এই যে, উপরোক্ত কিতাবগুলোতে ছহীহ হাদীসের সংখ্যা তুলনামূলক অধিক। আমাদের ঈমান হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রতিষ্ঠিত। শুধু বোখারী, মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীসের প্রতি নয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস যেখান থেকে প্রাপ্ত হোক না কেন, তা আমাদের শিরোধার্য। বোখারীর মধ্যে তা থাকুক বা না থাকুক। মাযহাব বিরোধীদের অবস্থার উপর আশ্চর্য হতে হয় এ কারণে যে, তারা ইমাম আবূ হানীফার তাক্বলীদকে শিরক বলে থাকে। কিন্তু বুখারী, মুসলিম এর উপর এমন ঈমান রাখে এবং অন্ধ তাক্বলীদ করে যে, যা থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয়।

১১ নং নীতিমালা : কোন আলেম ফকীহ্ মুহাদ্দিস এর বর্ণিত হাদীসকে কোন বিতর্ক ছাড়াই গ্রহণ করে নেওয়া ঐ হাদীসখানা সবল হওয়ার জলন্ত প্রমাণ। যদি কোন ফকীহ আলিম মুজতাহিদ যঈফ হাদীসকে মেনে নেয় তাহলে ঐ যঈফ হাদীস ক্বী বা সবল হাদীস হিসেবে প্রমাণিত হয়। মিশকাত এর গ্রন্থকার অলী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ খতীব তিবরিযী মিশকাত এর ভূমিকায় বলেন- وَاِنِّىْ اِذَا اَسْنَدْتُ الْحَدِيْثَ اِلَيْهِمْ كَاَنِّىْ اَسْنَدْتُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ-

অর্থ- আমি যখন হাদীসকে ঐ মুহাদ্দিসগণের প্রতি সম্মন্ধ করি, তখন আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, আমি যেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঐ হাদীসের সম্বন্ধ স্থাপন করেছি।

(*) হাদীসের ৬টি গ্রন্থ কে 'সিহাহ সিত্তাহ' বলা হয়। যথা ; বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাযাহ্। হাদীসের মোট প্রসিদ্ধ কিতাবের সংখ্যা পঞ্চাশোর্ধ। মুসনাতে ইমাম আহমদ, মসনদে ইমাম আবূ হানীফা, মুআত্তা ইমাম মুহাম্মদ, মুআত্তা ইমাম মালিক, বায়হাকী, দারিমী, দারু কুতনী, হাকিম ইত্যাদি। ইমাম বোখারীর নামা শরিফ হচ্ছে মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল। তাঁর জন্ম হচ্ছে ২০৪ হিজরীতে। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (রদ্বি.) এর ওফাতের ৫৪ বছর পরে। কেননা ইমাম আযমের ওফাত হয় ১৫০ হিজরীতে।

এ নীতিমালাগুলো দ্বারা আপনারা অবশ্যই বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা যে সমস্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, ঐ গুলোর মধ্যে কোন একটি হাদীস দুর্বল হতে পারে না। এ জন্য যে, এর উপর উম্মতের আমল রয়েছে। এই হাদীসসমূহকে উলামা ফোকাহাগণ মেনে নিয়েছেন। প্রতিটি হাদীস অনেক সনদের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আমি অধম ইন্শাআল্লাহ্ প্রত্যেকটি মাসআলার উপর এতগুলো হাদীস পেশ করবো, যাতে কোন হাদীসকে যঈফ বা দুর্বল আখ্যায়িত করার অবকাশ থাকবে না। এ কারণে যে, সনদের আধিক্য যঈফ হাদীসকে হাসান হাদীস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। (আহমদ ইয়ার খান)

১২ নং নীতিমালা : যদি হাদীস ও কোরআনের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়, তখন হাদীসের অর্থ এমন ভাবে করতে হবে, যাতে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয় এবং দ্বন্দ্বের নিরসন হয়ে যায়। তেমনিভাবে হাদীসের মধ্যে যদি পরস্পর বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে এমন ভাবে হাদীসের অর্থ করতে হবে যাতে হাদীসসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্বের নিরসন হয় এবং সবগুলো হাদীস এর উপর আমল করা যায়।

কোরআন ও হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্বের উদাহরন ঃ আল্লাহ তাআলা কোরআনে মজীদে এরশাদ করেন, فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ 'যতটুকু কোরআন মজীদ তেলাওয়াত সহজ হয়, নামাযে তা পাঠ কর।' কিন্তু হাদীস শরীফে নবীজির এরশাদ হচ্ছে- لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَاْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ। অথার্ৎ- 'যে সূরা ফাতিহা পাঠ করেনা তার নামায (আদায়) হবে না।' এ হাদিসটি উপরোক্ত আয়াতের সাথে বিরোধ দেখা যায়। এমতাবস্থায় হাদীসের অর্থ এই ভাবে করতে হবে যে, সূরায়ে ফাতিহা ছাড়া নামায পরিপূর্ণ হয় না। সাধারণতঃ নামাযে ক্বেরাআত ফরয আর সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। অতএব, উভয়ের বিরোধ থাকলোনা এবং কোরআন ও হাদীস উভয়টার উপ-রই আমল হয়ে গেল।

রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন - وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا অর্থঃ 'যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন তা কান লাগিয়ে শুনবে এবং চুপ থাকবে।' কিন্তু হাদীস শরীফে এরশাদ হচ্ছে- لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَاْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ অর্থ ঃ যে সূরা ফাতিহা পাঠ করেনা তার নামাযই হয় না ।

এ হাদীসখানা কোরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াতের বিপরীত দেখা যাচ্ছে। কোরআন সাধারনতঃ চুপ থাকার নির্দেশ দিচ্ছে আর হাদীস শরীফ মুক্তাদীকে সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করার নির্দেশ দিচ্ছে।

অতএব, এটা মান্তে হবে যে, কোরআনের নির্দেশ নিঃশর্ত। আর হাদীস শরীফের নির্দেশ একাকী নামায আদায়কারী অথবা ইমামের জন্য প্রয়োজ্য। ইমামমের পাঠ করাই মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট। এ কারণে যে, ইহাই মুক্তাদীর হুকমী ক্বিরআত। সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে যে, এ নীতিমালা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর যদি কোন হাদীস কোন কোরআনে করীম এর আয়াতের অথবা এ হাদীস এর তুলনায় উচুস্তরের হাদীসের সাথে এমন দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় যে, কোন রূপ পরস্পর সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হচ্ছেনা, এমতাবস্থায় কোরআনে করীম অথবা উচুঁ স্তরের হাদীসকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে, আর এ নিম্নস্তরের হাদীসখানা আমলযোগ্য হবেনা। এ হাদীসটিকে রহিত হিসেবে মেনে নিতে হবে। অথবা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর অনেক উদাহরণ রয়েছে।

১৩ নং নীতিমালা : কোন হাদীস যঈফ বা দুর্বল প্রমাণিত হওয়া মাযহাব বিরোধীদের জন্য কেয়ামত তুল্য। কেননা ঐ সমস্ত যঈফ রেওয়ায়েত গুলোই হচ্ছে তাদের মাযহাবের মূল ভিত্তি। রেওয়ায়েত যঈফ হওয়া মানে তাদের সমূহ মাছআলা ফানা হয়ে যাওয়ার নামান্তর। কিন্তু হানাফীদের জন্য এটা কোন ক্ষতিকর নয়। কেননা হানাফীদের দলীল গুলো যঈফ রেওয়ায়েত সমূহ নয়; তাঁদের দলীল কেবল মাত্র মাযহাবের ইমামের সুদৃঢ় মত। আর এ ধরনের রেওয়ায়েত সমূহ ইমামের মতামতকে সাহায্য করে। হ্যাঁ, ইমামের দলীল হচ্ছে কোরআন ও হাদীস। কিন্তু ইমাম সাহেব যখন হাদীসগুলি পেয়েছিলেন তখন ছহীহ বা বিশুদ্ধ হিসেবেই পেয়েছিলেন। হাদীসের সনদগুলো তখন ছহীহ মুসলিম ও বোখারীর ন্যায় ছিলনা।

পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে বন্দি করে। পুলিশের দলিল হচ্ছে বিচারকের চূড়ান্ত রায়, শাস্তির আইনের ধারাগুলো নয়। হ্যাঁ, হাকিম বা বিচারক-কর দলীল হচ্ছে এ আইনের ধারাগুলো।

এ কথা স্মরন রাখুন! তাক্বলীদ বা মাযহাব মেনে চলা আল্লাহর একমাত্র রহমত ও দয়া। আর মাযহাব মেনে না চলা আল্লাহর শাস্তি।

১৩- ১৫নং হাদীস : হাকেম মুস্তাদরিক কিতাবে, দারকুত্নী ও বায়হাক্বী অত্যন্ত বিশুদ্ধ সনদ সহকারে ইমাম মুসলিম ও বুখারী এর শর্ত মোতাবেক হযরত আনাস হতে বর্ণনা করেন :

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فَحَاذَى بِإِبْهَا مَيْهِ أُذُنَيْهِ-

অর্থাৎ- 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তকবীর বলতে দেখেছি আর তিনি নিজ বৃদ্ধাঙ্গুল কান বরাবর উঠিয়েছেন।'

১৬-১৭নং হাদীস : ইমাম আবদুর রাজ্জাক এবং তাহাবী হযরত বারা ইবনে আযেব হতে বর্ণনা করেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِافْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُوْنَ إِبْهَامَاهُ قَرِيْبًا مِنْ شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ-

অর্থাৎ : যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আরম্ভ করার জন্য তকবীর বলতেন, তখন তাঁর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল কানের লতি বরাবর হয়ে যেত।

১৮নং হাদীস : আবূ দাউদ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হাজর হতে বর্ণনা করেন:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتْ بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ

অর্থাৎ- 'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাত মোবারক এতদূর পর্যন্ত তুললেন যে, তাঁর হাত মোবারক কাঁধ আর বৃদ্ধাঙ্গুল কানের বরাবর হয়ে গেল।

১৯নং হাদীস : দারুকুত্নী হযরত বরা ইবনে আযেব হতে বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَى شَيْئٍ مِنْ ذَالِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهِ.

অর্থাৎ- 'তিনি নবীজীকে দেখেছেন যখন নবীজী নামায আরম্ভ করলেন,তখন

তাঁর হাত মোবারক উঠালেন,এমনকি তাঁর হাত কান এর বরাবর করে দিলেন। অতঃপর নামায থেকে অবসর হওয়া পর্যন্ত তিনি আর হাত তোলেননি।

২০ নং হাদীস : হযরত আবূ হুমাইদ সায়েদী হতে তাহাবী শরীফের গ্রন্থকার বর্ণনা করেন:

أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لِأَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ وَجْهِهِ-

"তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বলতেন আমি তোমাদের চেয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে অধিক অবহিত। যখন তিনি নামাযে দন্ডায়মান হতেন, তখন তকবীর বলতেন এবং হাত মোবারক চেহারা বরাবর উঠাতেন।"

কান পর্যন্ত হাত উঠানো বিষয়ে আরও বহু হাদীস পেশ করা যেতে পারে এখানে শুধু বিশটি হাদীস উল্লেখ করছি। যদি আরও অধিক হাদীস জানার ইচ্ছা হয়, তাহলে হাদীসের কিতাবগুলো বিশেষতঃ ছহীহুল বিহারী শরীফ পড়ুন। হানাফী মাযহাবের পক্ষে এমন ব্যাপক হাদীসের কিতাব অদ্যাবধি দ্বিতীয়টি দেখা যায়নি।

যুক্তি গ্রাহ্য দলীল সমূহ : বিবেকও চায় যে, নামায শুরু করার সময় কান বরাবর হাত উঠুক। কেননা নামাযী ব্যক্তি নামায শুরু করার সময় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে যায় এবং পার্থিব বাকবিতন্ডা হতে বিমুখ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পানাহার, কথাবার্তা, এদিক ওদিক নজর করা নিজের উপর হারাম করে নেয়। নিম্নজগত থেকে উর্ধ জগতের দিকে পরিভ্রমন করছে। এটা সমাজে প্রচলিত আছে, যখন কাউকে কোন অপরাধ থেকে তৌবা করানো হয়, তখন কান ধরতে বলা হয়; কাঁধ ধরতে বলা হয় না। যেমন নামাযী ব্যক্তি মুখে নামায শুরু করে এবং কার্যতঃ কান ধরে দুনিয়া হতে বিমুখ হয়। এ স্থলে কাঁধ ধরা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যেমন, সিজদায় মুসলিম ব্যক্তি একদিকে আল্লাহ তাআলার মহত্বের স্বীকৃতি দিচ্ছে। আর যমীনে মাথা রেখে নিজের দীনতা ও হীনতা প্রকাশ করছে। তেমনি ভাবে নামায আরম্ভ করার সময় শরীরের একাংশের স্বীকারোক্তি মুখ দ্বারা নিঃসৃত হচ্ছে আর অন্য অংশের স্বীকারোক্তি শারীরিক আচরণ দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নাভীর নীচে হাত বাঁধা সুন্নাত

মাযহাব বিরোধী ওহাবীরা নামাযে সীনার উপর অর্থাৎ নাভীর উপর হাত বেঁধে থাকে। এ জন্য এই অধ্যায়কে দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করছি। প্রথম পরিচ্ছেদে নাভীর নীচে হাত বাঁধার পক্ষের দলীলগুলো এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ওহাবীদের অভিযোগ ও তার জবাব রয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাযে পুরুষদের জন্য নাভীর নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত। বুকে হাত বাঁধা সুন্নতের বিপরীত। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। আমি কেবলমাত্র কয়েকটি হাদীস এখানে পেশ করছি ঃ

১ নং হাদীস :

عَنْ وَائِلِ ابْنِ حَجَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ تَحْتَ السُّرَّةِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ-

"হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রেখেছেন নাভীর নীচে। এ হাদীসটি ইবনে আবি শায়বা সাহীহ সনদসূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন। আর এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সবাই অত্যন্ত সিক্বাহ বা নির্ভরযোগ্য।"

২ নং হাদীস : হযরত ইবনে শাহীন হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন :-

قَالَ ثَلٰثٌ مِنْ اَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ تَعْجِيْلُ الْاَفْطَارِ وَتَاخِيْرُ السُّحُوْرِ ووضعُ اَلْكَفِّ على اَلْكَفِّ تحت السُّرَّةِ-

" তিনটি জিনিস নবুওয়াতের মহান স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। বিলম্ব না করে যথা সময়ে ইফতার করা, বিলম্বে সাহরী ভক্ষণ করা এবং নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে বাঁধা।"

৩ নং হাদীস : আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু ওয়ায়েল রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত :-

قَالَ اَبُوْ وَائِلٍ أَخْذُ اَلْكَفِّ عَلَى اَلْكَفِّ فِى الصَّلٰوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ

" তিনি বলেছেন নামাযে নাভীর নিচে হাতের উপর হাত রাখা উচিত।"

৪-৫ নং হাদীস : দারুকুত্নী ও আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন:-

اِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِى الصَّلٰوةِ وَضْعَ اَلْكَفِّ وَفِى رِوَايَةٍ وَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ-

"নামাযে হাতের উপর হাত রাখা এবং অন্য এক বর্ণনায় ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে বাঁধা সুন্নাত।"

৬-৯ নং হাদীস : আবু দাউদ নুসখায়ে ইবনে এরাবী, আহমদ, দারুকুত্নী এবং বায়হাকী হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেনঃ

اِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ وَضْعُ اَلْكَفِّ عَلَى اَلْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ-

" নাভীর নিচে হাতের উপর হাত বাঁধা সুন্নাত।"

১০ নং হাদীস :" রাযীন হযরত আবু হুজায়ফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন ঃ

اِنَّ عَلِيًّا قَالَ السُّنَّةُ وَضْعُ اَلْكَفِّ فِى الصَّلٰوةِ وَيَضَعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ-

" নিঃসন্দেহে হযরত আলী (রাদ্বি.) বলেছেন, নামাযে হাত বাঁধা সুন্নাত। উভয় হাত নাভীর নীচে বাঁধবে।"

১১ নং হাদীস : ইমাম মুহাম্মদ কিতাবুল আছার শরীফে হযরত ইব্রাহীম

নাখয়ী হতে বর্ণনা করেন :-

اَنَّهٗ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى تَحْتَ السُّرَّةِ-

"তিনি নিজ ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নীচে বাঁধতেন।"

১২ নং হাদীস : ইবনে আবি শায়বা হযরত ইব্রাহীম নাখয়ী হতে বর্ণনা করেন,

قَالَ يَضَعُ يَمِيْنَهٗ عَلٰي شِمَالِه تَحْتَ السُّرَّةِ

" তিনি বলেছেন, নিজ ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে বাঁধতেন"

১৩ নং হাদীস : ইবনে হেযাম হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন,

اِنَّهٗ قَالَ مِنْ اَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ وَضْعُ الْيَمِيْنُ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ-

" তিনি বলেন, ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নীচে বাঁধা নবুয়াতের মহান স্বভাবগুলোর অন্তর্ভূক্ত।"

১৪ নং হাদীস : আবূ বকর ইবনে আবি শায়বা হযরত হাজ্জাজ ইবনে হাস্সান হতে বর্ণনা করেন,

قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مُجْلَزٍ وَسَاَلْتُهٗ وَقُلْتُهٗ كَيْفَ يَضَعُ قَالَ يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّهِ بِيَمِيْنِه عَلٰى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِه وَيَجْعَلُهُمَا اَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ- اِسْنَادُهٗ جَيِّدٌ وَرُوَاتُهٗ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ

"আমি আবূ মুজলাযকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নামাযের মধ্যে হাত কিভাবে রাখবে। তিনি বললেন, স্বীয় ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠে রেখে নাভীর নীচে বাঁধবে। এ হাদীসের সনদসমূহ অত্যন্ত সবল এবং সকল বর্ণনাকারী খুবই গ্রহণযোগ্য।"

এ সম্পর্কে আরও অনেক হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করা যেতে পারে। এখানে শুধু চৌদ্দটি হাদীস উল্লেখ করে ক্ষান্ত হলাম। এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ-

সাহীহুল বেহারী ও ফাতহুল কাদীর দেখার অনুরোধ রইলো।

যুক্তিও বলে যে, নামাযে হাত নাভীর নীচেই বাঁধা উচিত। কেননা গোলাম মুনিবের সম্মুখে এমনিভাবেই দাঁড়াতে হয়। এর মধ্যেই পরম আদব নিহিত আছে। নামাযে যেহেতু বান্দা স্বীয় প্রতিপালকের দরবারে হাজেরী দিয়ে থাকে, সেহেতু আদব সহকারেই দণ্ডায়মান হওয়া বাঞ্চনীয়। মাযহাব বিরোধীগণ যখন নামাযে দণ্ডায়মান হয়, তখন বুঝাই যায়না যে, সে কি মসজিদে দাঁড়িয়ে আছে, না কারো সাথে কুস্তির জন্য মাঠে অপেক্ষমান। নম্রতা প্রকাশের জন্য দাঁড়িয়ে আছে, না কুস্তি করার মানসে দাঁড়িয়ে আছে।

আল্লাহ্র বান্দাগণ! যখন রুকূতে আদব এর বহিঃপ্রকাশ, সাজদায় আদব, আত্তাহিয়্যায় আদব, তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় কুস্তি খেলার জন্য প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় বীর পহলোয়ানের মত বেআদবীর সাথে কেন দাঁড়িয়ে থাক? এখানেও নাভীর নীচে হাত বেঁধে গোলামের ন্যায় দাঁড়িয়ে যাও। আল্লাহতাআলা বোধশক্তি নসীব করুন। মাযহাব বিরোধীদের কাছে সহীহ মুসলিম ও বোখারী শরীফের একটি মারফূ' হাদীসও নেই, যতে পুরুষদেরকে বুকের উপর হাত বাঁধার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ বিষয়ের উপর অভিযোগ ও তার জবাব

১ নং আপত্তি : আবূ দাউদ শরীফে ইবনে জারীর তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন :

قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُمْسِكُ شِمَالَهٗ بِيَمِيْنِه عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ

"আমি হযরত আলীকে দেখেছি, তিনি তাঁর নাভীর উপর বাম হাতের কবজি কে ডান হাত দ্বারা ধরেছেন।"

জবাব : এ অভিযোগের কয়েকটি জবাব রয়েছে। যথা : এক, তিনি আবূ দাউদ শরীফের এ হাদীস খানা সম্পূর্ণ উল্লেখ করেননি। এর পরেই বিস্তারিত বর্ণনাটি হচ্ছে :

قَالَ أَبُوْدَاوُدَ رُوِىَ عَنْهُ سَعِيْدُ ابْنُ جُبَيْرِ فَوْقَ السُّرَّةِ وَقَالَ أَبُوْجَلاَدِ تَحْتَ السُّرَّةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ

"আবূ দাউদ বলেছেন, সাঈদ ইবনে জুবায়ের হতে নাভীর উপরে কথাটি বর্ণিত আছে। আবূ জলাদ নাভীর নীচে রিওয়ায়েত করেছেন। আবূ হোরায়রা হতেও অনুরূপ রিওয়ায়েত রয়েছে , কিন্তু এ বর্ণনা মোটেও 'সবল' নয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : নাভীর নীচে অথবা নাভীর উপর হাত বাঁধার প্রচলিত হাদীস সমূহ আবূ দাউদ কিতাবে নেই। ইবনে এরাবী কৃত আবূ দাউদ এর নুছখা গুলোতে এ হাদীস সমূহ মওজুদ আছে। যেমন আবূ দাউদ শরীফের পাদটিকায় এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। এ কিতাবগুলো হতেই ফাতহুল কাদীর ও সহীহুল বোখারী রিওয়ায়েত করেছেন। সর্বাবস্থায় ওদের উপস্থাপিত আবু দাউদ এর হাদীসে দ্বন্দ্ব প্রমাণিত হয়েছে। এ সকল দ্বান্দ্বিক রেওয়ায়েতগুলোকে স্বয়ং আবূ দাউদ যঈফ (দুর্বল) বলেছেন। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে যে, তারা আবূ দাউদ এর দুর্বল হাদীস দ্বারাই দলীল পেশ করেছে।

দ্বিতীয়ত: যখন হাদীসে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়, তখন ক্বেয়াস দ্বারা অগ্রাধিকার সাব্যস্ত হয়ে থাকে। কেয়াসও চায়, নাভীর নীচের হাদীসসমূহের আমল গ্রাহ্য হোক। কেননা, সাজদা, রুকূ, আত্তাহিয়্যা এর বৈঠক সহ সবগুলোতে আদব এর লেহাজ করা হয়েছে। তেমনি কেয়াম বা দণ্ডায়মানকালীনও যেন আদবের লেহাজ করা হয়। নাভীর নীচে হাত বাঁধাই আদব। বুকের উপর হাত বাঁধা বে-আদবী যেন কাউকে কুস্তি করার জন্য আহবান করা হচ্ছে। প্রতিপালককে নিজের বল শক্তি প্রদর্শন করোনা বরং তাঁর সামনে নিজের দীনতা ও হীনতা প্রদর্শন কর।

২ নং আপত্তি : উপস্থাপিত হাদীসগুলো যয়ীফ (দুর্বল)। আর যঈফ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা অশুদ্ধ।

জবাব : যঈফ যঈফ বলে গুজব ছড়ানো ওদের বুজর্গদের চিরাচরিত স্বভাব। এ বিষয়ে সাতটি জবাব প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছদে দিয়েছি। যে রেওয়ায়েত কয়েকটি সনদসূত্রে বর্ণিত হয়, তা আর যঈফ (দুর্বল) থাকেনা। আমি দশটি সনদসূত্রে পেশ করেছি। উম্মতের আমলের দ্বারা যঈফ (দুর্বল) হাদীস ক্ববী (সবল) হয়ে যায়। আর ইমাম আযম-এর মত মহাসম্মানিত ইমাম তা গ্রহণ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করার কারণে হাদীসগুলোর দুর্বলতাও চলে গিয়েছে। যদি এ রেওয়ায়েতগুলোতে কোন দুর্বলতাও থাকে, তা ইমাম আযম রাদ্বিআল্লাহু আনহু-এর পরে সৃষ্টি হয়েছে। পরে পরিলক্ষিত দুর্বলতা ইমাম আযম এর জন্য ক্ষতিকর হবে কেন? ।

মজার ঘটনা : আমি একবার ৬ই রমজান রোজ সোমবার হাফিয ইলাহী বখ্‌শ সাহেবকে (জামালপুর গুজরাট) আহ্‌লে হাদীসদের গর্ব গুজরাটের অধিবাসী মাওলানা হাফিয এনায়েতুল্লাহ ছাহেবের খেদমতে একটি চিঠি লিখে প্রেরণ করি। চিঠিতে তাকে লিখলাম যে, আপনি মেহেরবানী করে বুকের উপর হাত বাঁধার বিষয়ক হাদীসসমূহ সূত্র সহ লিখে পাঠাবেন। আমার ধারণা ছিল যে, যেহেতু জনাব মাওলানা এনায়েতুল্লাহ ছাহেব আহ্‌লে হাদীস জমাতের জগতে শীর্ষ আলেম, তিনি অবশ্যই মুসলিম অথবা বোখারী বা সিহাহ সিত্তাহ হাদীসের কিতাবগুলো থেকে এ বিষয়ে অগণিত হাদীস নকল করে পাঠাবেন, যা আমাদের যানা নেই। কিন্তু মাওলানার নিকট থেকে যে উত্তর এসেছে, তা আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনুন। তিনি এক ইঞ্চি পরিমাণ একটি কাগজে মাত্র এক লাইন লিখে ছিলেন। তা হলোঃ

عَنْ وَائِل بْنِ حُجْرِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى عَلٰى صَدْرِهِ–

بلوغ المرام صــــ٢١،

" ওয়াইল ইবনে হাজর হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নবীজির সাথে নামায পড়েছি। তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর বেঁধেছেন।" আর ঐ মাওলানা সাহেব মৌখিকভাবে এ কথাও বলে পাঠিয়েছেন যে, উর্দূ ভাষায় লিখিত তাফসীরে কাদেরীতে লেখা আছে যে,– فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এর অর্থ হচ্ছে যে, "আপনি (হে রাসূল) আপনার প্রভূর জন্য নামায পড়ুন এবং নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধবেন। তাঁর এ জবাব দেখে ও শুনে আমরা বিস্মিত হলাম। বস্তুতঃ আমাদের কেবলমাত্র আফসোস হয় এ জন্য যে, এ ধরণের বড় বড় আলিমগণ আমাদের কাছে প্রত্যেক মাসআলার বিষয়ে মুসলিম-বুখারীর হাদীস দাবী করে থাকেন এবং সিহাহ্ সিত্তাহ হাদীসের কিতাবগুলোর বাইরে আমাদেরকে যেতে দেননা। আর যখন নিজেদের পালা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তৃতীয় অধ্যায়

নামাযে বিসমিল্লাহ নীচু স্বরে পড়া

সুন্নাত হলো নামাযী 'সূরা ফাতিহা'র পূর্বে নীচু স্বরে বিসমিল্লাহ পড়ে 'আল্ হামদু লিল্লাহ' থেকে ক্বিরাআত শুরু করবে। কিন্তু মাযহাব অমান্যকারী ওয়াহাবী সম্প্রদায় বিস্মিল্লাহও উচুস্বরে পড়ে, যা সুন্নাতের পরিপন্থী। 'বিসমিল্লাহ' আস্তে পড়ার ব্যাপারে প্রচুর হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে এখানে কিছু উল্লেখ করা হচ্ছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কবূল করুন।

হাদীস নং- ১-৩ : ইমাম মুসলিম, বোখারী ও আহমদ (রাহিমাহুমুল্লাহ) হযরত আনাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন :

قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَءُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা), আবূ বকর সিদ্দীক, ওমর ফারুক ও উসমান যুন্নূরাইন (রাদ্বিআল্লাহু আনহুম)-এর পিছনে নামায পড়েছি। কিন্তু তাঁদের কাউকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়তে শুনিনি।"

হাদীস নং- ৪ : ইমাম মুসলিম (রহ.) হযরত আনাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেনঃ

وعن انس أَنَّ النَّبِىَّ صلى اللّٰه عليه وسلم وابابكر وعمر كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الصلاة بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

"নিশ্চয়ই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা) 'আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' পড়ে নামাযের কিরাত শুরু করতেন।

হাদীস নং- ৫-৭ : ইমাম নাসাঈ, ইবনে হাব্বান, তাহাবী প্রমুখ হযরত আনাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন:

قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থাৎ 'আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বকর, ওমর ও ওসমান (রাদিআল্লাহু আলাহুম) এর পিছনে নামায পড়েছি। তাঁদের কাউকে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম উঁচু আওয়াজে পড়তে শুনিনি।"

হাদীস নং- ৮-১১ : তাবরানী 'মু'জামুল কবীরে, আবূ নুআইম 'হুলিয়া'তে, ইবনে খুযাইমাহ এবং তাহাবী হযরত আনাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন:

أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا يُسِرُّوْنَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থাৎ ঃ "নিশ্চয়ই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বকর, ওমর (রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা)" বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' নীচু স্বরে পড়তেন।"

হাদীস নং- ১২-১৪ : আবূ দাউদ, দারিমী, তাহাবী প্রমুখ হযরত আনাস (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন:

أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থাৎ : "নিশ্চয়ই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বকর, ওমর ও ওসমান (রাদিআল্লাহু আনহুম) 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" থেকে ক্বিরাআত শুরু করতেন।"

হাদীস নং- ১৫ : ইমাম মুসলিম হযরত আনাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করে:-

أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَايَذْكُرُوْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِىْ أَوَّلِ الْقِرَاءَةِ وَلَا فِىْ اٰخِرِهَا.

"নিশ্চয়ই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বকর, ওমর, ওসমান (রাদিআল্লাহু আনহুম) "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" বলে ক্বিরাআত আরম্ভ করতেন। আর ক্বিরাআতের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়তেন না, ক্বিরাআতের শেষেও পড়তেন না।"

হাদীস নং- ১৬ : ইবনে আবি শায়বাহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন,

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُخْفِى بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالاِسْتِعَاذَةَ وَرَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ–

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম', 'আউযুবিল্লা' এবং 'রাব্বানা লাকাল হাম্দ" নীচুস্বরে পড়তেন।"

হাদীস নং- ১৭ : ইমাম মুহাম্মদ 'কিতাবুল আছার-এ হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (রাদ্বি.) হতে বর্ণনা করেনঃ

قَالَ اَرْبَعٌ يُخْفِيْهِنَّ الإِمَامُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَسُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَالتَّعَوُّذُ وَآمِيْنَ–

"তিনি বলেন, চার বিষয়ে ইমাম নীচু স্বরে পড়বেন -'বিসমিল্লাহ', 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা' 'আউযুবিল্লাহ' ও 'আমীন'।

হাদীস নং- ১৮-১৯ : ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ (রহ:) হযরত আয়িশা (রাদ্বি.) হতে বর্ণনা করেন:

قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ–

"তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'তাকবীরে তাহরীমা' বলে নামায শুরু করতেন এবং "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দিয়ে ক্বিরাআত আরম্ভ করতেন।

হাদীস নং- ২০ : আবদুর রায্যাক আবূ ফাখতাহ থেকে বর্ণনা করেনঃ-

اَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَايَجْهَرُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَكَانَ يَجْهَرُ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ–

" হযরত আলী মুরতাদ্বা (রাদ্বি.) বিস্মিল্লাহ উঁচু স্বরে পড়তেন না, আলহামদুলিল্লাহ উঁচু স্বরে পড়তেন।

এ প্রসঙ্গে আরো অনেক হাদীস শরীফ পেশ করা যেতে পারে; কিন্তু আমরা এখানে শুধুমাত্র বিশটা হাদীসকে যথেষ্ট মনে করছি। বিস্তারিত জানার ইচ্ছা হলে তাহাবী ও সহীহ বিখারী শরীফ কিতাবদ্বয় অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

বিবেকও চায় যে, বিসমিল্লাহ উঁচু স্বরে পাঠ না করা। প্রত্যেক সূরার শুরুতে যে বিসমিল্লাহ্ লেখা আছে তা ঐ সূরাগুলোর অংশ তথা অন্তর্ভুক্ত নয়। শুধুমাত্র সূরাগুলোকে বিভক্ত করার জন্য লেখা হয়েছে এবং হাদীস শরীফেও বর্ণিত আছে যে নেককাজ বিসমিল্লাহ পড়ে শুরু করা হয়নি তা অপূর্ণ। যেমনি ভাবে নামাযী বরকতের জন্যই ক্বিরাআতের শুরুতে আউযুবিল্লাহ পড়ে অথচ তা নীচু স্বরেই পড়ে। কেননা আউযুবিল্লাহ কোন সূরার অংশ নয়। একইভাবে বরকতের জন্যই বিসমিল্লাহ পড়া হয় এবং তা নীচু স্বরেই পড়া হয়। কেননা বিসমিল্লাহও প্রত্যেক সূরার অংশ নয়। তবে সূরা নামল শরীফে যে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' রয়েছে,তা ঐ সূরারই অংশ আর ইমামও তা উঁচু স্বরেই পড়ে থাকেন। কেননা তা ঐ সূরার আয়াত। এ জন্য ইমাম শুধুমাত্র কোরআনুল করীমকে উঁচু স্বরে পড়বেন। কিন্তু যে বিসমিল্লাহ সূরার প্রথমে লেখা হয়,তা সূরার অংশ নয় বিধায় নীচু স্বরে পড়াই বাঞ্চনীয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলায় আপত্তি ও তার জবাব

আপত্তি-নং ১ : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম প্রত্যেক সূরার অংশ। যদি অংশ না হতো তবে কোরআনুল করীমে লেখা হতো না। কারণ কোরআনুল করীমে শুধুমাত্র কোরআনুল করীমের আয়াতগুলোই লেখা হয়েছে। গায়রে কুরআন তথা কোরআনুল করীমের বহির্ভূত কোন কিছুই লেখা হয় নি। এ কারণেই অন্যান্য আয়াতে করীমার মতো বিস্মিল্লাহ্ও উঁচু স্বরে পড়াই বাঞ্চনীয়।

জবাব : এ আপত্তির কয়েকটি জবাব রয়েছে। **প্রথম জবাব হলো:** বিসমিল্লাহ প্রত্যেক সূরার অংশ নয়। কেননা তা প্রত্যেক সূরার সাথে নাযিল হয়নি। উদাহরণস্বরূপ সহীহ বোখারী শরীফের প্রারম্ভেই 'ওহীর অবতরণ শুরু হওয়ার পদ্ধতি' শীর্ষক বাবে ওহী সম্পর্কিত বর্ণনায় এসেছে যে, জিবরাঈল আমীন (আ:) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে আরয করলেন, 'ইক্‌রা'। অর্থাৎ 'পড়ুন'। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'মা আনা বিক্বা-রিইন'। অর্থাৎ আমি পাঠক নই। জিবরাঈল (আ:) পুনরায় আরয করলেন, 'ইক্‌রা'। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবারও একই জবাব দিলেন। পরিশেষে জিবরাঈল (আ:) আরয করলেন, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ বুঝা গেল এটাই প্রথম ওহী যেটাতে বিসমিল্লাহ শরীফের উল্লেখ নেই। অতএব এটাই প্রতিভাত হলো সূরাগুলোর শুরুতে বিসমিল্লাহ শরীফ নাযিল হয় নি।

দ্বিতীয় জবাব হলো: যদি বিস্‌মিল্লাহ প্রত্যেক সূরার অংশ হতো, তা হলে সূরার উপরে পৃথকভাবে দীর্ঘ অক্ষরে লেখা হতো না। যেমনিভাবে অন্যান্য আয়াতগুলো লেখা হয়েছে তেমনি ভাবে বিসমিল্লাহও অন্যান্য আয়াতগুলোর সাথে লিপিবদ্ধ করা হতো। দেখুন- সূরা 'নাম্‌ল' শরীফে বিসমিল্লাহ সূরার অংশ হওয়ায় পৃথক ভাবে ভিন্ন আঙ্গিকে লেখা হয়নি; বরং অন্য আয়াতগুলোর সাথেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। বুঝা গেলো সূরাগুলোর শুরুতে বিসমিল্লাহ-কে ভিন্ন আঙ্গিকে পৃথকভাবে লেখাটা ব্যবধানের কারণেই হয়েছে।

আপত্তি নং- ২ : তাহাবী শরীফে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সাল'মা (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত:

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِهَا فَيَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الخ

"অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে নামায আদায় করার সময় পড়তেনঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আলহামদুলিল্লাহি"...

বুঝা গেলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে বিসমিল্লাহ উঁচু স্বরে পড়তেন। তা না হলে উম্মে সালামা কি ভাবে শুনতে পেলেন?

জবাব : প্রথমত: এ হাদীসে আওয়াজ শুনার কথা উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র বিসমিল্লাহ পড়ার কথাই উল্লেখ রয়েছে। আমরাও বলি যে বিসমিল্লাহ পড়েছেন তবে নীচু স্বরে।

দ্বিতীয়ত : এটাই স্পষ্ট যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ক্ষেত্রে নীচু স্বরেই পড়তেন। যাতে বিভিন্ন হাদীস শরীফের মধ্যে ভারসাম্য ঠিক থাকে। (অর্থাৎ এখানে নীচু স্বরে পড়ার অর্থ নেওয়া হলে যে সব হাদীসে নীচু স্বরে পড়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে ওগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক হয় না)

তৃতীয়ত : যদি শুনার ব্যাপারটা মেনে নেয়া হয় তাহলেও আমরা বলি যে, ঐ সময় বিসমিল্লাহ ও আলহামদু লিল্লাহ নীচু স্বরে পড়া হয়েছিল। উম্মে সালামা ঐ স্থানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অত্যন্ত কাছে ছিলেন বিধায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নীচু আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন। ফলে এ হাদীস শরীফ দ্বারা উক্ত আপত্তি গ্রহণযোগ্য হলো না।

আপত্তি নং- ৩ : তিরমীযি শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত:

قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় নামায বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দিয়ে শুরু করতেন।"

জবাব : এর দুটি জবাব রয়েছে। প্রথম জবাব হলো- আফ্‌সোস হয় কারণ তাঁরা তিরমীযি শরীফের এ স্থানটি দেখলেন না, যেখানে ইমাম তিরমিযী বলছেন: هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِذَاكَ

"এটা এমন হাদীস যার সনদ কিছুই নয়।"

আফসোসের বিষয় হলো আমাদের উদ্ধৃত হাদীসগুলোকে ভিত্তিহীনভাবে দুর্বল বলে রদ করে দিচ্ছে অথচ তারা এমন হাদীস পেশ করছে যার কোন ভিত্তি নেই। দ্বিতীয় জবাব হলো- যদি এ হাদীস শরীফকে সহীহ বলে মেনেও নিই, তবুও এতে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়ার কথা উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র এটাই

রয়েছে যে, তিনি (দ.) নামায বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করতেন। আমরাও বলছি যে, বিসমিল্লাহ পড়া প্রয়োজন। তবে তা নীচু স্বরেই।

তৃতীয় জবাব হলো- এটাও হতে পারে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীরে তাহরীমার পূর্বেই বিসমিল্লাহ পড়েছেন। কেননা অত্র হাদীসে রাবী 'সালাতাহু' বলেছেন 'কিরাআতুহু' বলেন্নি। (অর্থাৎ রাবী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিসমিল্লাহ বলে নামায শুরু করতেন এ কথা বলেছেন কিন্তু কিরাআত শুরু করতেন এ কথা বলেন নি।)

আপত্তি নং- ৫ : তাহাবী শরীফে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আব্যা থেকে বর্ণিত:

صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَجَهَرَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَكَانَ يَجْهَرُ أَبِيْ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"আমি (বর্ণনাকারী) হযরত ওমর ফারুক (রাদ্বি)-এর পিছনে নামায পড়েছি। তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উঁচু স্বরে পড়েছেন। আমার পিতাও উঁচু স্বরে পড়তেন।

বুঝা গেল হযরত ওমর (রাদ্বি)ও বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়তেন।

জবাব ঃ এ আপত্তির কয়েকটি জবাব রয়েছে।

প্রথম জবাব হলো: এ হাদীস শরীফ খানা আমাদের প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখিত মাশহুর হাদীস শরীফগুলোর বিরোধী। সে সব হাদীসের মধ্যে বোখারী, মুসলিম ইত্যাদি কিতাবের হাদীস রয়েছে। সে সব হাদীস দ্বারা খুবই মজবুতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরাতে খোলাফায়ে রাশেদীন (রাদিআল্লাহু আনহুম) আলহামদুলিল্লাহ থেকেই ক্বিরাআত আরম্ভ করতেন। বিসমিল্লাহ নীচু স্বরে পড়তেন। এ জন্যই এ হাদীসটি বিরল পর্যায়ের আর মাশহুর হাদীস সমূহের মোকাবিলায় 'শায' তথা ব্যতিক্রমী হাদীস আমলযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় জবাব হলো : এ হাদীসের মধ্যে এ কথা স্পষ্ট নয় যে, হযরত ওমর (রাদ্বি.) নামাযের ভিতর 'সুবহানাকা, পড়ার পর 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়ার পূর্বে

বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়েছেন। এ হাদীসের অর্থ এটাও হতে পারে যে, হযরত ওমর (রাদ্বি.) নামায শেষ করে দু'আর পূর্বেই বরকতের জন্য বিসমিল্লাহ পড়তেন। এরপর দু'আ করতেন। এ অর্থ নেয়া হলে এ হাদীস আমাদের উল্লেখিত হাদীস শরীফগুলোর পরিপন্থী হয় না। যতটুকু সম্ভব হাদীস শরীফগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান করাই উচিত।

তৃতীয় জবাব হলো : সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়াটা যদি এজন্যই হয় যে, বিসমিল্লাহ প্রত্যেক সূরার অংশ, তবে তো বিসমিল্লাহ সূরার অংশ হওয়া অকাট্য ও সুদৃঢ় হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত । তাঁদের পেশকৃত হাদীস হলো খবরে ওয়াহিদ,যা এটা সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়। আফসোসের বিষয় হলো যে আমরা নীচু স্বরে বিসমিল্লাহ পড়ার প্রমাণ হিসাবে বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনা উল্লেখ করেছি। আর তাঁরা এ সবের মুকাবিলায় তাহাবী শরীফের আশ্রয় নিয়েছেন। অথচ তাহাবী শরীফের উপর তাঁদের কোন আস্থা নেই।

চতুর্থ অধ্যায়

ইমামের পিছনে মুকতাদীর কিরাআত না পড়া।

ইমামের পিছে মুকতাদী কুরআন শরীফ পড়া সম্পূর্ণ নিষেধ। কিন্তু গায়রে মুকাল্লিদ (লা-মাযহাবী) ওহাবীরা মুক্তাদীর উপর সূরা ফাতিহা পড়াকে ওয়াজিব মনে করে।

উক্ত নিষেধাজ্ঞার উপর কোরআনুল করীম, অনেক হাদীসশরীফ, বড় বড় সাহাবায়ের কেরামের অসংখ্য বাণী ও অনেক যৌক্তিক প্রমাণ রয়েছে। এ জন্য আমরা এ অধ্যায়কে দুটো পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে উক্ত নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত করেছি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উক্ত মাসয়ালার উপর বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব সন্নিবেশিত করেছি। আল্লাহ তাআলা কবূল করুন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইমামের পিছে মুকতাদীর জন্য কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা নিষেধ। চুপ থাকাই উচিত। এবার প্রমাণাদির দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক।

কোরআন শরীফ বলছেঃ

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۰

"আর যখন কোরআন শরীফ পড়া হয় তখন তা কান লাগিয়ে শোন, আর চুপ থাকো। যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়।"

স্মর্তব্য যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাযের মধ্যে পার্থিব কথা-বার্তাও বৈধ ছিলো। আর মুক্তাদীও কোরআন পড়তো। এ আয়াত দ্বারা কথা-বার্তা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

" দাঁড়িয়ে যাও আল্লাহ তায়ালার অনুগত হয়ে।"

ইমাম মুসলিম 'বাবু তাহরীমিল কালাম ফিস্ সালাত' এবং ইমাম বোখারী 'বাবু মা-য়ুনহা মিনাল কালাম ফিস্ সালাত'-এ হযরত যায়েদ বিন আরকাম

www.AmarIslam.com

(রাদ্বি.) হতে বর্ণনা করেন:

قَالَ كُنَّانَتَكَلَّمُ فِى الصَّلٰوةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ صَاحِبَهٗ وَهُوَ اِلٰى جَنْبِهٖ فِى الصَّلٰوةِ حَتّٰى نَزَلَتْ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ فَاُمِرْنَا بِالسَّكُوْتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ (لفظ مسلم)

অর্থাৎ " আমরা নামাযের মধ্যে কথাবার্তা বলতাম, এক ব্যক্তি তার পাশে দাঁড়ানো তার বন্ধুর সাথে কথা বলছিলো, এমন সময় 'কূমূ লিল্লাহি কানিতীন' আয়াতটি নাযিল হয়। এরপর আমাদেরকে চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া হলো এবং কথা বলতে নিষেধ করা হলো।"

এরপর নামাযে কথা বার্তা বলা নিষিদ্ধ হলো। কিন্তু মুক্তাদী কোরআন তিলাওয়াত করতো। যখন নিম্নোক্ত আয়াতখানা নাযিল হলো তখন মুকতাদীদের জন্য তিলাওয়াতও নিষিদ্ধ হয়ে গেলোঃ

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا..... الخ

অর্থাৎ "যখন কুরআন পড়া হবে তখন মনোযোগ দিয়ে শোন আর চুপ থাকো।"

'তাফসীরে মাদারিক' শরীফে উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে ঃ

وَجُمْهُوْرُ الصَّحَابَةِ عَلٰى اَنَّهٗ فِى اسْتِمَاعِ الْمُؤْتَمِّ

"অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের অভিমত হলো এ আয়াতটি মুকতাদীর জন্য ইমামের ক্বিরাআত শোনার ব্যাপারেই।"

তাফসীরে খাযিন-এ উক্ত আয়াতের তাফসীরে নিম্নোক্ত রিওয়ায়ত এসেছে ঃ

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ اِنَّهٗ سَمِعَ نَاسًا يَقْرَأُوْنَ مَعَ الْاِمَامِ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ اَمَا اَنْ لَكُمْ اَنْ تَفْقَهُوْا وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ....الخ

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) কিছু লোককে ইমামের সাথে সাথে কিরাআত পড়তে শুনলেন। নামায শেষ হলে তিনি বললেন, এখনও কি তোমাদের উক্ত আয়াতের মর্মার্থ বুঝার সময় আসেনি?"

www.AmarIslam.com

'তানভীরু মিক্‌য়াস মিন্‌ তাফসীরি ইবনি আব্বাস' শরীফে উক্ত আয়াতের তাফসীরে এসেছে :

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فِى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ اِلٰى قِرَاءَتِهٖ وَاَنْصِتُوْا بِقِرَاءَتِهٖ-

"যখন ফরয নামাযে কোরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন তা তোমরা কান লাগিয়ে শোন। আর কোরআন পাঠ করার সময় চুপ থাকো।

আমাদের উপরোক্ত অনুসন্ধানী আলোচনা থেকে জানা গেলো, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুকতাদীরা ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তো। কিন্তু উক্ত আয়াত নাযিলের পর ইমামের পিছনে কিরাআতের বিধান রহিত হয়েছে।

এবার হাদীস শরীফগুলোর দিকে মনোযোগ দেয়া যাক ঃ

হাদীস নং-১ : মুসলিম শরীফ, 'বাবু সুজূদিত তিলাওয়াতি'-এ আতা বিন য়াসার থেকে বর্ণিত ঃ

أَنَّهٗ سَأَلَ زَيْدَ ابْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَاقِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْئٍ

"তিনি যায়দ বিন ছাবিত-এর কাছে ইমামের সাথে কিরাআতের হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, ইমামের সাথে কিছুতেই কিরাআত পড়া জায়েয নেই।"

হাদীস নং-২ : মুসলিম শরীফ, 'বাবুত তাশাহ্‌হুদ'- এ রয়েছে :

فَقَالَ لَهٗ أَبُوْبَكْرٍ فَحَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ هُوَ صَحِيْحٌ يَعْنِى وَاِذَا قُرِئَ فَانْصِتُوْا

"আবূ বকর, সুলায়মানকে প্রশ্ন করলেন, হযরত আবূ হোরায়রা (রাদ্বি.)-এর হাদীস কেমন? তিনি বললেন, সহীহ অর্থাৎ, এ হাদীস-'যখন ইমাম ক্বিরাআত পড়বে, তখন তোমরা চুপ থাকবে' নিঃসন্দেহে সহীহ।"

হাদীস নং-৩ : তিরমিযী শরীফে হযরত জাবির (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত:

مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ فَلَمْ يُصَلِّ اِلَّا أَنْ يَّكُوْنَ وَرَاءَ الْإِمَامِ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নামায পড়লো কিন্তু তাতে সূরা ফাতেহা পড়লো না, সে যেন নামায পড়লো না। তবে যদি ইমামের পিছে হয় (তখন তোমরা পড়বে না)। এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

হাদীস নং- ৪ : 'নাসাঈ শরীফে হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত :

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ لَهٗ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوْا

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম বানানো হয়েছে তাঁর অনুসরণের জন্যই। যখন তিনি তাকবীর বলবেন, তখন তোমরাও তাকবীর বলো। আর যখন তিনি কুরআন পড়বেন, তখন চুপ থাকো।"

আমরা ২নং হাদীসে মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছি যে, হযরত আবূ হোরায়রা (রাদ্বি.)-এর এ হাদীসটি সহীহ।

হাদীস নং-৫ : তাহাবী শরীফে হযরত জাবির (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهٗ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهٗ قِرَاءَةٌ

"নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যার ইমাম আছে, ইমামের তিলাওয়াতই তার তিলাওয়াত।"

হাদীস নং-৬-১০ : ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) মুয়াত্তা শরীফে ইমাম আবূ হানীফা থেকে, তিনি মূসা ইবনে আবি আয়িশা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ থেকে, তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাদ্বি) থেকে বর্ণনা করেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهٗ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهٗ قِرَاءَةٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَابْنُ الْهُمَامِ

هٰذَا الْإِسْنَادُ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ۔

অর্থাৎ, 'নবী করীম ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যার ইমাম আছে সে ইমামের ক্বিরাআত হচ্ছে তার ক্বিরাআত।' মুহাম্মদ ইবনে মুনী ও ইমাম ইবনুল হুমাম বলেন, এ হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ।"

এ হাদীসটি ইমাম আহমদ ইবনে মাজাহ, দারু-কুত্বনী, বায়হাকীও বর্ণনা করেছেন।

হাদীস নং-১১ : তাহাবী শরীফে হযরত আনাস (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত :

قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَقْبَلَ بِوَجْهِه فَقَالَ اَتَقْرَءُوْنَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ فَسَكَتُوْا فَسَأَلَهُمْ ثَلَاثًا فَقَالُوْا إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوْا۔

"'হযরত আনাস (রাদ্বি) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামায পড়ালেন। এরপর তিনি সাহাবায়ে কেরামের দিকে ফিরে বললেন, ইমামের ক্বিরাআতের সময় তোমরাও কি তিলাওয়াত করো? সাহাবায়ে কেরাম চুপ থাকলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রশ্ন তিনবার করলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, হ্যাঁ আমরা তা করি। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তা করো না।" (অর্থাৎ, তোমরা ইমামের পিছে তিলাওয়াত করবে না)

হাদীস নং-১২ : তাহাবী শরীফে হযরত আলী (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত :

مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلٰى فِطْرَةٍ

"যে ব্যক্তি ইমামের পিছে তিলাওয়াত করবে, সে নিয়মের উপর নেই।"

হাদীস নং-১৩ : দারু কুত্বনী হযরত আলী (রাদ্বি) হতে বর্ণনা করেন:

أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْرَءُ خَلْفَ الْإِمَامِ أَوْ أَنْصِتُ قَالَ بَلْ أَنْصِتْ فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ

"হযরত আলী (রাদ্বি) বলেন, এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে প্রশ্ন করলো, আমি কি ইমামের পিছে তিলাওয়াত করবো, না চুপ থাকবো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বরং চুপ থাকবে আর এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট।"

হাদীস নং-১৪ : দারু-কুত্বনী হযরত শা'বী হতে বর্ণনা করেন :

أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ

"হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইমামের পিছনে ক্বিরাআত জায়িয নেই।"

হাদীস নং-১৫ : ইমাম বায়হাকী ক্বিরাআত-এর আলোচনায় হযরত আবু হোরায়রা (রাদ্বি.) হতে বর্ণনা করেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ صَلٰوةٍ لَايُقْرَأُ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ إِلَّاصَلٰوةٌ خَلْفَ الْإِمَامِ

"নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে নামাযের মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়া হয়নি তা অসম্পূর্ণ। তবে ঐ নামায নয়, যা ইমামের পিছে পড়া হয়।"

হাদীস নং-১৬-১৭ : ইমাম মুহাম্মদ মুয়াত্তায়, আবদুর রায্যাক স্বীয় মুছান্নাফে হযরত ওমর (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন,

قَالَ لَيْتَ فِيْ فَمِ الَّذِيْ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ حَجَرًا

"যে ইমামের পিছে তিলাওয়াত করে,তার মুখে পাথর হোক।"

হাদীস নং- ১৮-২৪ : ইমাম তাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, যায়দ বিন সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, হযরত আলক্বামা, হযরত আলী মুরতাদ্বা, হযরত ওমর (রাদ্বি.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে পরিপূর্ণ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন যে, এ সমস্ত হযরাতে কেরাম ইমামের পিছে কিরাআতের সম্পূর্ণ বিরোধী। উনাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, যে ইমামের পিছে তিলাওয়াত করবে তার মুখে আগুন দেয়া হবে। কেউ কেউ বলেন, তার মুখে পাথর। আবার অনেকে বলেন, তা স্বভাব বিরুদ্ধ। আর আমরা লেখার কলেবর বৃদ্ধির আশংকা না থাকলে ঐ সব

রেওয়ায়াত এখানে উল্লেখ করতাম। এ ছাড়া ইমামের পিছে ক্বিরাআতের বিরুদ্ধে অনেক হাদীস শরীফ রয়েছে। আমরা এখানে শুধুমাত্র ২৪ টি হাদীসকে যথেষ্ট মনে করছি। যদি কারো এ সব হাদীস অধ্যয়নের ইচ্ছা থাকে তাহলে তাহাবী শরীফ, মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, সহীহ্ বিখারী শরীফ, আর আমার প্রণীত বোখারী শরীফের হাশিয়া 'নঈমুল বারী' ইত্যাদি কিতাব পড়ে দেখতে পারেন।

বিবেকও চায় যে মুকতাদী ইমামের পিছে তিলাওয়াত না করুক কয়েকটি কারণে :

(১) নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া যেমন জরুরী তেমনি অন্য সূরা মিলানোও জরুরী। মুসলিম শরীফে বর্ণিত :

لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَصَاعِدًا

"তার নামায হবে না,যে সূরা ফাতিহা এবং অন্য কিছু (অন্য আয়াত) পড়বে না।"

গায়রে মুকাল্লিদরাও স্বীকার করে যে, মুকতাদী ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করবে না। তাহলে সূরা ফাতিহাও তিলাওয়াত না করা চাই। কেননা অন্য সূরার ক্ষেত্রে যদি ইমামের পড়াই যথেষ্ট হয়,তাহলে সূরা ফাতিহার বেলায়ও ইমামের তিলাওয়াত যথেষ্ট হবে।

(২) যে ব্যক্তি রুকূতে গিয়ে ইমামের সাথে নামাযে শরীফ হয়, সে পূর্ণ রাকআত পেয়ে যায়। যদি মুকতাদীর উপর সূরা ফাতিহা পাঠ করা আবশ্যক হতো,তা হলে সে পূর্ণ রাক্আত পেতো না।

দেখুন! এ লোকটি তাকবীরে তাহরীমা বলেনি এবং তাকবীরে তাহরীমার পথে এক তাসবীহ পরিমাণ সময়ও দাঁড়ায় নি। বরং সোজা রুকূতে চলে গিয়েছে। তাহলে (তাদের মতানুযায়ী) সে রাকআত পায়নি। কেননা তাকবীরে তাহরীমা ও ক্বিয়াম মুকতাদীর উপর ফরয। যদি এরূপ হতো যে তার উপর সূরা ফাতিহা ফরয হতো,তাহলে তা পড়া ছাড়া তার রাকআত হতো না। বুঝা গেলো, ইমামের ক্বিরাআত তার জন্য যথেষ্ট। যখন এ মুকতাদীর জন্য ক্বিরাআত প্রয়োজন না হয়, তাহলে অন্যান্য মুকতাদীর বেলায়ও ক্বিরাআত প্রয়োজন নেই।

(৩) যদি মুকতাদীর উপর সূরা ফাতিহা পড়া এবং 'আমীন' আবশ্যক হয়

www.AmarIslam.com

তাহলো বলো- যদি ইমাম মুকতাদীর পূর্বে সূরা ফাতিহা শেষ করে আর মুকতাদী তখনও সূরা ফাতিহার মাঝখানে হয় তাহলে মুক্তাদী আমীন বলবে কিনা ? যদি বলে তাহলে ফাতিহা শেষ করেই 'আমীন' বলবে। আর যদি না বলে তো হাদীস উল্লেখ করেই জবাব দিন, না দু'বার আমীন বলা জায়েয আছে, না সূরা ফাতিহার মাঝখানে আমীন বলা বৈধ?

(৪) যদি মুকতাদী সূরা ফাতিহার মাঝখানে হয় আর ইমাম রুকূতে চলে যায় তখন মুকতাদী কি সূরা ফাতিহা অর্ধেক বাদ দিয়ে দেবে,না রুকু বাদ দেবে? জবাব যাই দিন প্রমাণ স্বরূপ হাদীস দেখান। নিজের জ্ঞান ও ধারণা প্রসূত জবাব দিবেন না।

(৫) রাজ দরবারে যখন এক দল লোক যায় তখন সবাই দরবারের শিষ্টাচারিতা-নিয়মকানুন পালন করে। কিন্তু আবেদন -নিবেদন সবাই করে না বরং সবার পক্ষ থেকে দল নেতাই করে।

অনুরূপ নামাযীরাও জামায়াতে নামায পড়ার সময় আল্লাহ্ তাআলার সমীপে ঐ দলের মতই উপস্থিত হয়ে তাকবীর তাসবীহ, তাশাহ্হুদ ইত্যাদি পড়ে ঐ মহান দরবারের রীতি-নীতি সব পালন করবে। কিন্তু কোরআন তিলাওয়াত হলো বিশেষ নিবেদন যা দলের নেতা তথা ইমামই পেশ করবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উক্ত মাসআলার উপর আপত্তি ও তার জবাব

উক্ত মাসআলার ব্যাপারে গায়রে মুকাল্লিদরা আজ পর্যন্ত যে সব বিরোধীতা করেছে,আমরা আল্লাহর ফযলে প্রত্যেকটি উল্লেখ করে সবকটির পৃথক পৃথকভাবে জবাব দিয়েছি। আর আমরা যেভাবে তাদের আপত্তিগুলো উল্লেখ করেছি ইনশাআল্লাহ এভাবে ওরাও করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন।

আপত্তি নং- ১ : وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ - এ আয়াতে কোরআন দ্বারা জুমুআর খুতবাকে বুঝানো হয়েছে, মুক্তাদীর নামাযের বেলায় নয়। যেমন কতেক মুফাস্সির এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, এ জন্যই জুমুআর খুতবা চলাকালীন চুপ থাকা ওয়াজিব। কিন্তু মুকতাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নিষেধ নয়।

জবাব : এটা ভুল। এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ সূরা আ'রাফের একটি আয়াত। আর জুমআর নামায এবং খুতবা মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের পরে শুরু হয়েছে। তাহলে এ আয়াতের উদ্দেশ্য খুতবা হবে কি ভাবে? দ্বিতীয়ত: জোর জবরদস্তি করে যদিও মেনে নিই তবুও আয়াতের মধ্যে খুতবাকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। শুধুমাত্র কুরআন পাঠ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ জন্য এ হুকুমটি সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য। এতে আয়াতের ব্যাপকতা মেনে নেয়া হয়। এমনকি শানে নুযূলেও এ হুকুমকে কোন বিষয়ের সাথে নির্দিষ্ট করা হয় নি।

তৃতীয়ত : খুতবা চলাকানীন কোন লোকের সাথে কথাবার্তা বলা হারাম। অথচ খুতবা পুরোটাই কোরআন নয়। বরং এতে কোরআনুল করীমের দু'একটি আয়াত পড়া হয়ে থাকে। তাহলে ইমামের পিছে চুপ থাকাটা কেন ওয়াজিব হবে না? অথচ তখন শুধু কোরআনই পাঠ করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় এরা খুতবার সময় চুপ থাকা ওয়াজিব বলছে,কিন্তু ইমামের পিছে নয়।

আপত্তি নং-২ : আয়াতে করীমা "وَإِذَا قُرِئَ" দ্বারা মক্কার মুশরিকদের সম্বোধন করা হয়েছে, যারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোরআন তিলাওয়াতের সময় হৈ-হুল্লোড় করতো, আয়াতের উদ্দেশ্য হলো কোরআন তিলাওয়াত করার সময় দুনিয়াবী কথাবার্তা বলে হৈ চৈ করো না। এ জন্য সূরা ফাতিহা পড়া এ আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়।

জবাব : এ কথাটাও সম্পূর্ণ ভুল। আয়াতে শুধুমাত্র মুসলমানদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা কাফিরদের উপর ঈমান আনার পূর্ব পর্যন্ত কোন ইবাদত ওয়াজিব নয়। কোরআন শ্রবণ করাও ইবাদত। এটা কাফিরদের উপর ঈমান আনা ছাড়া কিভাবে ওয়াজিব হবে?

দ্বিতীয়ত ঃ উক্ত আয়াতে করীমার শেষে রয়েছে: لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ "যাতে তোমাদের উপর অনুগ্রহ করা হয়।" কোরআন শোনার কারণে শুধুমাত্র মুসলমানদের উপরই রহমত আসবে। কোন কাফির ব্যক্তি ঈমান ছাড়া কোন নেক কাজ করলে রহমত পাওয়ার যোগ্য হবে না। আল্লাহ তাআলা বলছেন :

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً

"কিন্তু কাফের আপনার দিকে কান লাগায়, আমি তাদের দিলের উপর পর্দা ঢেলে দিয়েছি।"

দেখুন! কাফিরদের কানে শোনার মধ্যে কোন উপকার নেই। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন :

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا

"আর ওরা যা কিছু আমল করেছে,আমি স্বেচ্ছায় তা বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করেছি।"

আর যদি কাফির পুরো কোরআন মুখস্ত করে ফেলে এবং প্রতিদিন তিলাওয়াত করতে থাকে,তবুও ছাওয়াব পাওয়ার যোগ্য হবে না।

অযু ছাড়া নামায পড়া জায়েয নেই। ঈমান ছাড়া কোন ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত : কোরআনুল করীমে ইরশাদ হয়েছে وَأَنْصِتُوْا 'চুপ থাকো'। চুপ থাকার অর্থ হলো কথা বলো না। কিছু পড়ো না। যদি সূরা ফাতিহা পড়তে থাকে,তাহলে চুপ থাকা হলো কোথায়? বাস্তবতা হচ্ছে, এ আয়াতখানা, না কাফিরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে আর, না জুমুআর খুতবার ব্যাপারে। নামাযীদেরকে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত থেকে নিষেধ করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে।

বায়হাকী শরীফে হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত-

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الصَّلٰوةِ فَسَمِعَ قِرَاءَةَ فَتًى مِنَ الْاَنْصَارِ فَنَزَلَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ

"হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের মধ্যে ক্বিরাআত পাঠকরছিলেন অতঃপর তিনি এক আনসারী যুবকের ক্বিরাআত শুনতে পেলেন। তখনই এ আয়াত وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ অবতীর্ণ হলো।"

ইবনে মারদাভিয়াহ স্বীয় তাফসীরে সনদসহ মুয়াবিয়া বিন কুররাহ থেকে

 www.AmarIslam.com

বর্ণনা করেন: উনারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল থেকে এ আয়াতের অবতরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি জবাব দেন :

قَالَ إِنَّمَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ وَإِذَا قُــرِئَ الْقُـرْآنُ (الخ) فِى الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَاسْتَمِعُوْا وَأَنْصِتُوْا

"এ আয়াতটি ইমামের পিছে ক্বিরাআতের বিধান সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এ জন্য যখন ইমাম তিলাওয়াত করবে তখন কান লাগিয়ে শোন এবং চুপ থাকো।'

আপত্তি নং- ৩ : যদি কোরআন তিলাওয়াতের সময় সবাইকে চুপ থাকার বিধান হয়,তাহলে সমস্যা সৃষ্টি হবে। বর্তমানে রেডিওতে কোরআন তিলাওয়াত হয়- যা সারা দেশেই শোনা যায়। এমন হলে সবার কাজকর্ম, কথাবার্তা, সালাম সব হারাম হয়ে যাবে।

ইমাম তারাবীহ'র নামায পড়ানোর সময় এক ব্যক্তি আসলো। সে তখনো ফরয নামায আদায় করেনি। সে একই মসজিদে এশার নামায পড়তে লাগলো। অথচ সেখানে ইমামের ক্বিরাআতের শব্দ আসছে। তাহলেতো তার নামাযও হারাম হবে। এ অর্থ হলে তা উম্মতের উপর অত্যন্ত কঠিন হবে।

জবাব : সমস্ত উম্মতের ঐক্যমত্য হলো- কোরআন তিলাওয়াত শোনা ফরযে কিফায়াহ, ফরযে আইন নয়। যদি ক্বারীর ক্বিরাআত একজন মুসলমানও শুনে তাহলে যথেষ্ট। যে ভাবে জানাযার নামায সবার উপর ফরয কিন্তু একজন আদায় করলে সবাই দায়মুক্ত হয়ে যায়। ইমামের পিছে সব মুকতাদীর হুকুম এক ব্যক্তির মতই, যেভাবে জানাযার নামাযের জামাআত। এ জন্য মুকতাদীদের মধ্যে কেউ সালাম কালাম, তিলাওয়াত ইত্যাদি করতে পারবে না। গায়রে মুকতাদীদের জন্য মুকতাদীদের শোনাটাই যথেষ্ট হবে। হ্যাঁ যদি সবাই কাজকর্মে লিপ্ত থাকে কেউ না শুনে,তখন উঁচু আওয়াজে তিলাওয়াত করা নিষেধ। এজন্যই একই বৈঠকে অনেক লোক একই সাথে বড় আওয়াজে কোরআনে করীম তিলাওয়াত করা নিষেধ। একজন তিলাওয়াত করবে অন্যরা সবাই শুনবে কিংবা সবাই চুপি চুপি পড়বে। এ বিষয়ে শামী ও অন্যান্য ফিক্‌হের কিতাবের আলোচনা দেখুন। সুতরাং কোন সমস্যা নেই।

www.AmarIslam.com

আপত্তি নং- ৪ : তাহলে তো মকতবে অনেকগুলো ছেলে একই সাথে উঁচু আওয়াজে কোরআন শরীফ মুখস্ত করতে পারবেনা। কারণ এতে সমস্যা হয়ে যায়।

জবাব ঃ ওটাতো তা'লীমে কোরআন তথা কোরআন শিক্ষাদান, তিলাওয়াতে কোরআন নয়। কোরআন তিলাওয়াত শুনা ফরয,তা'লীমে কোরআন শোনা ফরয নয়। এ জন্য রব তাআলা إِذَا قُــرِئَ الخ যখন তিলাওয়াত করা হবে বলেছেন إِذَا تُعَلِّمَ 'যখন শিক্ষা দেয়া হবে' বলেননি। দেখুন রব তায়ালা বলছেন- فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ অর্থাৎ, 'যখন তোমরা কোরআন তিলাওয়াত করবে,তখন 'আউযু বিল্লাহ পড়ো।'

কোরআন তিলাওয়াতের পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়তে হবে। কিন্তু যখন ছাত্র শিক্ষককে কোরআন শুনাবে তখন আউযুবিল্লাহ পড়বে না। কেননা এটা তিলাওয়াতে কোরআন নয়,'তা'লীমে কুরআন। (শামী ও অন্যান্য)

যেমন-কোরআন শরীফ ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে ছাপানো নিষেধ। সৌন্দর্য ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। অথচ শিশুদের শিক্ষা দেয়ার জন্য শেষ পারাটি উল্টা ছাপানো হয় এবং উল্টাই পড়ানো হয়।

তা'লীম তথা শিক্ষা ও ক্বিরাআতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। স্বয়ং কোরআনই তিলাওয়াত ও তা'লীমের মধ্যে পার্থক্য করেছে। রব তাআলা বলেন:

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ (الخ)

"ঐ নবী মুসলমানদের কাছে আয়াতগুলো পড়ে শোনান, তিনি তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কোরআন ও হিক্মত শিক্ষা দেন।"

যদি তিলাওয়াত ও তা'লীমের মধ্যে পার্থক্য না থাকতো তাহলে এখানে এ দু'টিকে আলাদাভাবে কেন উল্লেখ করা হলো?

আপত্তি নং- ৫ : আপনাদের উদ্ধৃত হাদীস قِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ এবং وَإِذَا قُرِئَ فَانْصِتُوْا -এ ক্বিরাআত শব্দ রয়েছে যার অর্থ পড়া। তো ঐ হাদীসগুলোর উদ্দেশ্য এই যে- যখন ইমাম তিলাওয়াত করবে,তখন তোমরা চুপ থাকো। হোক তা কুরআন পড়া বা অন্য কিছু পড়া থেকে। তাহলে ইমামের পিছে সুবহানাল্লাহ, আত্‌তাহিয়্যাত, দুরূদ ইত্যাদি কিছুই পড়া যাবে না। কেননা

www.AmarIslam.com

ইমাম তা পড়ছেন।

জবাব ঃ এ আপত্তির দুটো জবাব রয়েছে। একটি ইলযামী অপরটি 'তাহক্বীকি' তথা অনুসন্ধানমূলক।

ইলযামী জবাব হলো যদি এভাবেই শব্দগুলোর শুধু আভিধানিক অর্থ করা হয়,তাহলে আপনারা বিপদে পড়ে যাবেন। আপনারা নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে থাকেন। 'হাদীস' শব্দের অর্থ হচ্ছে কথা-বার্তা, কিচ্ছা-কাহিনী। রব তায়ালা বলেনঃ

فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ, 'এরপর কোন্ কথার উপর ইমান আনবে? এবং আরো বলেন, فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيْثَ (আমি ওসব উম্মতকে কিচ্ছা-কাহিনীতে পরিণত করেছি।) 'আহলে হাদীস' এর অর্থ হলো- কথাবার্তা রচনাকারী, কিচ্ছা-কাহিনী, উপন্যাস ইত্যাদির পাঠক বা বর্ণনাকারী। জনাব, এখানে 'হাদীস'এর পারিভাষিক অর্থ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ। ওহী শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- ইশারা তথা ইংগিত। ইসলাম অর্থ হলো আনুগত্য। কালিমার অর্থ শব্দ। এ শব্দগুলো এ সব অর্থে কোরআনে করীমে ব্যবহৃত হয়েছে। এবার বলুন- আপনারা কোথায় যাবেন। এমন হলে তো পুরো ইসলামই শেষ আর কুরআনে করীমের সমস্ত হুকুমই ধ্বংস।

তাহক্বীক্বী তথা অনুসন্ধান মূলক জবাব হলো- নামাযের প্রসঙ্গে যখন ক্বিরাআত শব্দ বলা হবে তখন এ উদ্দেশ্য তিলাওয়াতে কোরআনই হবে। আমরা বলি- নামাযের ছয়টি রুক্ন তাকবীরে তাহরীমা, দাঁড়ানো, কিরাআত, রুকু, সিজ দা, অত্তাহিয়্যাতু -এ বসা। এখানে দাঁড়ানোর অর্থ নাচতে দাঁড়ানো আর ক্বিরাআত' এর অর্থ উপন্যাস পড়া নয়। একটু বুঝে শুনে কথা-বার্তা বলুন। এতটুকুন জ্ঞান নিয়ে হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বুঝার দাবী করা হচ্ছে।

گر همیں مکتب و همیں ملا + کار طفلاں تمام خواهد شد

অর্থাৎ মক্তবের মল্লা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পড়ানো যায়না।

আপত্তি নং-৬ঃ মুসলিম ও বোখারী শরীফে রয়েছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আল-

াইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন:

لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"যে সূরা ফাতিহা পড়বেনা,তার নামায হবেনা।"

এ হাদীস দ্বারা দুটো মাসআলা জানা যায়। একটি হলো- নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয। এটা ছাড়া নামায মোটেও শুদ্ধ হবেনা, যেভাবে দাঁড়ানো ও রুকূ করা ইত্যাদি করা ব্যতিত নামায শুদ্ধ হয়না। অপরটি হলো- সবার উপরই ফাতিহা ফরয। নামাযী একাকী হোক, ইমাম হোক বা মুক্তাদী হোক, হাদীসের মধ্যে কোন শর্ত নেই।

জবাব : এ আপত্তির তিনটি জবাব রয়েছে; দু'টি এলযামী, একটি তাহক্বীক্বী তথা অনুসন্ধানমূলক। প্রথম ইলযামী জবাব হলো এহাদীসখানা ইমাম মুসলিম এ ভাবেই উল্লেখ করেছেনঃ

لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَصَاعِدًا

"তার নামায হবেনা যে সূরা ফাতিহা এবং অতিরিক্ত কিছু পড়বে না।" এবং মুয়াত্তা ইমাম মালিক এ হাদীসটি এ ভাবেই আছে لَا صَلٰوةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالسُّوْرَةِ "সূরা ফাতিহা এবং একটি সূরা ব্যতীত নামায হবে না।"

আপনাদের উচিত হবে মুক্তাদীর উপর সূরা ফাতিহাও ফরয মনে করবেন এবং অন্য সূরা মিলানোও ফরয মনে করবেন। এমন না হলে কিছু হাদীসের উপর ঈমান আনা হয়, আবার কিছু হাদীস অস্বীকার করা হয়।

দ্বিতীয় ইলযামী জবাব হলো: আপনাদের পেশকৃত হাদীস কোরআনুল করীমেরও বিরোধী। আবার ঐ সব হাদীসের ও বিরোধী,যা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। এমনকি আপনাদের মতের ও বিরোধী। কোরআনে করীম বলছেঃ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ "যে পরিমাণ কোরআন সহজ হয়,পড়ে নাও।"

আবার সূরা ফাতিহা পড়া কি ভাবে ফরয হবে। আল্লাহ স্বয়ং বলছেন-

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا

অর্থাৎ "যখন কোরআন পাঠ করা হবে,তখন মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাকো।" এরপর মুকতাদী ইমামের সাথে সাথে সূরা ফাতিহা পড়ে আল্লাহ তায়ালার হুকুমের বিরোধীতা কিভাবে করবে? আমরা অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছি,যাতে বলা হয়েছে যে 'ইমামের ক্বিরাআতই মুক্বতাদীর ক্বিরাআত। যখন ইমাম তিলাওয়াত করবে,তখন তোমরা চুপ থাকবে ইত্যাদি।

তোমরাও বলছো, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে রুকূতে গিয়ে মিলিত হয়েছে সে রাকাআত পেয়েছে। যদি মুকতাদীর উপর সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয হতো, তাহলে তা ব্যতীত রাকাআত পেলো কিভাবে?

সর্বোপরি অযু, পবিত্রতা, তাকবীরে তাহরীমা, দাঁড়ানো ফরয। ওসব থেকে কোনটা ছেড়ে রুকুতে গিয়ে মিলিত হলে,সে নামায হবেনা। সূরা ফাতিহা মাফ হলো কিভাবে? সেটাতো ফরয ছিলো।

জাওয়াবে তাহক্বীক্বী হলো: এ হাদীসের অর্থ এমনভাবে করতে হবে যাতে কোরআন ও হাদীসের মধ্যে কোন বৈপরীত্য না থাকে। হাদীসগুলোকে পরস্পর বিশ্লেষণ করা হলে কোন বিরোধই থাকে না। আর তাহলো- لَاصَلٰوةَ এর لَا টি হলো لانفى جنس যার ইস্‌ম হলো صَلٰوةَ আর খবর টি লুকায়িত। তা হলো كَامِلٌ এর অর্থ হলো সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায পরিপূর্ণ হবে না।

সাধারণত যে কোন ক্বিরাআত কোরআনের হুকুম মতে ফরয আর সূরা ফাতিহা হাদীসের হুকুম অনুযায়ী ওয়াজিব।

لَا صَلٰوةَ بِحُضُوْرِ الْقَلْبِ لَاصَلٰوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ اِلَّا فِى الْمَسْجِدِ

"হুযূরী কৃলব তথা অন্তরের একাগ্রতা ব্যতীত নামায হবে না। আর মসজিদের কাছে থাকা ব্যক্তির জন্য মসজিদ ছাড়া নামায হবে না।"

অতঃপর لَمْ يَقْرَأْ قِرَاءَةً এ হুকমী ও হাক্বীক্বী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ইমাম ও একাকী নামাযীর উপর সূরা ফাতিহা পাঠ করা বাস্তবিকই ওয়াজিব। আর মুকতাদীর উপর হুকমী ওয়াজিব। কেননা ইমামের পড়াই তার পড়া। আমাদের পেশকৃত হাদীসগুলো এ হাদীসের তাফসীর তথা ব্যাখ্যা। অথবা এ হাদীসটি আম তথা ব্যাপক অর্থবোধক। আর আমাদের পেশকৃত হাদীসগুলো

এ হাদীসটির হুকুমকে নির্দিষ্ট করছে, যা মুকতাদীর জন্য এ হুকুমকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

আপত্তি নং- ৭ : তিরমীযি শরীফে হযরত উবাদা বিন সামিত থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। যার শেষের দিকে কিছু শব্দ নিম্নরূপ ঃ

قَالَ اِنِّىْ اَرَاكُمْ تَقْرَءُوْنَ وَرَاءَ اِمَامِكُمْ قَالَ قُلْنَا بَلٰى قَالَ لَا تَقْرَاُوْا اِلَّابِاُمِّ الْقُرْاٰنِ

"হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে বলেন- আমার ধারণা তোমরা ইমামের পিছে তিলাওয়াত করো। আমরা বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কোন সূরা পড়ো না।"

এ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ইমামের পিছে মকতাদী সূরা ফাতিহা পড়বে,অন্য কোন সূরা পড়বেনা। আমরাও এটাই বলে থাকি। উবাদা ইবনে সামিত-এর এ হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসায়ী ও বায়হাকী শরীফের মধ্যেও রয়েছে।

জবাব : এ আপত্তির কয়েকটি জবাব রয়েছে। একটি হলো- এ হাদীসখানা আপনাদের মতেরও বিরোধী। কেননা আপনারাও বলেন যে, ইমামের সাথে রুকূতে মিলিত হলে রাকআত পেয়ে যায়। জনাব মুকতাদীর উপর যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরজ, তা হলে তা পাঠ করা ব্যতীত এ মুকতাদী কিভাবে রাকআত পাবে? এর জবাব খুজঁতে থাকুন। যে জবাবই আপনারা দেবেন তাই আমাদের জবাব হবে।

দ্বিতীয়ত : শুধুমাত্র উবাদা ইবনে সামিত থেকেই এ মারফূ' হাদীসটি বর্ণিত- যাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমামের পিছে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এর বিপরীতে হযরত জাবির, আলকামা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, যায়দ ইবনে সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আলী ও ওমর (রদ্বিআল্লাহু আনহুম) এর রিওয়ায়াত বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। যার মধ্য থেকে কিছু রিওয়ায়াত আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। আর তাহাবী শরীফ, সহীহ বোখারী শরীফে আরো অনেক বর্ণিত রয়েছে। হযরত উবাদার এ হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ। আর ঐ সমস্ত সাহাবীর

রিওয়ায়াত গুলো হলো হাদীসে মাশহুর। তাই ওগুলোই প্রাধান্য পাবে।

তৃতীয়ত : আপনাদের উপস্থাপিত হযরত উবাদার (রাদ্বি.) হাদীসটি কোরআন করীমেরও বিরোধী। তিলাওয়াতে কোরআনের সময় চুপ থাকার নির্দেশ দিয়েছে। আমাদের উপস্থাপিত হাদীসগুলোকে কোরআন সমর্থন করছে। এ জন্যই এগুলো অগ্রগণ্য।

চতুর্থত : আপনাদের উপস্থাপিত হাদীসে ইমামের পিছে সূরা ফাতিহা পড়ার হুকুম রয়েছে। আর আমাদের পেশকৃত এ হাদীসগুলোর মধ্যে এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। দলীলের মধ্যে বৈপরীত্য থাকলে নিষেধাজ্ঞার দলীলগুলোই প্রাধান্য পাবে। দেখুন! আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সম্মানসূচক সিজদা করার হুকুম কোরআনে করীমেই বিদ্যমান। ফিরিস্তাদেরকে এ হুকুম দেয়া হয়েছিল। শয়তান ঐ গায়রুল্লাহ্কে সিজদা না করার কারণে তাকে অভিশপ্ত করা হলো। কিন্তু অন্যান্য দলীলাদিতে ঐ সিজদাকে নিষেধ করা হয়েছে। বর্তমানেও ঐ নিষেধাজ্ঞার উপরই আমল করা হয়।

পঞ্চমত : উবাদা ইবনে সামিত-এর এর হাদীসটি ইমাম বোখারী (রাদ্বি.) উল্লেখ করেননি। তবে ইমাম মুসলিম নিষেধ করেননি। হাদীসটি মুসলিম শরীফে বিদ্যমান। ইমাম তিরমিযি এটি উল্লেখ করে সহীহ বলেননি। বরং হাসান বলেছেন। আর বলেছেন অধিক বিশুদ্ধ হচ্ছে অন্যটি। উদ্ধৃতি পর্যবেক্ষণ করো। তিরমিযী শরীফে আপনাদের হাদীসের সাথেই আছে:

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ عُبَادَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَرَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ رَبِيْعٍ عَنْ عُبَادَةَ اِبْنِ صَامِتٍ قَالَ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَهٰذَا اَصَحُّ

"আবূ ঈসা বলছেন- উবাদার এ হাদীসটি হাসান (সহীহ নয়)। এ হাদীসটি যুহরী মাহমূদ বিন রবী থেকে তিনি উবাদা ইবনে সামিত থেকে বর্ণনা করেন। হযরত উবাদা বিন সামিত (রাদ্বি.) বলেছেন, যে সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার নামায হবে না এবং এ রিওয়ায়াতটিই অধিক বিশুদ্ধ।"

বুঝা গেল ঐ শব্দগুলোই অধিক বিশুদ্ধ, যেগুলোতে মুকতাদী ইমামের পিছে

সূরা ফাতিহা পড়ার কথা উল্লেখ নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার, তারা সহীহ হাদীসগুলোর বিপক্ষে এমন একটি হাদীস উপস্থাপন করছে যেটি কোরআন এবং মাশহুর হাদীস গুলোরও বিরোধী। আর ইমাম তিরমিযীর মতে সহীহও নয়। বরং হাসান। আর এর বিপরীতে রয়েছে অধিক বিশুদ্ধ হাদীস। যে অপবাদ হানাফীদেরকে দিয়ে থাকেন, তা আপনাদের বেলায় ও প্রযোজ্য।

আপত্তি নং- ৮ : অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের আমল এটাই ছিলো যে উনারা ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করতেন। ইমাম তিরমিযী উক্ত উবাদা (রাদ্বি.)-এর হাদীস প্রসঙ্গে বলেন :

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ فِى الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِيْنَ

"ইমামের পিছে তিলাওয়াত করার ব্যাপারে অনেক সাহাবী ও তাবেয়ীর (রাদ্বি.) আমল এ হাদীসের উপরই।"

যখন অনেক সাহাবীর (রাদ্বি) আমল এর উপরই, তাই অবশ্যই সূরা ফাতিহা পড়া চাই।

জবাব : এ আপত্তির কয়েকটি জবাব রয়েছে। প্রথম জবাব হলো- এখানে ইমাম তিরমিযীর اَكْثَرُ তথা অনেক বলা ইযাফী তথা আপেক্ষিক নয় বরং হাক্বীক্বী তথা বাস্তবিক। এটার অর্থ এ নয় যে, অধিক সংখ্যক সাহাবী ইমামের পিছে সূরা ফাতিহা পড়তেন, কম সংখ্যক সাহাবী পড়তেন না। বরং اَكْثَرُ অর্থ কতিপয় বা কিছু সংখ্যক। কোরআনে করীম বলছে-

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفَاسِقِيْنَ

"ওটার দ্বারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আর অনেককে হিদায়াত করেন।"

বাস্তবতা হলো- অধিকাংশ সাহাবী ইমামের পিছে ক্বিরাআতের পুরোপুরি বিরোধী।

(১) হযরত যায়দ বিন সাবিত (রাদ্বি.) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছে

তিলাওয়াত করবে,তার নামায হবে না। (সহীহ বুখারী)

(২) হযরত আনাস (রাদ্বি.) বলেন, যে ইমামের পিছে তিলাওয়াত করবে, তার মুখ আগুন দ্বারা পূর্ণ করে দেয়া হবে। (ইবনে হাব্বান)

(৩) হযরত আবদুল্লাহ (রাদ্বি.) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছে তিলাওয়াত করবে,তার মুখ দুর্গন্ধে ভরে যাবে। (ইবনে হাব্বান)

(৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (৫) হযরত আলকামা (রাদ্বি.) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছে পাঠ করবে,তার মুখে মাটি। (তাহাবী শরীফ)

(৬) হযরত আলী মুরতাদ্বা (রাদ্বি.) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছে তিলাওয়াত করবে,সে ফিতরাত তথা স্বভাবের উপর নেই। (তাহাবী শরীফ)

(৭) হযরত যায়দ বিন সাবিত (রাদ্বি.) বলেন, যে ইমামের পিছে তিলাওয়াত করবে,তার নামায হবে না। (ইবনে জাওযী ফিল ইলাল)

(৮) হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছে তিলাওয়াত করবে, তার মুখে পাথর। মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ও আবদুর রায্যাক)

(৯) হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাদ্বি.) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছে তিলাওয়াত করবে তার মুখে কয়লা পড়ুক। (মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ও আবদুর রায্যাক)

(১০) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদ্বি.) নিজেও ইমামের পিছে তিলাওয়াত করতেন না।এমনকি কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। বলতেন যে, ইমামের ক্বিরাআতই যথেষ্ট। (মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ)

এ সকল রিওয়ায়াত তাহাবী শরীফ এবং সহীহ বোখারী শরীফে বিদ্যমান। এখানে তো উদাহরণ স্বরূপ কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। আশি জন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, উনারা ইমামের পিছে পাঠ করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। (দেখুন- শামী, ফাতহুল ক্বাদীর ও অন্যান্য)

যদিও কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, উনাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ সূরা ফাতিহা পড়তেন। তা উনাদের পূর্বের আমল ছিলো, যা পরবর্তীতে রহিত হয়েছে। অথবা ঐ সব রিওয়ায়াত পরিত্যাজ্য। কেননা এ সব রিওয়ায়াত

কুরআনের পরিপন্থী।

আপত্তি নং-৯ : এ সমস্ত রিওয়ায়াত দুর্বল। (সেই পুরোনো প্রলাপ)

জবাব : জি হ্যাঁ! এ জন্যই 'যঈফ' তথা দুর্বল যে তা আপনাদের বিরোধী। এ সবের দুর্বলতার ব্যাপারে আপনাদের কাছে ইলহাম হয়েছে কি? আমরা 'যঈফ' তথা দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ইতিপূর্বে অনেক কিছুই আলোচনা করেছি। অস্পষ্ট অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের ইমাম আযম যখন এ হাদীসটি গ্রহণ করেন তখন তাতে কোন দুর্বলতা ছিলনা। পরেই দূর্বলতা এসে যায়। পরে আসা দুর্বলতা ইমাম সাহেবের জন্য কোন ক্ষতিকর নয়। অধিকন্তু কিছু দুর্বল সনদ মিলিয়ে হাদীসকে 'হাসান' বানিয়ে দেয় ।

আপত্তি নং- ১০ : যদি ইমাম নীচু স্বরে তিলাওয়াত করতে থাকে যেমনি যোহর ও আসর নামাযে অথবা মুকতাদী বেশ দূরে থাকে যেখানে ইমামের তিলাওয়াতের আওয়াজ পৌঁছে না তখন মুকতাদী সূরা ফাতিহা পড়ে নেবে। কেননা তখনতো সূরা ফাতিহা কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের অন্তরায় না।

জবাব : এ আপত্তি করা তখনই বৈধ হতো যখন চুপ থাকাটা শুধুমাত্র কুরআন তিলাওয়াতের জন্যই হতো। যাই হোক চুপ থাকার জন্য পৃথক নির্দেশ রয়েছে আর শোনার ব্যাপারে ও আলাদা হুকুম। রব তায়ালা বলেন- فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا এটা এমন (হুকুম) যেমন আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ أَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ যেমনিভাবে যাকাতের ফরজ হওয়া নামাযের কারণে নয় বরং তা নামায থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি স্বতন্ত্র ফরজ। ঠিক তেমনিই চুপ থাকাটাও স্বতন্ত্র আবশ্যক বিষয়। গোপন নামাযে (যোহর ও আসর) উচিত যে চুপ থাকা আর প্রকাশ্য নামাযে (ফজর, মাগরিব, এশা) উচিত যে চুপ থাকা ও শোনা উভয়টাই।

আপত্তি নং- ১১ : মুকতাদী যখন নামাযের সমস্ত রুকন আদায় করবে যেমনিভাবে তাকবীরে তাহরীমা, ক্বিয়াম, রুকূ ইত্যাদি তাহলে তিলাওয়াতও নামাযের একটি রুকন ওটাও আদায় করতে হবে। এটা কেমন যে সমস্ত রুকন আদায় করবে আর একটা ছেড়ে দিবে।

জবাব : এটার জবাব আমরা আগেই দিয়েছি। জামাআতের নামাযে

পঞ্চম অধ্যায়

'আমীন' আস্তে বলা উচিত

হানাফীদের মতে প্রত্যেক নামাযী চাই ইমাম হোক বা মুকতাদী হোক, অথবা একাকী হোক; আর প্রকাশ্য নামায হোক কিংবা গোপন হোক, 'আমীন' আস্তে বলবে। কিন্তু মাযহাব অস্বীকারকারী ওয়াহাবীদের মতে প্রকাশ্য নামাযে (ফজর, মাগরীব, এশা, জুমা ইত্যাদি) ইমাম ও মুকতাদী উচ্চস্বরে চিৎকার করে আমীন বলবে। এ জন্য এ অধ্যায়কেও দু'পরিচ্ছেদে ভাগ করা হচ্ছে। প্রথম পরিচ্ছেদে আমাদের দলীল সমূহ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ওয়াহাবীদের আপত্তি সমূহের জবাব দেয়া হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আস্তে আমীন বলা আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুম সম্মত। চিৎকার করে আমীন বলা কুরআনে করীমেরও পরিপন্থী। আর হাদীস ও সুন্নাতেরও বিরোধী। দলীলগুলো নিম্নরূপ ঃ

রব তাআলা বলেন- اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً অর্থাৎ, 'স্বীয় প্রভুর কাছে প্রার্থনা করো বিনয়ের সাথে এবং নীচুস্বরে।'

'আমীন' ও দোআ। তাই এটাও নীচু স্বরে বলা উচিত। রব তায়ালা বলেন-

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ

অর্থাৎ, 'হে মাহবুব! যখন আপনার কাছে আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে জানতে চায়, তখন আমি অত্যন্ত কাছেই। আমি আহবানকারীর আহবানে সাড়া দেই, যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে।'

বুঝা গেল, চিৎকার করে তাঁর কাছেই প্রার্থনা করতে হয়, যিনি আমাদের কাছ থেকে দূরে। রব তায়ালা তো আমাদের শাহরগের চেয়েও অতি নিকটে। তাই আমীন চিৎকার দিয়ে বলা নিরর্থক। বরং কুরআনী শিক্ষার পরিপন্থী। এ জন্য যে 'আমীন' হলো দোয়া বিশেষ।'

হাদীস নং- ১-৮ ঃ ইমাম বোখারী, মুসলিম, আহমদ, মালিক, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, প্রমুখ হযরত আবূ হোরায়রা (রাদ্বি.) হতে বর্ণনা করেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهٗ مَنْ وَافَقَ تَاْمِيْنُهٗ تَاْمِيْنَ الْمَلٰۤئِكَةِ غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ،

অর্থাৎ, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যখন ইমাম 'আমীন' বলবে,তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। কেননা যার 'আমীন' বলা ফিরিশতাদের 'আমীন' এর সাথে মিলে যাবে তার, অতীতের পাপ ক্ষমা করা হবে।'

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, পাপ মার্জনা ঐ নামাযীর জন্যে, যার আমীন ফিরিশতাদের আমীনের মত হয়। আর স্পষ্ট ব্যাপার হলো যে, ফিরিশতারা নীচু স্বরে আমীন বলে। আমরা তাদের 'আমীন' আজ পর্যন্ত শুনিনি। তাহলে উচিত হলো যে, আমাদের 'আমীন'ও আস্তে হওয়া, যাতে ফিরিশতাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং গুনাহগুলো মাফ হয়। যে লা-মাযহাবীরা চিৎকার দিয়ে আমীন বলে, তারা যে ভাবে মসজিদে আসে তেমনিভাবেই মসজিদ থেকে চলে যায়। তাদের গুনাহগুলো মাফ হয় না। কেননা তারা ফিরিশতাদের 'আমীন' এর বিরোধীতা করেছে।

হাদীস নং- ৯-১৩ : ইমাম বোখারী, শাফেয়ী, মালিক, আবূ দাউদ, নাসায়ী প্রমুখ হযরত আবূ হোরায়রা (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন :

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَاِنَّهٗ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهٗ قَوْلَ الْمَلٰۤئِكَةِ غُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ-

অর্থাৎ, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করছেন, যখন ইমাম বলবে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ তখন তোমরা বলো 'আমীন। কেননা যার 'আমীন' বলা ফিরিশতাদের 'আমীন' বলার মত হবে তার আগেকার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে।'

এ হাদীস দ্বারা দুটো মাসআলা জানা গেলো। এক, মুকতাদী ইমামের পিছে কখনো সূরা ফাতিহা পড়বেনা। আর যদি মুকআদী পড়তো, তাহলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, 'যখন তোমরা وَلَا الضَّالِّيْنَ বলবে তখন 'আমীন' বলবে।' বুঝা গেলো মুক্তাদি শুধুমাত্র আমীন বলবে। وَلَا الضَّالِّيْنَ বলা ইমামের কাজ। রব তাআলা বলেন।

إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ

অর্থাৎ, 'যখন তোমাদের কাছে মু'মিনা নারী দেশত্যাগ করে আসবে, তখন তোমরা তাদের পরীক্ষা নাও।'

দেখো! পরীক্ষা নেয়া শুধুমাত্র মু'মিনদের কাজ; মু'মিনা নারীদের কাজ নয়। কোন হাদীসের মধ্যে আসে নি যে, إِذَا قُلْتُمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا آمِيْنَ অর্থাৎ, 'যখন তোমরা وَلَا الضَّالِّيْنَ বলবে, তখন آمِيْنَ বলো।' বুঝা গেল মুকতাদী وَلَا الضَّالِّيْنَ বলবেই না।

দ্বিতীয়ত : এই যে, 'আমীন' আস্তে হওয়া উচিত। কেননা ফিরিশতাদের 'আমীন' নীচুস্বরেই হয়। যা আজ পর্যন্ত আমরা শুনতে পাইনি। স্মর্তব্য যে, এখানে ফিরিশতাদের 'আমীন' এর সামঞ্জস্যতা বলতে সময়ের সাথে সামঞ্জস্যতা' নয়; বরং আদায় করার পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যতা বুঝানো হয়েছে। ফিরিশতাদের 'আমীন' এর সময়ওতো ওটাই যে যখন ইমাম সূরা ফাতিহার তিলাওয়াত শেষ করে। কেননা আমাদের পাহারাদার ফিরিশতারা আমাদের সাথেই নামাযে অংশগ্রহণ করে, এবং ঐ সময় 'আমীন' বলে।

হাদীস নং- ১৪-১৮ : ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ ত্বায়ালুসী, আবুইয়া'লা, মুছিলী, তাবরানী, দারু কুত্বনী এবং হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকে হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর থেকে বর্ণনা করেন. হাকিম বলেন যে, এ হাদীস এর ইসনাদ পুরোটাই সহীহ:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ آمِيْنَ وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ

"হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর থেকে বর্ণিত- তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম এর সাথে নামায পড়েছেন। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ পর্যন্ত পৌছলেন, তখন তিনি বললেন, 'আমীন' আর 'আমীন' এ আওয়াজ ছোট রাখলেন।"

বুঝা গেল যে, আমীন নীচু স্বরে বলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত। উঁচু আওয়াজে বলা সুন্নাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

হাদীস নং- ১৯-২১ : আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু আবি শায়বা প্রমুখ হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর থেকে বর্ণনা করেছেন:

قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ آمِيْنَ وَخَفَضَ بِهِ صَوْتَهُ

"তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়েছেন- غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ এরপর বললেন, آمِيْنَ এবং তাতে আওয়াজ ছোট রাখলেন।"

হাদীস নং ২২-২৩ : তাবরানী 'তাহযীবুল আছার' এ এবং তাহাবী হযরত ওয়াইল বিন হাজর থেকে বর্ণনা করেন:

قَالَ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَا بِآمِيْنَ

"তিনি বলেন, হযরত ওমর ও আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) না বিসমিল্লাহ উচ্চ স্বরে পড়তেন, না আমীন।"

বুঝা গেল, নীচুস্বরে বিসমিল্লাহ পড়া সাহাবায়ে কেরামেরও সুন্নাত।

হাদীস নং- ২৪ : হেদায়ার ব্যাখ্যাকার আইনী হযরত আবূ মা'মার (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেছেন :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ يُخْفِي الْإِمَامُ أَرْبَعًا التَّعَوُّذَ وَبِسْمِ اللّٰهِ وَآمِيْنَ وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

"হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইমাম চারটি বিষয় নীচু স্বরে বলবে : 'আউযুবিল্লাহ' 'বিসমিল্লাহ' আমীন' এবং 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ'।"

হাদীস নং- ২৫ : বায়হাক্বী হযরত আবূ ওয়াইল থেকে বর্ণনা করেন :

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) বলেন :

عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ يُخْفِى الْاِمَامُ اَرْبَعًا بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَالتَّعُوْذُ وَالتَّشَهُّدُ

"ইমাম চারটি বিষয় নীচু স্বরে পড়বে 'বিসমিল্লাহ, 'রাব্বানা লাকাল হামদ' 'আউযু এবং আততাহ্যিায়ত।"

হাদীস নং- ২৬ : হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাদ্বি.) হযরত হাম্মাদ থেকে উনারা হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন :

قَالَ اَرْبَعٌ يُخْفِيْهِنَّ الْاِمَامُ اَلتَّعُوْذُ وَبِسْمِ اللّٰهِ وَسُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَاٰمِيْنَ رَوَاهُ مُحَمَّدٌ فِى الْاٰثَارِ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِى مُصَنِّفِه

অর্থাৎ, 'তিনি বলেন- ইমাম চারটি বিষয় নীচু স্বরে পড়বে - 'আউযুবিল্লাহ' 'বিসমিল্লাহ' 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা' এবং 'আমীন'। এ হাদীস ইমাম মুহাম্মদ 'আছার' এ এবং আবদুর রায্যাক তার 'মুসান্নাফ' এ বর্ণনা করেন।

বিবেকও চায় যে, 'আমীন' আস্তে বলা হোক। কেননা আমীন কুরআনে করীমের আয়াত কিংবা কুরআনের শব্দ নয়। এ জন্যই তা না জিবরীল আমীন নিয়ে এসেছেন না কুরআনে করীমে লেখা হয়েছে। বরং তা দুআ' এবং আল্লাহ্র যিক্র।

সুতরাং যেমনিভাবে 'ছানা' 'আত্তাহিয়্যাত' দরূদে ইবরাহীমি' দোআ'য়ে মা'ছুরাহ ইত্যাদি নীচু স্বরে পড়া হয়, ঠিক তেমনিই আমীনও নীচু স্বরে হওয়া উচিত।

এটা কেমন যে, সমস্ত যিক্র নীচু স্বরে হয় আর আমীন এর ক্ষেত্রে সবাই চিৎকার দেয়। এ চিৎকার করাটা কোরআনেরও পরিপন্থী। সহীহ হাদীসসমূহ, সাহাবায়ে কেরাম এবং সুস্থ জ্ঞানেরও বিরোধী। আল্লাহ্ তাআলা আমল করার তাওফীক দান করুন। দ্বিতীয়ত এ জন্য যে, যদি মুকতাদীর উপর সূরা ফাতিহাও পড়া ফরয হয় এবং আমীন বলারও হুকুম হয়, তাহলে যদি মুকতাদী সূরা ফাতিহার মাঝখানে হয় আর ইমাম وَلَا الضَّالِّيْنَ পড়ে ফেলে, তখন মুক-তাদী যদি আমীন না বলে, তাহলে সুন্নাতের পরিপন্থী হবে। আর যদি আমীন বলে এবং চিৎকার দিয়ে বলে, তাহলে আমীন মাঝখানে হয়ে যাবে। কুরআনের মাঝ খানে গায়রে কুরআন এসে যাবে এবং সূরা ফাতিহার মাঝখানে শোরগোল হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলা সম্পর্কে আপত্তি ও জবাব

এ পর্যন্ত আমরা মাযহাব অস্বীকার কারীদের জওয়াবসহ যে সব আপত্তি শুনেছি তা বিস্তারিত ভাবে আলোকপাত করছি :

আপত্তি নং- ১ : আমীন দোআ নয়। এ জন্য তা উঁচু আওয়াজে বললে অসুবিধা কি? রব তাআলা দোআ নীচু স্বরে করার নির্দেশ দিয়েছেন; অন্যান্য যিকর সমূহ নয়।

জবাব : আমীন হলো দুআ'। এর দুআ হওয়াটা কোরআন শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। দেখো! মুসা (আ:) আল্লাহ তাআলার দরবারে দোআ করেছেন :

رَبَّنَا اَطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمِ

"ওহে আমাদের রব! তাদের ধনসম্পদ ধ্বংস করে দাও। আর তাদের অন্তরগুলো কঠিন করে দাও। যাতে তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান না আনে।" রব তাআলা তাঁর দোআ কবুল করতে গিয়ে ইরশাদ করেন :

قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা দু'জনের দোআ' কবুল করা হলো। সুতরাং তোমরা দৃঢ়পদ থাকো।'

এখন বলুন, দোআ তো শুধুমাত্র হযরত মূসা (আ:) করেছেন। অথচ আল্লাহ তায়ালা বললেন- 'তোমাদের দু'জনের দোআ কবুল করা হলো।' অর্থাৎ তোমার ও হযরত হারুন (আ:) এর দোআ। হযরত হারুন (আ:) কখন দোআ' করলেন? কারণ এটাই ছিল যে, তিনি মূসা (আ:) এর দোআ'য় আমীন বলেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা আমীনকে দোআ বলেছেন।

বুঝা গেল যে, আমীন হলো দোআ। আর দোআ নীচু স্বরে হওয়া উচিত। এটা কোরআনী মাসআলাগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

আপত্তি নং- ২ : তিরমিযী শরীফে হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর থেকে বর্ণিত:

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ وَقَالَ اٰمِيْنَ وَمَدَّبِهَا صَوْتَهُ

"আমি শুনেছি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ পড়েছেন এবং বললেন-আমীন। আর তিনি তাতে আওয়াজকে উচুঁ করেছেন।"

বুঝা গেল যে উচ্চস্বরে আমীন বলা সুন্নাত।

জবাব ঃ আপনারা হাদীসের ভুল অনুবাদ করেছেন। এতে مَدَّ বলা হয়েছে। আর مَدَّ শব্দটি مد তথা দীর্ঘ করা থেকে চয়িত। এর অর্থ উচ্চ করা তথা বড় করা নয়। বরং টানা তথা দীর্ঘ করা। উদ্দেশ্য হলো যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমীন শব্দটি كَرِيْمِ এর ছন্দে হ্রস্বভাবে পড়েন নি বরং قَالِيْن এর ছন্দে আলিফ ও মীম উভয়টি দীর্ঘ করে পড়েছেন। সুতরাং এতে আপনাদের পক্ষে কোন দলীল নেই, অনুবাদের ভুল মাত্র। স্মতর্ব্য যে, 'মাদ্দ' (দীর্ঘ করা) এর বিপরীত হলো 'ক্বসর' (হ্রস্ব করা) আর 'খফা' (গোপন করা) এর বিপরীতে হলো 'জাহ্‌র' (প্রকাশ করা)। এবং 'রফা' (উচ্চ করা) এর বিপরীত শব্দ হলো 'খাফদ্ব' (নীচু করা)। যদি এখানে 'জাহ্‌র' শব্দ হতো তাহলে দলীল বিশুদ্ধ হতো। 'জাহ্‌র' তথা 'প্রকাশ্যে পড়া' কোন রেওয়ায়াতে নেই। রব তাআলা এরশাদ করেন- إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى অর্থাৎ, 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা জানেন উচুঁ আর নীচু আওয়াজকে।"।

দেখো! রব তায়ালা এখানে خفا (গোপন করা) এর বিপরীত جَهْرَ (প্রকাশ করা) বলেছেন। مد তথা দীর্ঘ করা বলেননি।

আপত্তি নং- ৩ : আবূ দাউদ শরীফে হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর থেকে বর্ণিত-

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ

"তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পড়তেন -

www.AmarIslam.com

وَلَا الضَّالِّيْنَ তখন তিনি বলতেন 'আমীন' এবং তাতে স্বীয় আওয়াজ শরীফ উচুঁ করতেন।"

এখানে رَفَعَ বলেছেন যার অর্থ হলো উচুঁ করলেন, বড় করলেন। বুঝা গেল যে 'আমীন' উচুঁ স্বরে পড়া সুন্নাত।

জবাব : এটার কয়েকটি জবাব রয়েছে। এক, হযরত ওয়াইল বিন হাজর (রাদ্বি.) এর মূল বর্ণনায় 'মাদ্দা' রয়েছে। যেমনিভাবে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যার অর্থ টানা তথা দীর্ঘ করা; উচুঁ করা নয়। এখানে সনদের কোন কোন রাবী (বর্ণনাকারী) অর্থগত বর্ণনা করতে গিয়ে مَدَّ (মাদ্দা) কে رَفَعَ (রফা) দ্বারা বিশ্লেষণ করেছেন। আর উদ্দেশ্য ঐ টানা তথা লম্বা করাই, উচুঁ করা নয়। এ ধরণের বর্ণনার ব্যাপক প্রচলন ছিলো। দুই, তিরমিযী ও আবূ দাউদ এর বর্ণনা সমূহে নামাযের উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কিরাআতের উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবতঃ নামায ছাড়া বাইরের ক্বিরাআতের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যে সব রেওয়ায়াত আমরা উদ্ধৃত করেছি তাতে নামাযের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং হাদীসগুলোর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। আর এ সব হাদীস আমাদের বিরোধী নয়। তিন, উচুঁ আওয়াজে 'আমীন' বলা ও নীচু স্বরে 'আমীন' বলা সম্পর্কিত হাদীসগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। কিন্তু উচ্চস্বরে পড়া সম্পর্কিত হাদীসগুলো কুরআনে করীমের বিপরীত। এ জন্য পরিত্যাজ্য। আর আস্তে পড়া সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো কুরআনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এ জন্য আমলযোগ্য। চার, নীচুস্বরে 'আমীন' বলা সম্পর্কিত হাদীসগুলো শরয়ী ক্বিয়াস সম্মত। আর উচ্চস্বরে 'আমীন' বলার হাদীসগুলো এর পরিপন্থী। এ জন্য নীচু স্বরে 'আমীন' বলার হাদীসগুলো আমলযোগ্য। তার বিপরীতটি পরিত্যাজ্য। কুরআনী আয়াত গুলো এবং শরীয়তের ক্বিয়াস প্রথম পরিচ্ছেদেই উল্লেখ করেছি। পাঁচ, 'আমীন' উচ্চস্বরে পড়া সম্পর্কিত হাদীসগুলো আমাদের উল্লেখিত কুরআন শরীফ ও হাদীসগুলো দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে। তাই সাহাবায়ে কেরাম সর্বদা নীচু স্বরে 'আমীন' বলতেন। এবং এর হুকুম দিতেন আর 'আমীন' জোরে পড়তে নিষেধ করতেন। যেমনিভাবে প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি 'জাহ্‌র' এর হাদীসগুলো 'মানসূখ' তথা রহিত না হতো তাহলে সাহাবায়ে কেরাম এ আমল ছেড়ে দিলেন কেন?

www.AmarIslam.com

আপত্তি নং- ৪ : ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আবূ হোরায়রা (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত-

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ حَتّٰى يَسْمَعُهَا اَهْلُ الصَّفِّ الْاَوَّلِ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ-

"হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ পড়তেন তখন বলতেন আমীন। এমনকি তা প্রথম কাতারের মুসল্লীরা শুনতে পেতো। এতে মসজিদ কেঁপে উঠতো।" এ হাদীসের মধ্যে কোন ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। এখানে তো মসজিদ কেঁপে উঠার উল্লেখ রয়েছে। আর চিৎকার দেয়া ছাড়া কম্পন সৃষ্টি হয় না।

জবাব : এ আপত্তির কয়েকটি জবাব রয়েছে। এক, আপনারা হাদীস পুরোটা উল্লেখ করেননি। প্রথম ইবারাতটি ছেড়ে দিয়েছেন। আর তা এ রকম -

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ تَرَكَ النَّاسُ التَّامِيْنَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ....

অর্থাৎ, 'হযরত আবূ হোরায়রা (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

এ বাক্যের দ্বারা বুঝা গেল, সমস্ত সাহাবীরা উচ্চস্বরে 'আমীন' বলা ছেড়ে দিয়েছিল, যার জন্য হযরত সাইয়িদুনা আবূ হুরায়রা (রাদ্বি.) এ অভিযোগ করেছেন আর সাহাবায়ে কেরাম কোন হাদীসের উপর আমল ছেড়ে দেয়া ঐ হাদীস রহিত হওয়ার দলীল।

এ হাদীসতো আমাদের সমর্থন করছে- তোমাদের নয়।

দুই, যদি এ হাদীসকে সহীহ মেনেও নিই, তবুও বিবেক ও পর্যবেক্ষণের পরিপন্থী। আর যে হাদীস জ্ঞান ও দর্শনের পরিপন্থী হয়, তা আমলযোগ্য নয়। বিশেষতঃ যখন সমস্ত মাশহুর হাদীস গুলো ও কুরআনী আয়াত সমূহেরও বিরোধী হয়।

www.AmarIslam.com

কেননা এ হাদীসে মসজিদ প্রকম্পিত হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। অথচ গম্বুজ বিশিষ্ট সমজিদে কম্পন সৃষ্টি হয়; খড়ের ছাউনির মসজিদে নয়। হুযূর আনওয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মসজিদ শরীফ উনার সময়ে সাধারণ কুঁড়ে ঘরের মতই ছিলো। ওখানে কি ভাবে কম্পন সৃষ্টি হবে?

বর্তমান কোন মাযহাব অমান্যকারী ব্যক্তি কোন কুঁড়ে ঘরে শোরগোল করে কম্পন সৃষ্টি করে দেখাতে পারকি ? ইনশাআল্লাহ চিৎকার করতে করতে মরে যাবে। কিন্তু কম্পন সৃষ্টি করতে পারবে না।

এ আপত্তির বাকী জবাব হলো যা ৩নং আপত্তির ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে।

তিন, এ হাদীসটি কোরআনে করীমেরও বিপরীত। রব তাআলা বলেন- لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ অর্থাৎ, 'তোমাদের আওয়াজকে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আওয়াজ থেকে উঁচু করো না।"

যদি সাহাবায়ে কেরাম এমন উচ্চস্বরে আমীন বলেছিলেন যাতে মসজিদে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল,তাহলে তো তাদের সবার আওয়াজ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আওয়াজের চেয়ে বড় হয়ে গিয়েছিল। কোরআনে করীমের স্পষ্ট বিরোধী হলো, সে হাদীস আমল যোগ্য নয়।

আপত্তি নং-৫ : বোখারী শরীফে আছে:

وَقَالَ عَطَاءٌ اٰمِيْنَ دُعَاءٌ اَمَّنَ اِبْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهٗ حَتّٰى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً

অর্থ: হযরত আত্বা বলেন, 'আমীন' হলো দোআ'। আর হযরত ইবনে যুবাইরও উনার পিছনের লোকগুলো 'আমীন' বলেছেন। এমনকি মসজিদ প্রকম্পিত হয়েছে"।

হাদীসের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, আমীন এমনভাবে চিৎকার দিয়ে বলতে হবে যাতে মসজিদ কেঁপে উঠে।

জবাব : এ আপত্তিরও কয়েকটি জবাব রয়েছে। এক, এর প্রথম বাক্যটি আমাদের মতানুযায়ী যে, আমীন হলো দোআ'। এবং কোরআনে করীম

www.AmarIslam.com

বলছে- 'দোআ' আস্তে করো।' দেখো প্রথম পরিচ্ছেদ। দুই, এ হাদীসে নামাযের উল্লেখ নেই। বুঝা যাচ্ছে না যে, এ তিলাওয়াত কি নামাযের বাইরে হয়েছে, না কি নামাযের ভিতরে। সম্ভবত নামাযের বাইরেই হয়েছে। যাতে ঐ সব হাদীসের বিরোধী না হয়, যা আমরা উপস্থাপন করেছি। তিন, এ হাদীস জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণেরও পরিপন্থী। কেননা কাঁচা ও খড় পাতা দিয়ে তৈরী মসজিদে কম্পন সৃষ্টি হয় না। তাই এ হাদীস ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

জনাব! যদি কোরআনের আয়াতও শরয়ী জ্ঞানও পর্যবেক্ষণের পরিপন্থী হয় তখন ওখানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আবশ্যক হয়। নাহলে কুফর বাধ্যতামূলক এসে যায়। (কোরআনুল করীমের) সিফাত তথা গুণাবলী সংক্রান্ত আয়াতগুলোকে মুতাশাবিহ হিসেবে মেনে নিয়ে শুধুমাত্র তৎপ্রতি ঈমান আনতে হয়। এর প্রকাশ্য অর্থ করা যায় না। কেননা জাহেরী যথা প্রকাশ্য অর্থ শরয়ী জ্ঞানের পরিপন্থী। যেমন-

يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

অর্থাৎ, 'তাদের হাতের উপর আল্লাহর হাত। তোমরা যে দিকেই ফিরবে সেদিকে আল্লাহর চেহারা রয়েছে। খোদার হাত মুখ হওয়া বিবেকের পরিপন্থী। তাই এ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা আবশ্যক। রব তাআলা বলেন- فَوَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ

অর্থাৎ, 'যুলক্বারনাইন সূর্যকে কর্দমক্ত ঝরণায় ডুবতে দেখলেন।'

সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আসমান থেকে নেমে যাওয়া ও কাদার মধ্যে ডুবে যাওয়া বিবেক বিরুদ্ধ ছিলো। এ জন্য এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যাটি আমার প্রণীত 'হাশিয়াতুল কোরআন' এ দেখ। জনাব! হাদীস পড়া এক জিনিস আর বুঝা অন্য জিনিস।

সারকথা হলো, এমন কোন সহীহ মারফু হাদীস নেই, যেটাতে নামাযে উচ্চস্বরে আমীন বলার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। এমন হাদীস পাওয়া যায়নি, যাবেও না। লা-মাযহাবীদের উচিত, তারা যেন জেদ ত্যাগ করে এবং খাঁটি মনে ইমামে আযম আবূ হানীফা (রাদ্বি.) এর রজ্জু আঁকড়ে ধরে। এটাই হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পথ। এ মাসআলাটির বিস্তারিত আলোচনা আমার

প্রণীত আরবী 'হাশিয়ায়ে বুখারী' পর্যবেক্ষণ করুন।

আপত্তি নং-৬ : নীচু স্বরে 'আমীন' বলা সংক্রান্ত যে সব হাদীস আপনারা উপস্থাপন করেছেন, সব গুলোই 'যঈফ' তথা দুর্বল। আর যঈফ হাদীস দ্বারা দলীল দেওয়া যায় না। (সেই পুরোনো বাসী প্রলাপ)

দেখো তিরমিযী শরীফে হযরত ওয়াইল বিন হাজর এর যে সব রেওয়ায়াত তোমরা পেশ করেছো, সে প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী বলেন:

حَدِيْثُ سُفْيَانَ اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ من هٰذَا إِلٰى أَنْ قَالَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ وَاِنَّمَا هُوَ مَدَّبِهَا صَوْتَهُ

অর্থাৎ, 'আমীন' বলা প্রসঙ্গে সুফ্য়ান এর হাদীস শু'বার হাদীসের চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ। শু'বা এখানে বলছেন যে, خفض অর্থাৎ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নীচু আওয়াজে বলেছেন। অথচ এখানে مد শব্দ রয়েছে। এর অর্থ টেনে বা দীর্ঘ করে আমীন বলা।"

জবাব : খোদার শোকর যে, আপনারা মুক্বাল্লিদ (মাযহাব অনুসরণকারী) তো হলেনই। তবে ইমাম আবূ হানীফার নয়, ইমাম তিরমিযীর। কারণ তাঁর সমস্ত 'জরহ' তথা খন্ডনকে চোখ বন্ধ করে মেনে নিচ্ছেন। জনাব! এ হাদীসের দুর্বলতার মূল কারণ এই যে, এটা আপনাদের বিরোধী। যদি আপনাদের পক্ষে হতো, তখন চোখ বন্ধ করেই মেনে নিতেন। আপনাদের এ প্রশ্নের কয়েকটি জবাব রয়েছে।

এক, আমরা নীচুস্বরে 'আমীন' বলার ক্ষেত্রে ছাব্বিশটি সনদ উপস্থাপন করেছি। সব সনদই কি দুর্বল? এবং সব গুলোতে রাবী শু'বা এসেছেন? আর শু'বা প্রত্যেক জায়গায় ভুল করেছেন? তা অসম্ভব।

দুই, যদি এ ছাব্বিশটি সনদের (বর্ণনাসূত্র) সবকটিই দুর্বল হয়, তবুও সব মিলে শক্তিশালী হয়ে গেলো। যেমনটি আমরা ভূমিকায় আলোচনা করেছি।

তিন, শু'বা ইমাম আবূ হানীফার (রাদ্বি.) পরে সনদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, যার কারণে এ সনদ দুর্বল হয়েছে। ইমামে আযম এ হাদীস সম্পূর্ণ সহীহ পেয়েছেন। পরে আসা দুবর্লতা পূর্ববর্তীদের জন্য ক্ষতিকারক নয়।

চার, যদি প্রথম থেকেই এ হাদীস 'যঈফ' তথা দুর্বল থাকে, তবুও ইমামে

আযম সিরাজে উম্মত (উম্মতের প্রদীপ) ইমাম আবূ হানীফার (রাদ্বি.) গ্রহণ করার দ্বারা শক্তিশালী হয়ে গেলো। যা আমরা মুকাদ্দিমায় (ভূমিকায়) আলোচনা করেছি।

পাঁচ, যেহেতু এ হাদীসের উপর সমস্ত মুসলিম উম্মাহ আমল করেছে। এ জন্য হাদীসের দুর্বলতা দূর হয়ে হাদীসটি শক্তিশালী হয়ে গেছে, যেমনটি আমরা 'মুকাদ্দিমা'য় আলোচনা করেছি,

ছয়, এ হাদীসটিকে কোরআনে করীম সমর্থন করেছে আর উচ্চস্বরে পড়া সম্পর্কিত হাদীস কোরআনের বিপরীত। এ জন্য নীচু স্বরে 'আমীন' এর হাদীস কোরআনের সমর্থনের দ্বারা শক্তিশালী হয়ে গেলো, যা আমরা মুকাদ্দিমা'য় আলোচনা করেছি।

সাত, এ হাদীসকে শরীয়তের 'ক্বিয়াস' সমর্থন করেছে এবং উচু স্বরে পড়ার হাদীস শরয়ী কিয়াস ও শরীয়তের জ্ঞান বহির্ভূত। এ জন্য নীচু স্বরে 'আমীন' এর হাদীস শক্তিশালী আর উচ্চ স্বরের হাদীস আমলযোগ্য নয়। সংক্ষেপতঃ এই নীচু স্বরে 'আমীন' এর হাদীস অনেক শক্তিশালী। এর উপরই আমল করা উচিত।

আপত্তি নং- ৭ : আবূ দাউদ শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যখন সূরা ফাতিহা হতে অবসর হতেন তখন قَالَ اٰمِيْنَ حَتّٰى يَسْمَعُ مَنْ يَلِيْهِ مِنَ الصَّفِّ الْاَوَّلِ অর্থাৎ, 'এমনভাবে 'আমীন' বলতেন যাতে প্রথম কাতারে যারা তাঁর কাছে থাকতেন, তারা শুনতে পেতেন।'

জবাব : এর দুটো জবাব রয়েছে। এক, হাদীসটি আপনাদেরও বিরোধী। কেননা, প্রথমে আপনাদের বর্ণনাগুলোতে ছিলো যে, মসজিদ কম্পিত হয়ে যেতো। এবং এরপর এটা আসলো যে শুধুমাত্র পিছনের দুয়েক ব্যক্তি শুনতো। দুই, এ হাদীসের সনদে (বর্ণনাসূত্র) বিশ্‌র বিন রাফি' এসেছে। তাকে ইমাম তিরমিযী 'কিতাবুল জানাইযে' এবং হাফিয যাহাবী 'মীযানে' একেবারেই দুর্বল বলেছেন। আহমদ তাকে হাদীস বর্ণনা বিষয়ে অবাঞ্চিত ব্যক্তি বলেছেন। ইবনে মুঈন তার বর্ণনাকে 'বানোয়াট' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম নাসায়ী তাকে শক্তিশালী মানেননি। (দেখুন- 'আফতাবে মুহাম্মদী') এ জন্য এ হাদীসটি একেবারেই দুর্বল; আমলযোগ্য নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়
হাত উঠানো নিষেধ

হানাফীদের মতে রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ হতে উঠার সময় উভয় হাত তোলা সুন্নাতের পরিপন্থী ও নিষেধ। কিন্তু মাযহাব অমান্যকারী ওয়াহাবীরা এ দু'সময়ে উভয় হাত তোলে এবং এর উপর খুবই জোর দেয়।

এ জন্য আমরা এ মাসআলাও দুটো পরিচ্ছেদে আলোচনা করছি। প্রথম পরিচ্ছেদে নিজ মাসআলার প্রমাণ ত্রবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ মাসআলার উপর আপত্তি সমূহ জবাব দেয়া হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাযে রুকূতে যেতে এবং রুকূ হতে উঠতে উভয় হাত তোলা মাকরূহ এবং সুন্নাতের পরিপন্থী। এ প্রসঙ্গে অসংখ্য হাদীস এবং মুজতাহিদগণের ক্বিয়াস বর্ণিত আছে। আমরা ঐ সব বর্ণনা থেকে কিছু উপস্থাপন করছি।

হাদীস নং- ১-৪ : ইমাম তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনে আবি শায়বাহ হযরত আলক্বামা (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন:

قَالَ قَالَ لَنَا اِبْنُ مَسْعُوْدٍ اَلاَ اُصَلِّىْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلاَّمَرَّةً وَّاحِدَةً مَعَ تَكْبِيْرِ الْاِفْتِتَاحِ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ حَدِيْثُ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَبِهٖ يَقُوْلُ غَيْرُ وَّاحِدٍ مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِيْنَ-

অর্থাৎ, 'তিনি বলেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাদ্বি.) আমাদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আল-াইহি ওয়া সাল্লাম) এর (পদ্ধতিতে) নামায আদায় করবো না? অতঃপর তিনি (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাদ্বি.) নামায পড়লেন এবং তিনি তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া আর কখনো উভয় হাত তোলেননি। ইমাম তিরমিযী বলেন,

ইবনে মাসঊদ (রাদ্বি.) এর হাদীসটি হাসান। এবং হাত না তোলার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের ওলামায়ে কেরামের আমল রয়েছে।'

স্মর্তব্য যে, এ হাদীসটি কয়েকটি কারণে খুবই শক্তিশালী।

প্রথমতঃ এর রাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাদ্বি.), যিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বড় ফক্বীহ আলিম।

দ্বিতীয়তঃ তিনি একদল সাহাবীর সামনে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামায পেশ করেছেন, আর কোন সাহাবী তা অস্বীকার করেননি। বুঝা গেলো, সকলেই তাঁকে সমর্থন করেছেন। যদি হাত উত্তোলন সুন্নাত হতো, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম এর উপর অবশ্যই আপত্তি করতেন। কেননা তাঁরা সকলেই হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামায দেখেছিলেন।

তৃতীয়তঃ ইমাম তিরমীযি এ হাদীসকে 'যঈফ' তথা দুর্বল বলেননি। বরং হাসান বলেছেন।

চতুর্থতঃ ইমাম তিরমিযী বলেন, অনেক ওলামায়ে সাহাবা ও তাবেয়ীন উভয় হাত তুলতেন না। তাঁদের আমলের দ্বারা এ হাদীসের সমর্থন হলো।

পঞ্চমতঃ ইমাম আবূ হানীফা (রদ্বি.) যিনি যুগের জলীলুল কদর এবং আযীমুশ্‌শান মুজতাহিদ ছিলেন- তিনি এ হাদীসকে কবূল করেছেন এবং এর উপর আমল করেছেন।

ষষ্ঠতঃ সমস্ত উম্মতে রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ হাদীসের উপর আমল রয়েছে।

সপ্তমতঃ এ হাদীসটি ক্বিয়াস ও বিবেকের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ, যা আমরা সামনে আরজ করবো ইনশাআল্লাহ। এ সব কারণে যঈফ তথা দুর্বল হাদীসও শক্তিশালী হয়ে যায়। এ হাদীসতো নিজেই 'হাসান'।

হাদীস নং- ৫ : হযরত ইবনে আবী শায়বাহ হযরত বারা বিন আযিব (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন:

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ لَايَرْفَعُهَا حَتّٰى يَفْرُغَ-

অর্থাৎ, 'হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন নামায আরম্ভ করতেন, তখন স্বীয় উভয় হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর নামায থেকে অবসর হওয়ার পূর্বে হাত তুলতেন না।'

স্মর্তব্য যে, বারা ইবনে আযিব (রাদ্বি.) এর হাদীসটি ইমাম তিরমিযী এভাবে বর্ণনা করেছেন- فِى الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ

হাদীস নং- ৬ : ইমাম আবূ দাউদ হযরত বারা ইবনে আযিব (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتّٰى اِنْصَرَفَ

অর্থাৎ, 'তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখেছি যখন তিনি নামায আরম্ভ করেছেন তখন উভয় হাত উত্তোলন করেছেন। পুনরায় নামায থেকে অবসর হওয়ার পূর্বে হাত তোলেননি।

হাদীস নং- ৭ : তাহাবী সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেছেন:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لَايَعُوْدُ

অর্থাৎ, 'হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে রেওয়ায়াত করেন যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রথম তাকবীরে উভয় হাত তুলতেন অতঃপর তা আর কখনো করতেন না।'

হাদীস নং- ৮-১৪ ঃ হাকিম ও বায়হাক্বী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرْفَعُ الْاَيْدِىْ فِىْ سَبْعِ مَوَاطِنَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ وَاسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْمَوْقِفَيْنِ وَالْجَمْرَتَيْنِ-

অর্থাৎ, 'হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, সাত জ

য়গায় হাত উঠাতে হবে- নামায শুরু করার সময়, কা'বার দিকে মুখ করার সময়, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে, দুইমাওকিফ তথা মিনা ও মুযদালিফায় এবং দু'জুমরা'র সামনে।

এ হাদীসটি বাযার হযরত ইবনে ওমর (রাদ্বি.)থেকে, ইবনে আবি শায়বাহ হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকে, বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকে, তাবরানী এবং বুখারী কিতাবুল মুফরাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকে কিছুটা পার্থক্যের সাথে উল্লেখ করেছেন।

কোন কোন রেওয়ায়াতে দু'ঈদের নামাযেরও উল্লেখ রয়েছে।

হাদীস নং- ১৫: ইমাম তাহাবী হযরত মুগীরাহ (রাহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি ইবরাহীম নাখঈ (রাদ্বি.) এর কাছে আরজ করলাম যে, হযরত ওয়াইল (রাদ্বি.) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখেছেন যে, তিনি নামাযের প্রারম্ভে, রুকূর সময় এবং রুকূ থেকে উঠার সময় হাত উত্তোলন করতেন। তখন তিনি (ইবরাহীম নাখঈ) উত্তর দিলেন:

إِنْ كَانَ وَائِلٌ رَاٰهُ مَرَّةً يَفْعَلُ ذٰلِكَ فَقَدْ رَاٰهُ عَبْدُ اللّٰهِ خَمْسِيْنَ مَرَّةً لَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ

অর্থাৎ, 'যদি হযরত ওয়াইল (রাঃ) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে একবার হাত উত্তোলন করতে দেখেন, তো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পঞ্চাশ বার হাত উত্তোলন না করতে দেখেছেন।'

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) এর হাদীস অনেক শক্তিশালী। কেননা তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ফকীহ (ইসলামী আইন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ) এবং আলিম। তিনি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহচর্য বেশী লাভ করেছেন। নামাযে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছেই দণ্ডায়মানকারী। কেননা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে তিনিই দাঁড়াতেন, যিনি আলিম ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। যা বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বর্ণিত।

হাদীস নং- ১৬-১৭ : তাহাবীও ইবনে আবি শায়বাহ হযরত মুজাহিদ থেকে

বর্ণনা করেছেন-

قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ إِبْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِى التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ

অর্থাৎ, 'তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদ্বি.) এর পিছে নামায পড়েছি। তিনি নামাযে প্রথম তাকবীর ছাড়া কখনো উভয় হাত উত্তোলন করতেন না।'

হাদীস নং- ১৮ : বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার বদরুদ্দীন আইনী (রাদ্বি.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন:

إِنَّهُ رَاٰى رَجُلًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الصَّلٰوةِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ عِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ لَهُ لَاتَفْعَلْ فَإِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَرَكَهُ

অর্থাৎ, 'তিনি এক ব্যক্তিকে রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে মাথা তোলার সময় উভয় হাত তুলতে দেখলেন। অতঃপর তাকে বললেন, এরূপ করো না। কেননা এটা এমন কাজ, যা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথমে করেছিলেন, এরপর ছেড়ে দিয়েছেন।'

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, রুকূর আগে ও পরে উভয় হাত উত্তোলন করা 'মানসুখ' তথা রহিত । যে সব সাহাবী থেকে কিংবা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে উভয় হাত উত্তোলন' প্রমাণিত, ওটা প্রথম আমল, পরবর্তীতে রহিত হয়েছে।

হাদীস নং- ১৯-২০ : ইমাম বায়হাকী ও তাহাবী হযরত আলী (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ ثُمَّ لَايَرْفَعُ فِى شَيْءٍ مِنْهَا

অর্থাৎ, 'তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযের প্রথম তাকবীরে তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করতেন। এরপর আর কোন অবস্থায়ই হাত উঠাতেন না।

হাদীস নং- ২১ : ইমাম তাহাবী হযরত আসওয়াদ (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ اِبْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ وَقَالَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

অর্থাৎ, 'তিনি বলেন, আমি হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাদ্বি.) কে দেখেছি তিনি প্রথম তাকবীরে উভয় হাত উত্তোলন করতেন। এরপর আর উঠাতেন না। ইমাম তাহাবী বলেছেন, এ হাদীসটি 'সহীহ'।

হাদীস নং-২২ : আবূ দাঊদ হযরত সুফ্‌য়ান থেকে বর্ণনা করেছেন-

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اِسْنَادُهُ بِهٰذَا قَالَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ مَرَّةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً-

অর্থাৎ, 'হযরত সুফ্‌য়ান এ সনদে বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) প্রথম বার হাত তুলেছেন। কোন কোন রাবী বলেন একবারই হাত তুলেছেন।

হাদীস নং- ২৩ : দারে কুত্বনী হযরত বারা ইবনে আযিব (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেছেন-

أَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اِفْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى حَاذٰى بِهِمَا اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ اِلٰى شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهٖ

অর্থাৎ, 'তিনি নবী করীম '(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখেছেন, যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায শুরু করেন উভয় হাত এ পরিমাণ তুললেন যে, তা কানদ্বয়ের সমান্তরাল হয়ে গেলে।অ'তঃপর নামায থেকে অবসর হওয়ার পূর্বে আর কোন ক্ষেত্রেই হাত উত্তোলন করেন নি।'

হাদীস নং- ২৪ : ইমাম মুহাম্মদ 'কিতাবুল আছারে' ইমাম আবূ হানীফা (রাদ্বি.) হাম্মাদ থেকে তিনি ইবরাহীম নাখঈ থেকে এ ভাবে বর্ণনা করেন-

إِنَّهُ قَالَ لَاتَرْفَعُ الْاَيْدِىْ فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَلٰوتِكَ [illegible]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ, 'তিনি বলেন, নামাযের মধ্যে প্রথম বার ছাড়া হাত উত্তোলন করো না।'

হাদীস নং- ২৫ : আবু দাউদ হযরত বারা ইবনে আযিব (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন:

أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اِفْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلٰى قَرِيْبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَايَعُوْدُ

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন নামায আরম্ভ করতেন,তখন উভয় হাত দু'কানের কাছে তুলতেন,এরপর আর পুনরাবৃত্তি করতেন না।' উভয় হাত তোলার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে আরো অনেক হাদীস রয়েছে। আমরা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে শুধুমাত্র পঁচিশটি রেওয়ায়াত উপস্থাপন করেছি। আরও অধিক জানতে ইচ্ছা হলে মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, তাহাবী শরীফ, সহীহ্‌বিখারী শরীফ পাঠ করতে পারেন।

পরিশেষে আমরা ইমামে আযম আবূ হানীফার (রাদ্বি.) ঐ বিতর্ক উপস্থাপন করছি, যা উভয় হাত উত্তোলন এর ব্যাপারে মক্কা মুয়ায্‌যামায় ইমাম আওযাঈ (রাদ্বি.) এর সাথে হয়েছিল। দর্শকগণ দেখেছেন যে, ইমামে আযম কোন্ স্তরের মুহাদ্দিস এবং কতো শক্তিশালী সহীহ সনদের হাদীস উপস্থাপন করেন।

ইমাম আবু মুহাম্মদ বোখারী মুহাদ্দিস (রাহ.) হযরত সুফ্‌য়ান ইবনে উয়াইনা (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত ইমামে আযম (রাদ্বি.) এবং ইমাম আওযাঈ (রাদ্বি.) এর সাক্ষাত হলো মক্কা মুয়ায্‌যামার 'দারুল হানাতীন' নামক স্থানে। এ দু'জন বুযুর্গের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হলো। এ 'বিতর্ক' ফতহুল ক্বাদীর এবং 'মিরক্বাত শরহে মিশকাত' ইত্যাদিতে উল্লেখিত রয়েছে। বিতর্কটি হুবহু নিম্নে উদ্বৃত করা হলো।

ইমাম আওযাঈ ঃ আপনি রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ হতে উঠার সময় উভয় হাত উত্তোলন করেন না কেন?

ইমাম আবূ হানীফা : এ জন্যই যে, এ সব জায়গায় উভয় হাত উত্তোলন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বারা প্রমাণিত নয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইমাম আওযাঈ : আপনি এটা কিভাবে বললেন? আমি আপনাকে উভয় হাত তোলার ব্যাপারে সহীহ হাদীস শুনাচ্ছি-

حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ مِنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَعِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ-

অর্থাৎ, 'আমাকে যুহরী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি সালিম থেকে, সালিম নিজ পিতা থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উভয় হাত তুলতেন,যখন নামায শুরু করতেন এবং রুকূর সময় আর রুকূ থেকে উঠার সময়।'

ইমামে আযম : আমার কাছে এর চেয়ে বেশী শক্তিশালী হাদীস এর বিপরীতে বিদ্যমান।

ইমাম আওযাঈ : আচ্ছা! জল্দি পেশ করুন।

ইমামে আযম : নিন। শুনুন।

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَايَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّاعِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ لَايَعُوْدُ لِشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ-

অর্থাৎ, 'আমার কাছে হযরত হাম্মাদ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবরাহীম নাখঈ থেকে, তিনি হযরত আলক্বামা এবং আসওয়াদ থেকে , তাঁরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন- নিশ্চয়ই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধুমাত্র নামাযের শুরুতে উভয় হাত উত্তোলন করতেন। এরপর আর কখনো পুনরাবৃত্তি করতেন না।'

ইমাম আওযাঈ : আমার পেশকৃত হাদীসের উপর আপনার উপস্থাপিত হাদীসের শ্রেষ্ঠত্ব কি? যার কারণে এটা গ্রহণ করলেন, আর আমার পেশকৃত হাদীস ছেড়ে দিলেন।

ইমামে আযম ঃ এ জন্যই যে, 'হাম্মাদ' 'যুহ্‌রী'র চেয়ে বড় আলিম ও ফক্বীহ। আর ইবরাহীম নাখঈ সালিম এর চেয়ে বড় আলিম ও ফক্বীহ। আলক্বামা 'সালিমে'র পিতা অর্থাৎ, 'আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের' চেয়ে ইলমের ক্ষেত্রে কম নন। 'আসওয়াদ' অনেক বড় খোদাভীরু ফক্বীহ এবং উত্তম। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) হলেন ফক্বীহ। কিরাআতের ক্ষেত্রে এবং হুযুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহচর্যের ক্ষেত্রে হযরত ইবনে ওমর (রাদ্বি.) থেকে অনেক বড় ছিলেন। শৈশব থেকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে থাকতেন। সুতরাং আমার হাদীসখানার রাবী আপনার হাদীসের রাবীদের চেয়ে ইলম ও মর্যাদার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। এ জন্যই আমার পেশকৃত হাদীস বেশী শক্তিশালী এবং গ্রহণযোগ্য। ইমাম আওযাঈ নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

গায়রে মুক্বাল্লিদ লা-মাযহাবীরা ইমামে আযম সাহেবের এ সনদ দেখুন এবং এতে কোন ত্রুটি বের করুন। ইমাম আওযাঈর নীরবতার কোন হেতু খুঁজে পাবেন না। এটাই ইমাম আযমের হাদীসজ্ঞান এবং এটাই তাঁর হাদীসের সনদ তথা বর্ণনা সূত্র। আল্লাহ তায়ালা হক্বকে কবূল করার তাওফীক দান করুন। জেদের কোন প্রতিষেধক নেই। এসৰলম্বা লম্বা সনদগুলো এবং তাঁদের মধ্যে দুর্বল রাবীদের অন্তর্ভুক্তি হযরত ইমামে আযম (রাদ্বি.) এর পরে উদ্ভব হয়েছে। ইমামে আযম (রাদ্বি.) যে হাদীসই গ্রহণ করেছেন,তা সম্পূর্ণ সহীহ ছিল।

বিবেকের চাহিদাও এটা যে, রুকূতে উভয় হাত উত্তোলন না হওয়া। কেননা সবার ঐকমত্য এটার উপর যে তাকবীরে তাহরীমায় উভয় হাত উত্তোলন হবে। আর সবার ঐকমত্য এটার উপর যে সিজদা এবং বসার তাকবীরগুলোতে উভয় হাত উত্তোলন' না হওয়া। রুকূর তাকবীরে মতানৈক্য রয়েছে। দেখতে হবে রুকুর তাকবীর তাকবীরে তাহরীমার মতো,না সিজদা ও আত্তাহিয়্যাত এর তাকবীরের মতো। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, রুকুর তাকবীর তাকবীরে তাহরীমার মত নয়। বরং সিজদা ও আত্তাহিয়্যাতের তাকবীরগুলোর মত। কেননা, তাকবীরে তাহরীমা হলো ফরয, যা ছাড়া নামায হয় না এবং রুকূ ও সিজদার তাকবীরগুলো সুন্নাত,ওগুলো ছাড়াও নামায হয়ে যায়। তাকবীরে

www.AmarIslam.com

তাহরীমা নামাযে একবার হয়। রুকূ ও সিজদার তাকবীরগুলো বার বার হয়। তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা মূল নামায আরম্ভ হয়। রুকূ সিজদার তাকবীরগুলো দ্বারা নামাযের রুকন শুরু হয়, মূল নামায নয়।

তাকবীরে তাহরীমা নামাযীর উপর পার্থিব কাজ খাওয়া,পান করা ইত্যাদি হারাম করে দেয়,কিন্তু রুকু সিজদার তাকবীরে এ অবস্থা নেই। এ গুলোর আগেই নিষেধাজ্ঞা এসে গিয়েছে।

যখন রুকূর তাকবীর সিজদার তাকবীরের মত, তাকবীরে তাহরীমার মত নয়, তাহলে উচিত হবে রুকুর তাকবীরেরও ঐ অবস্থাই হবে, যা সিজদার তাকবীরে অবস্থা। অর্থাৎ হাত না তোলা। এ জন্য সত্য এটাই যে, রুকুতে কখনো উভয় হাত তুলবে না। (তাহাবী শরীফ)

সারকথা এটাই যে, রুকুর সময় উভয় হাত তোলা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত ও হযরাতে সাহাবা বিশেষতঃ খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের পরিপন্থী এবং শরয়ী জ্ঞানেরও বিরোধী। যে সব রেওয়ায়াতে উভয় হাত তোলার কথা এসেছে, সব গুলোই মানসূখ তথা রহিত। যেমন হাদীস নং-(১৮) এ বর্ণিত আছে। অথবা ঐ সব হাদীস 'মারজুহ' (দু'টি হাদীসের দ্বন্দ্বের সময় যেটি গ্রহণযোগ্য হয় না) এবং আমল যোগ্য নয়। নইলে হাদীসগুলোর মধ্যে কঠিন দ্বন্দ্ব এসে যাবে।

এটাও স্মর্তব্য যে, নামাযে নীরবতা ও প্রশান্তি প্রয়োজন। কোন কারণ ছাড়া নড়া চড়া ও অঙ্গভঙ্গি করা দোষণীয় এবং সুন্নাতের পরিপন্থী। এ জন্যই নামাযে অপ্রয়োজনে পা দোলানো ও অঙ্গুলি নড়াচড়া করা নিষিদ্ধ। উভয় হাত উত্তোলন অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া। সুতরাং উভয় হাত উত্তোলনের হাদীসগুলো নামাযের প্রশান্তির বিরোধী এবং হাত না তোলার ব্যাপারে হাদীসগুলো নামাযের প্রশান্তির সমর্থনকারী। তাই বিবেকেরও চাহিদা হলো হাত উত্তোলন না করার হাদীসগুলোর উপর আমল হওয়া।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলার উপর আপত্তি ও জবাব

গায়রে মুকাল্লিদ তথা লা-মাযহাবী ওহাবীদের পক্ষ থেকে আজ পর্যন্ত উভয়

হাত উত্তোলনের মাসআলার ক্ষেত্রে যে সব আপত্তি আমাদের কাছে পৌঁছেছে আমরা চূড়ান্ত দৃঢ়তার সাথে বিস্তারিতভাবে জবাবসহ আলোকপাত করছি। রব তাআলা কবুল করুন।

আপত্তি নং- ১ : উভয় হাত উত্তোলন না করার ব্যাপারে যে সব বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে, সবই 'যঈফ' তথা দুর্বল। আর দুর্বল হাদীস পালনযোগ্য হয় না। (সেই পুরোনো কাসুন্দি)

জবাব : জি হ্যাঁ, শুধুমাত্র এ জন্যই যঈফ (দুর্বল) যে তা আপনাদের বিরোধী। আর যদি আপনাদের পক্ষে হতো এমনকি মনগড়া বিষয়ও হতো,তবুও আপনাদের কাছে গ্রহণীয় হতো। জনাব আপনাদের দুর্বল! দুর্বল! চিৎকার লোকদেরকে হাদীস অস্বীকারকারী বানিয়ে দিয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে এ অভ্যাস ছেড়ে দিন। আমরা 'যঈফ' তথা দুর্বল হওয়া সংক্রান্ত অনেক উত্তর বিগত অধ্যায়গুলোতে আলোকপাত করেছি।

আপত্তি নং- ২ : আবূ দাউদ শরীফের হযরত বারা ইবনে আযিব (রাদ্বি.) বর্ণিত হাদীসে স্বয়ং ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেছেন- هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِصَحِيْحٍ অর্থাৎ 'এ হাদীসটি 'সহীহ' নয়।' বুঝা গেল যে, এ হাদীসটি 'যঈফ'। এরপর ও আপনারা তা পেশ করলেন কেন?

জবাব :এর কয়েকটি জবাব রয়েছে। প্রথমতঃ কোন হাদীস 'সহীহ' না হওয়ার দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না, যে,তা 'যঈফ'। 'সহীহ' এবং 'যঈফ' এর মাঝখানে 'হাসান বিনাফসিহী' 'হাসান বিগায়রিহীর' স্তরও রয়েছে। আবু দাউদ 'সহীহ' হওয়াকে অস্বীকার করেছেন কিন্তু 'যঈফ' হওয়ার দাবী করেন নি।

দ্বিতীয়ত : আবূ দাউদ কর্তৃক 'এ হাদীস সহীহ নয়' বলা অস্পষ্ট 'জরূহ'। তিনি সহীহ না হওয়ার কারণ হিসাবে বলেননি যে, কোন্ রাবী (বর্ণনাকারী) দুর্বল এবং কেন দুর্বল। 'জরহে মুবহাম' বিবেচ্য নয়। আমরা 'আবূ দাঊদ' এর মুকাল্লিদ (অনুসারী) নই যে, তাঁর সকল 'জরূহ' মন্তব্য চোখ বন্ধ করে মেনে নেব।

আপত্তি নং- ৩ : ইমাম আবূ দাঊদ আপনাদের উপস্থাপিত হাদীস নং ২৫ প্রসঙ্গে বলেন, এ হাদীসে ইয়াযিদ ইবনে আবী যিয়াদ রয়েছে। যার শেষ বয়সে 'বিস্মৃতি'র রোগ হয়েছিল। তিনি বৃদ্ধ অবস্থায় বলেছেন- ثُمَّ

لَا يَعُوْدُ (অর্থাৎ, 'অতঃপর তিনি পুনরাবৃত্তি করেননি) নয়তো মূল হাদীসের মধ্যে এ শব্দগুলো ছিলো না। নিন, এবার বিস্তারিত 'জরহ' উপস্থিত। এখন এ হাদীসটি অকাট্যভাবে 'যঈফ' তথা দুর্বল, যা আমলযোগ্য নয়।

জবাব : এর কয়েকটি জবাব রয়েছে। প্রথমতঃ ইয়াযীদ ইবনে আবী যিয়াদ আবূ দাউদ এর এ বর্ণনার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু ইমামে আযম আবূ হানীফা (রাদ্বি.) এর সনদের (বর্ণনাসূত্র) মধ্যে নেই। সুতরাং এ সনদ আবূ দাউদ এর কাছে যঈফ হয়ে এসেছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (রাদ্বি.) এর কাছে 'সহীহ' হয়ে এসেছে। আবূ দাউদের দুর্বলতা ইমাম আবু হানীফার জন্য ক্ষতিকর হবে কেন?

দ্বিতীয়ত : 'উভয় হাত না তোলা'র হাদীস অনেকগুলো সনদের মাধ্যমে বর্ণিত আছে। সবগুলোতে ইয়াযীদ ইবনে আবী যিয়াদ বিদ্যমান নেই। যদি এ সনদটি 'যঈফ' হয়,তাহলে বাকী সনদগুলো কেন 'যঈফ' হবে?

তৃতীয়ত : ইমাম তিরমিযী (রহ.) উভয় হাত না তোলার হাদীসগুলোকে 'হাসান' বলেছেন এবং এর উপর অনেক সাহাবীর আমল বর্ণনা করেছেন। আপনাদের দৃষ্টি আবূ দাউদ এর 'যঈফ' বলার দিকে গেল, কিন্তু ইমাম তিরমিযীর 'হাসান' বলার দিকে গেলো না এবং সাহাবায়ে কিরামের আমলের দিকে গেলো না। এটা কেমন কথা?

চতুর্থত: যদি এ হাদীসের সব সনদই 'যঈফ' হয়, তবুও সব 'যঈফ' তথা দুর্বল সনদ মিলে শক্তিশালী হয়ে যায় , যা আমরা 'মুকাদ্দিমা'য় আলোচনা করেছি।

পঞ্চমত : সমস্ত আলেমগণ, আউলিয়ায়ে কিরাম, অধিকাংশ মিল্লাতে ইসলামিয়্যাহ্‌র 'উভয় হাত না তোলার' উপর আমল আছে। এটার দ্বারাও এ হাদীসটি শক্তিশালী হয়ে যাচ্ছে। গুটিকয়েক ওহাবী ছাড়া সবাই এর উপর আমলকারী। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো- আপনাদের দেড়জন লোকের দল সত্যের উপর রয়েছে, আর সমস্ত উম্মতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গোমরাহীর উপর!

স্মর্তব্য যে, পৃথিবীতে শতকরা পঁচান্নব্বই জন মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী। আর পাঁচজন অন্যান্য মাযহাবের। এ ধারণার বাস্তবতা হারামাইনে তাইয়িবাইনে (মক্কায়ে মুআয্‌যামাহ ও মদীনায়ে মুনাওয়ারাহ) গেলেই বুঝা যায়। যেখানে সব দেশের মুসলমান একত্রিত হয়। বেচারা 'ওহাবীতো কোন গণনায়ও নেই। সম্ভবতঃ হাজারে একজনই হবে। সরকারে দোআলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করছেন-

مَا رَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ

অর্থাৎ, 'যেটাকে সমস্ত মুসলমান উত্তম মনে করে,তা আল্লাহর কাছেও উত্তম।'

আরও ইরশাদ করছেন-

اِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَاِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ

অর্থাৎ, 'আমার উম্মতের বড় দলের অনুসরণ কর। যে বড় দল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, সে দোযখে বিচ্ছিন্ন ভাবে যাবে।'

স্মর্তব্য যে, শাফিঈ, মালিকী, হাম্বলী, হানাফী সবাই একই দলের অন্তর্ভূক্ত। সবার আক্বাইদ (ধর্মীয় বিশ্বাস) একই। সবাই মুকাল্লিদ। গায়রে মুকাল্লিদ তথা লা মাযহাবী নামক মুষ্টিমেয় দলটি আক্বাইদের ক্ষেত্রেও মুসলমানদের থেকে আলাদা। আমলের ক্ষেত্রেও ভিন্ন। এ জন্য হানাফীদের কোন হাদীস দুর্বল হতে পারেনা; বরং উম্মতের আমলের দ্বারা শক্তিশালী। দেখুন 'মুকাদ্দিমাহ'।

আপত্তি নং- ৪ : তোমাদের উপস্থাপিত হাদীস নম্বর (১) যা তিরমিযী ও অন্যান্যরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেছেন তা খুবই সংক্ষিপ্ত। কেননা এতে নামাযের সব পদ্ধতি বর্ণিত হয় নি। শুধুমাত্র এটাই বলা হয়েছে যে, হযরত ইবনে মাসঊদ (রাদ্বি.) কেবল একবার হাত তুলেছেন। আগে কি করেছেন,তা উল্লেখ করা হয়নি এবং 'মুজমাল' তথা সংক্ষিপ্ত হাদীস আমলযোগ্য নয়।

জবাব : জনাব! এ হাদীসটি 'মুজমাল' নয়। মুত্বলাকও (তথা সাধারণ) নয়। আমও (তথা ব্যাপক) নয়। শব্দগত কিংবা অর্থগত ভাবে মুশতারাকও (তথা যৌথ অর্থ জ্ঞাপক) নয়। বরং মুখতাছার তথা সংক্ষিপ্ত হাদীস। মুখতাছার এর

উপর আমল করতে কে নিষেধ করেছে? আর মুজমালও বক্তার বর্ণনার পরে আমল যোগ্য। বরং আমল করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা, 'মুজমাল' বক্তার বর্ণনার পরে 'মুহকাম' তথা সুদৃঢ় হয়ে যায়।

আমাদের ঘোষণা : সারা পৃথিবীর ওয়াহাবী গায়রে মুকাল্লিদদের প্রতি ঘোষনা মুত্বলাক, আম, মুজমাল, মুশতারাকে লাফযী, মুশতারাকে মা'নভীর মধ্যে পার্থক্য বলুন এবং এগুলো থেকে প্রত্যেকটির পরিপূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করুন। কিন্তু কোরআন ও হাদীসের আলোতে উসূলে ফিক্হ কিংবা মানতিক (তর্কশাস্ত্র) ইত্যাদির প্রতি হাত দেবেন না।

লা-মুযহাবীরা! তোমরা তো হাদীসের ভুল তরজুমাই করো। তোমাদের এ সব ইলমী বিষয়াদির সাথে কি সম্পর্ক? কোন হানাফী আলেমের কাছে থেকে 'মুজমাল' শব্দটা শুনে থাকবে। আর ভয় দেখানোর জন্য এখানে আপত্তি জুড়ে দিয়েছো এবং এতে শোনা শব্দটা ব্যবহার করে ফেললে। আল্লাহ তাআলা ইল্মের সমুদ্র তো মুকাল্লিদদের সীনায় বইয়ে দিয়েছেন।

আপত্তি নং- ৫ : আবূ দাউদ, তিরমিযি, দারিমী, ইবনে মাজাহ প্রমুখ হযরত আবূ হুমাইদ সাঈদী থেকে একটি লম্বা হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। যাতে উভয় হাত তোলা প্রসঙ্গে এই এবারত রয়েছে-

ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىْ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهٗ فَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ-

অর্থাৎ, 'অতঃপর তিনি তাকবীর বলতেন এবং স্বীয় উভয় হাত এ পরিমাণ উঠাতেন যাতে কাঁধের সমান্তরাল হয়ে যেতো এবং রুকূ করতেন আর উভয় হাতের তালু স্বীয় হাঁটুদ্বয়ের উপর রাখতেন। এরপর মাথা তুলতেন আর বলতেন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ অতঃপর স্বীয় উভয় হাতকে এ পরিমাণ তুলতেন যাতে উভয় কাঁধের সমান্তরাল হয়ে যেতো।'

আবূ হুমাইদ সাঈদী একদল সাহাবীর কাছে এ হাদীস পেশ করেছেন, যাতে রুকূর সময় উভয় হাত তোলার উল্লেখ রয়েছে এবং সকলেই তাঁকে সমর্থন করেছেন। বুঝা গেল, উভয় হাত তোলা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) এর কাজ এবং সাহাবায়ে কিরামের সমর্থন ও আমল। এ জন্য এর উপর আমাদেরও আমল করা উচিত। (নোট- এ হাদীসটি লা মুযহাবীদের চূড়ান্ত দলীল, যার জন্য এদের অনেক গর্ব।)

জবাব : এর কয়েকটি জবাব রয়েছে। গভীর চিন্তার সাথে পর্যবেক্ষণ করুন।

প্রথমত: এ হাদীসটি সনদের ক্ষেত্রে আমলযোগ্য নয়। কেননা এর হাদীসের সনদ আবূ দাউদ ও অন্যান্যের মধ্যে এরূপ-

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهٰذَا حَدِيْثُ اَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرَ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِوابْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِىَّ فِىْ عَشَرَةِ الخ

অর্থাৎ, 'আমাকে মুসাদ্দাদ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাকে ইয়াহইয়া হাদীস শুনিয়েছেন। আহমদ বলেছেন, আমাকে আবদুল হামীদ ইবনে জা'ফর তিনি বলেন আমাকে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আতা সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন আমি আবূ হামীদ সাইদী থেকে দশ জন সাহাবীর একটি দলের মাঝে শুনেছি.....'।

তাঁদের মধ্য থেকে আবদুল হামীদ ইবনে জা'ফর অধিক মাজরূহ (তথা সমালোচিত) এবং 'যঈফ'। দেখুন, তাহাবী শরীফ।

তাছাড়া মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আত্বা আবূ হামীদ সাঈদীর সাথে সাক্ষাতও করেননি এবং বলে দিলেন 'আমি তার কাছ থেকে শুনেছি।'

এটা ভুল। মাঝখানে কোন রাবী ছুটে গেছে যা অজ্ঞাত। (তাহাবী)। এ দু'টো ত্রুটির কারণে এ হাদীসও আমলের অযোগ্য। কিন্তু যেহেতু আপনাদের অনুকূল, তাই আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। একটু লজ্জাতো করুন।

দ্বিতীয়তঃ হাদীসটি আপনাদেরও বিরোধী। কেননা এ হাদীসের মধ্যে এটাও রয়েছে যে-

ثُمَّ اِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ

www.AmarIslam.com

بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ-

অর্থাৎ, 'এরপর যখন দু'রাকআত পড়ার পর উঠতেন,তখন তাকবীর বলতেন এবং স্বীয় উভয় হাত তুলতেন এমনকি কাঁধের সমান্তরাল হয়ে যেতো, যেমনি ভাবে নামাযের শুরুতে করে ছিলেন। বলো! আপনারা দু'রাকআত থেকে উঠার সময় উভয় হাত উত্তোলন' করেন না কেন?

তৃতীয়ত : যখন আবু হামীদ সাঈদী এ হাদীসটি সাহাবায়ে কিরামের সমাবেশে উপস্থাপন করলেন,তখন তারা বললেন- যা আবূ দাঊদ শরীফে আছে- قَالُوْا نَعَمْ فَوَاللّٰهِ كُنْتَ بِاَكْثَرِنَا اِسْتِبَةً وَ اَقْدَمْنَا لَهٗ صُحْبَةً قَالَ بَلٰى

অর্থাৎ, 'তাঁরা বললেন, তুমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে নামাযের ব্যাপারে আমাদের চেয়ে কি ভাবে বেশী জান? না তুমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গ আমাদের চেয়ে বেশী পেয়েছো? না তুমি আমাদের আগে সাহাবী হয়েছো? তখন আবূ হুমাইদ বললেন, নিঃসন্দেহে এমনই।'

এ থেকে বুঝা গেল, আবূ হুমাইদ না সাহাবীদের মধ্যে ফকীহ ও আলিম, না তাঁর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গ বেশী লাভ হয়েছিলো। আর সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) আলিম, ফক্বীহ সাহাবী। যিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছায়ার মত থেকেছেন। তিনি উভয় হাত তোলার বিরুদ্ধে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং অকাট্যভাবেই আবূ হুমাইদ সাইদীর রিওয়ায়াতের মুকাবিলায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) এর বর্ণনা অধিক বিবেচ্য। যেমনটি হাদীস সমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের হুকুম। এ জন্য তোমাদের এ হাদীসটি একেবারেই আমলের অযোগ্য।

চতুর্থত : আবূ হুমাইদ সাঈদী এটা বলেননি যে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আজীবন উভয় হাত তুলেছেন। শুধুমাত্র এটা বললেন যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ করতেন। কিন্তু কোন্ সময় পর্যন্ত, এ সম্পর্কে নিশ্চুপ। আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে হাদীস উপস্থাপন করেছি যে, 'উভয় হাত তোলার হাদীসগুলো মান্‌সুখ তথা রহিত। এটা সেই রহিত হওয়া হাদীসের বর্ণনা যে, এক সময় হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ করতেন,

বর্তমানে আমলযোগ্য নয়।

পঞ্চমত : এ হাদীসটি শরীয়তের ক্বিয়াসের পরিপন্থী। আর সাইয়িদুনা ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) এর রেওয়ায়াত ক্বিয়াসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এ জন্য ঐ হাদীসটির আমল করা ওয়াজিব এবং তোমাদের এ বর্ণনা পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। কেননা যখন হাদীসসমূহের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব হয় তখন শরীয়তের ক্বিয়াসের ভিত্তিতে একটার প্রধান্য হয়। এর অনেক উদাহরণ বিদ্যমান। দেখুন একটি হাদীসে রয়েছে- اَلْوُضُوْءُ مِنْ مَامَسَّتْهُ النَّارُ অর্থাৎ, 'আগুনে রান্নাকৃত বস্তু ব্যবহারের দ্বারা অযূ করা ওয়াজিব।'

অন্য হাদীস শরীফে বর্ণিত হুযুর আনওয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আহার সম্পন্ন করার পর অযু করা ছাড়া নামায পড়েছেন। এখানে হাদীসগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়েছে। তাই প্রথম হাদীসকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। কারণ তা ক্বিয়াসের পরিপন্থী। দিন-রাত গরম পানি দ্বারা অযু করা হয়। দ্বিতীয় হাদীসের আমল ওয়াজিব হয়েছে। কারণ তা কিয়াসের সাথে সংগতিপূর্ণ। এখানেও একই হুকুম। (অর্থাৎ, উভয় হাত তোলার হাদীসগুলোর হুকুমও এটাই)

ষষ্ঠত : সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের আমল তোমাদের উপস্থাপিত হাদীসের বিপরীত, যা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে আলোকপাত করেছি। বুঝা গেল,সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টিতে 'উভয় হাত তোলা'র হাদীস মানসূখ (তথা রহিত)।

সপ্তমত : আবূ হুমাইদ সাঈদীর এ বর্ণনায় আবদুল হামীদ ইবনে জা'ফর এবং মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আত্বা এ রূপ অগ্রহণযোগ্য রাবী রয়েছেন যে, আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যেমন ইমাম (মারভী) 'জাওহারে নক্বী'তে বলেন আবদুল হামীদ হাদীস অমান্যকারী। এ ইমাম মারভী হলেন, যার সম্পর্ক ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বলছেন- هُوَ اِمَامُ النَّاسِ فِىْ هٰذَا الْبَابِ অর্থাৎ, 'তিনি হাদীস শাস্ত্রের ইমাম'। মুহাম্মদ ইবনে আমর এমন মিথ্যাবাদী 'রাবী' আবূ হুমাইদ সাঈদীর সাথে তার কখনোই সাক্ষাত হয়নি। অথচ বললেন, سَمِعْتُ অর্থাৎ, 'আমি তাঁর কাছ থেকে শুনেছি।'

এ ধরণের মিথ্যাবাদী লোকের বর্ণনা বানানো। কিংবা কমপক্ষে প্রথম স্তরের মুদাললাস তথা কলুষিত। এ হাদীসের সনদের মধ্যেই সাংগাতিক গণ্ডগোল রয়েছে। সনদও বিশৃঙ্খল আর মতনও বিশৃঙ্খল। যেমন আত্বাফ ইবনে খালিদ

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

যখন এ বর্ণনা করেছেন,তখন মুহাম্মদ ইবনে আমর এবং আবূ হুমাইদ সাঈদীর মাঝখানে একজন অজ্ঞাত রাবী উল্লেখ করেছেন। এ জন্য এ হাদীসটি মাজহুলও। অর্থাৎ, এ হাদীসে একটি নয়, অনেক ত্রুটি। এটা 'মুনকার' ও আবার মুযতারাবও। মুদাল্লাস কিংবা 'মাওযু' তথা বানানোও,মাজহুলও। দেখুন, আবূ দাউদ এর হাশিয়ায়। একই অবস্থান এরূপ রিওয়ায়াত তো নাম নেওয়ার যোগ্যও নয়। এ ধরণের হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ প্রশ্নই উঠে না।

অষ্টমত : ইমাম বোখারীও আবূ হুমাইদ সাইদীর এ বর্ণনা নিয়েছেন। কিন্তু না তাতে এমন রাবী রয়েছে, না সেখানে উভয় হাত তোলার উল্লেখ রয়েছে। দেখো মিশকাত শরীফ সিফাতুস্ সালাত অধ্যায়।

যদি তাদের রিওয়ায়াতে উভয় হাত তোলার উল্লেখ বৈধ হতো,তাহলে ইমাম বুখারী কখনো তা ত্যাগ করতেন না। যেভাবেই হোক আপনাদের এ হাদীসটি কোন অবস্থায় লক্ষ্য করার যোগ্য নয়।

হানাফী ভাইয়েরা! উভয় হাত তোলা গায়রে মুকাল্লিদ ওহাবীদের শীর্ষ মাসআলা এবং এ আবূ হুমাইদ সাঈদীর এ হাদীস ওদের গর্ব করার মতো দলীল, যা লা-মাযহাবীদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরও মুখস্থ থাকে। সাধারণ হানাফীরা তাদের আত্মগর্ব দেখে মনে করে যে, এদের দলীলগুলো খুবই শক্তিশালী। আলহামদুলিল্লাহ! এ দলীলের সকল বিভ্রান্তি দূর হলো। এখন তারা এ হাদীসটি পেশ করার সাহস করবে না। স্মর্তব্য যে, লা-মাযহাবী ওহাবীদের কোন সনদ মাজরূহ (তথা সমালোচিত) হওয়া ওহাবীদের জন্য কি্বয়ামত স্বরূপ। কেননা তাঁদের মাযহাবের ভিত্তি ঐ সব সনদের উপরই। যদি একটি সনদ ভুল হয়ে যায় তখন বুঝবে ওদের মাযহাবের একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেননা বেচারাদের জন্য বর্ণিত সনদগুলো ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। এ পীরছাড়া, ইমামহীন, মুরশিদহীন, নূরবিহীন লোকগুলো এ আয়াতের সত্যতা প্রকাশকারী । রব তাআলা ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

অর্থাৎ, 'যাকে আল্লাহ গোমরাহ করে, না তার ওলী মিলবে; না কোন মুরশিদ।'

আল্লাহ আরও ইরশাদ করেন- وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ।

অর্থাৎ, 'যাকে আল্লাহ তাআলা লা'নত করেন,তার কোন সাহায্যকারী নেই।'

কিন্তু হানাফীদের হাদীসের কোন সনদ মাজরূহ হওয়ার দ্বারা হানাফীদের উপর কোন প্রভাব পড়ে না। আমাদের ফিক্হী মাসাআলাসমূহ এ ধরনের সনদগুলোর উপর নির্ভরশীল নয়। বরং হযরত ইমামুল আইম্মা কাশিফুল গুম্মা, সিরাজুল আইম্মাহ ইমামে আ'যম আবূ হানীফা (রাদ্বি.) এর পবিত্র নির্দেশের উপর। (তিনি) ঐ ইমামে আযম, যিনি উম্মতের প্রদীপ। ইমাম বুখারী এবং সমস্ত মুহাদ্দিসের উস্তাদগণের উস্তাদ, যার দামানের নীচে রয়েছেন হাজারো অলী ও আলেম। যার মাযহাব ঐ সব স্থানে বিরাজমান,যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দ্বীন বিদ্যমান। তার কথা আমাদের মাসআলাগুলোর জন্য দলীল স্বরূপ। হ্যাঁ, ইমামে আযমের দলীলসমূহ হলো কুরআনে পাকের আয়াতসমূহ ও ঐ সব সহীহ হাদীসসমূহ যেগুলোতে না কোন সন্দেহ রয়েছে, না কুয়াশা (অস্পষ্টতা)। কেননা, ইমামে আযম হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অত্যন্ত নিকটতম সময়ে ছিলেন।

দৃষ্টান্ত : দেখুন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মীরাছ বন্টন করেননি। অথচ কোরআনে করীমে মীরাছ বন্টনের নির্দেশ রয়েছে। যখন এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপিত হলো তখন তিনি বললেন, আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছি, আম্বিয়ায়ে কিরামের মীরাছ বন্টন করা হয় না। যেহেতু সিদ্দীকে আকবর (রাদ্বি.) এ হাদীসখানা সঠিকভাবেই শুনেছেন। তাই এর উপর নির্বিচারেই আমল করলেন। যদি এ হাদীস দ্বারা আমরা প্রমাণ পেশ করতাম তখন আমাদের উপর হাজারো বিপদ এসে যেতো। সনদের উপর হাজার রকমের সমালোচনা হয়ে যেতো। অথচ সিদ্দীকে আকবরের চোখ 'নীরব কুরআনে' মীরাছ বন্টনের নির্দেশ দেখেছিলো, কিন্তু তাঁর কান 'সরব কুরআনে' রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন যে, এ হুকুম থেকে আম্বিয়ায়ে কিরাম বাদ রয়েছেন।

যেমনি ভাবে সিদ্দীকে আকবর (রাদ্বি.) এর হাদীস সমালোচনা ও অপবাদ

থেকে পবিত্র, তেমনি ভাবেই ইমামে আযম আবূ হানীফা (রাদ্বি.) এর রেওয়ায়াত সমূহও সমালোচনা ও দুর্নাম থেকে পবিত্র। যেহেতু তাঁর সময় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সংলগ্ন। তাই লা-মাযহাবীদের জন্য এ সনদগুলো বিপদ। আমরা মুকাল্লিদদের উপর ঐ সব জরহগুলোর কোন প্রভাব নেই। দেখো আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে ইমামে আযমের যে সনদ উপস্থাপন করেছি, সুবহানাল্লাহ! তা কতোই না পরিষ্কার সনদ। কোন লা-মাযহাবীর এ সাহস আছে কি এ সনদের কোন খুঁত বের করার।

আপত্তি নং- ৬ : ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেছেন-

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَاِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذٰلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَايَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى السُّجُوْدِ-

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উভয় হাত মোবারক কান পর্যন্ত তুলতেন। যখন নামায আরম্ভ করতেন এবং যখন রুকূর জন্য তাকবীর বলতেন, আর যখন রুকূ থেকে মাথা তুলতেন, তখনও এমনভাবে উভয় হাত তুলতেন এবং বলতেন, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ। আর সিজদায় উভয় হাত তুলতেন না।'

এ হাদীস মুসলিম ও বুখারী শরীফের। একেবারে বিশুদ্ধ সনদের। যা দ্বারা 'উভয় হাত উত্তোলন' রুকূর সময়ও সাব্যস্ত এবং রুকুর পরেও।

জবাব : এর কয়েকটি জবাব রয়েছে। প্রথমত: এ হাদীসে এটা তো উল্লেখ রয়েছে যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকূতে উভয় হাত তুলতেন। কিন্তু এটা উল্লেখ নেই যে শেষ পর্যন্ত হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ আমল ছিল কিনা? আমরাও বলছি যে, উভয় হাত উত্তোলন ইসলামের প্রথমে নিশ্চয়ই ছিলো। পরে মানসূখ (রহিত) হয়েছে। এ হাদীসে ঐ রহিত কাজেরই উল্লেখ রয়েছে। এর মানসুখ হওয়াটা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদেই বর্ণনা করেছি।

দ্বিতীয়ত : সাহাবায়ে কিরাম উভয় হাত তোলা ছেড়ে দিয়েছেন। এর কারণ শুধুমাত্র এটাই যে, তাঁদের দৃষ্টিতে 'উভয় হাত উত্তোলন' মানসূখ (রহিত)। যেমন দারু কুত্বনী, পৃষ্ঠা ১১১ তে সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে-

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِىْ بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوْا اَيْدِيَهُمْ اِلَّا عِنْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى فِىْ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ-

অর্থাৎ 'তিনি বলেন- আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ সিদ্দীক (রাদ্বি.) এবং উমর (রাদ্বি.) এর সাথে নামায পড়েছি। ঐ হযরতগণ নামাযের প্রারম্ভে প্রথম তাকবীর ব্যতীত আর কোন সময় হাত উঠাননি।' বলুন জনাব! যদি 'উভয় হাত উত্তোলন' স্থায়ী সুন্নাত হয়, তাহলে এ মহান ব্যক্তিগণ এর আমল ছেড়ে দিলেন কেন?

তৃতীয়ত : ঐ হাদীসের রাবী হযরত সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.)। আর স্বয়ং তাঁর আমল এর বিপরীত তিনি উভয় হাত উত্তোলন করতেন না, যেমন আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত করেছি। আর যখন স্বয়ং রাবীর আমল স্বীয় রিওয়ায়াতের বিপরীত হয় তাহলে বুঝা গেল যে, এ হাদীস স্বয়ং রাবীর মতেই রহিত। আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে এটাও দেখলাম যে, হযরত আলী মুরতাদ্বা (রাদ্বি.)ও উভয় হাত উত্তোলন করতেন না। এ সাহাবীদের আমল হাদীসের রহিত করণ সাব্যস্ত করেছে।

চতুর্থত : 'রিসালায়ে আফতাবে মুহাম্মদী' তে রয়েছে এ হাদীস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) থেকে কয়েকটি সনদে বর্ণিত। আর তা একেবারেই দুর্বল, কেননা একটি বর্ণনায় 'ইউনুস' রয়েছেন যিনি একেবারে দুর্বল। যেমন 'তাহযীবে' রয়েছে। এর অন্য সনদে আবূ কিলাবাহ রয়েছেন, যার মাযহাব ছিলো 'খারিজী', অর্থাৎ, 'নাসিবী'। দেখুন 'তাহযীব'। তৃতীয় সনদে রয়েছেন ওবায়দুল্লাহ। সে খাঁটি রাফিযী ছিলো। চতুর্থ সনদে শুআইব ইবনে ইসহাক। সেও ছিলো মুরজিয়া মাযহাবের।

সংক্ষেপতঃ উভয় হাত তোলার হাদীসগুলোর রাবী প্রায় সবাই রাফিযী। কেননা রাফিযীদের আমল হলো- এরা সবাই 'উভয় হাত উত্তোলন' করে।

আপত্তি নং- ৭ : বুখারী শরীফ হযরত নাফে (রাদ্বি.) থেকে রেওয়ায়াত করে-

أَنَّ إِبْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذٰلِكَ اِبْنِ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

অর্থাৎ 'যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর নামাযে প্রবেশ করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং স্বীয় উভয় হাত তুলতেন। যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন, তখনও উভয় হাত তুলতেন এবং যখন দু'রাকআত থেকে দাঁড়াতেন তখনও উভয় হাত তুলতেন। আর এ কাজকে তিনি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকে ইঙ্গিত' করতেন।

দেখুন- সাইয়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদ্বি.) রুকূর সময় উভয় হাত তুলতেন। 'উভয় হাত তোলা' সাহাবায়ে কিরামেরও সুন্নাত।

জবাব : এর দুটো জবাব রয়েছে। প্রথমতঃ এ হাদীস আপনাদেরও বিরোধী। এতে দু'রাকআত থেকে উঠার সময়ও 'উভয় হাত উত্তোলন' প্রমাণিত রয়েছে। আপনারা শুধুমাত্র রুকূর ক্ষেত্রে করে থাকেন দু'রাকআত থেকে উঠার সময় করেন না।

দ্বিতীয়ত : আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে হাদীস বর্ণনা করেছি যে, হযরত মুজাহিদ বলেন; আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) এর পিছনে নামায পড়েছি। তিনি কেবলমাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত তুলতেন। এখন হযরত ইবনে উমর (রাদ্বি.) এর দু'টো দু'ধরনের হাদীস পাওয়া গেল- রুকূর সময় হাত উঠানো এবং না উঠানো। এ দুটো হাদীসকে এ ভাবেই একত্রিত করা যাবে যে, রহিতকরণের সংবাদের আগেই তিনি হাত তুলতেন আর রহিতকরণের সংবাদের পরে হাত তুলতেন না। কেননা এ হাদীসের মধ্যে সময়ের উল্লেখ নেই যে, কখন

এবং কোন্ কালে হাত তুলতেন। তাই উভয় হাদীস একই হয়ে গেলো। উদাহরণ স্বরূপ তাহাবী শরীফে রয়েছে-

فَقَدْ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ ابْنُ عُمَرَ فَعَلَ مَا رَاهُ طَاوُسٌ قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ الْحُجَّةُ عِنْدَهُ بِنَسْخِهِ ثُمَّ قَامَتِ الْحُجَّةُ عِنْدَهُ بِنَسْخِهِ وَتَرَكَهُ وَفَعَلَ مَاذَكَرَهُ عَنْهُ مُجَاهِدٌ-

অর্থাৎ 'ব্যাপার হলো যে, সায়্যিদুনা ইবনে উমর (রাদ্বি.) এর 'উভয় হাত উত্তোলন' যা ত্বাউস দেখেছিলেন রহিতকরণ সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে করেছিলেন। এরপর যখন সাইয়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) এর কাছে 'উভয় হাত তোলা'র হুকুম রহিত হওয়া পরিষ্কার হয়ে গেলো তখন ছেড়ে দিলেন এবং তা করলেন, যা মুজাহিদ দেখেছেন।'

যে ভাবেই হোক আমাদের মতে উভয় হাদীসই ঠিক। ভিন্ন সময়ে ভিন্ন আমল। কিন্তু লা-মাযহাবীদেরকে একটি হাদীস ছেড়ে দিতে হবে। কোন একটি হাদীস ছেড়ে দেয়ার চেয়ে দু'হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান করাই উত্তম।

আপত্তি নং- ৮ : ইমাম মুসলিম হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর থেকে বর্ণনা করেছেন, যার কয়েকটি শব্দ এরূপ

فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ

অর্থাৎ, 'যখন হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললেন, তখন স্বীয় উভয় হাত তুললেন। আর যখন সিজদা করলেন, উভয় হাতের মাঝখানে করলেন।' এর দ্বারাও 'উভয় হাত উত্তোলন' বুঝা গেল।

জবাব : হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর (রাদ্বি.) এর এ রিওয়ায়াত সাইয়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাদ্বি.) এর মুকাবিলায় বিবেচ্য নয়। হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর (রাদ্বি.) শুধুমাত্র একবার হাত তোলার বর্ণনা করছেন। কেননা ওয়াইল ইবনে হাজর গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী। যিনি এক আধবার হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছে নামায পড়েছেন। তাঁর কাছে আহকামের রহিত

www.AmarIslam.com

হওয়ার সংবাদ পৌঁছা মুশকিল ছিলো। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) সব সময় হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে থাকতেন। তিনি বড় আলিম ও ফক্বীহ সাহাবী ছিলেন। হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছনে শেষ কাতারে দাঁড়িয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) প্রথম কাতারে বিশেষভাবে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছে দন্ডায়মানকারী সাহাবী। কেননা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছে ফক্বীহ ও আলিম সাহাবীগণ দাঁড়াতেন। স্বয়ং সরকার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশ দিয়েছেন- لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهٰى অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্য থেকে আমার নিকটে থাকবে সেই, যে ইলম ও আক্বলের অধিকারী।' উদাহরণ স্বরূপ 'মুসনাদে ইমামে আযমে' রয়েছে, কোন একজন ব্যক্তি সাইয়িদুনা ইবরাহীম নাখঈর (রহ.) কাছে হযরত ওয়াইল ইবনে হাজরের (রাদ্বি.) ঐ রিওয়ায়াত সম্পর্কে জানতে চাইলেন যেটাতে তিনি 'উভয় হাত তোলার উল্লেখ করেছেন। তখন হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রাদ্বি.) এ মূল্যবান জবাব দিয়েছেন-

فَقَالَ اِعْرَابِيٌّ لَايَعْرِفُ شَرَائِعَ الْاِسْلَامِ وَلَمْ يُصَلِّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِلَّاصَلٰوةً وَاحِدَةً وَقَدْ حَدَّثَنِىْ مَنْ لَاّ اُحْصِىْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ بَدْءِ الصَّلٰوةِ فَقَطْ وَحَكَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللّٰهِ عَالِمٌ بِشَرَائِعِ الْاِسْلَامِ وَحُدُوْدِهِ مُتَفَقِّدٌ اَحْوَالَ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَازِمٌ لَهُ فِىْ اِقَامَتِهِ وَاَسْفَارِهِ وَقَدْ صَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَايُحْصٰى-

অর্থাৎ, 'তিনি বললেন, ওয়াইল ইবনে হাজর (রাদ্বি.) গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। ইসলামের হুকুম সমূহ সম্পর্কে পুরাপুরি অবগত ছিলেন না। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে এক আধবারই নামায পড়েছেন। আর আমার কাছে অনেক লোক হযরত ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা

করেছেন যে, তিনি শুধুমাত্র নামাযের প্রারম্ভেই হাত তুলতেন এবং এটাই হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) ইসলামের আহকাম সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত। তিনি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপস্থিতিতে এবং ভ্রমণকালের সাথী ছিলেন। তিনি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে অনেক নামায আদায় করেছেন।'

সারকথা এই যে, আলিম, ফক্বীহ এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সব সময় অবস্থানকারী সাহাবীর বর্ণনা অগ্রগন্য। তাই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) এর বর্ণনা আমলযোগ্য এবং তার বর্ণনার মুকাবিলায় সাইয়িদুনা ওয়াইল ইবনে হাজর এর বর্ণনা আমলের অযোগ্য। তিনি (ওয়াইল বিন হাজর) উভয় হাত তোলার ব্যাপারে রহিত হওয়ার পূর্বের কাজ অবলোকন করেছেন এবং তাই বর্ণনা করেছেন।

আপত্তি নং- ৯ : যদি তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত 'উভয় হাত উত্তোলন' না করাই উচিত হয়, তাহলে আপনারা ঈদে ও বিতর নমাযে রুকূর সময়ে উভয় হাত কেন তুলে থাকেন? এ দু'নামায কি নামায নয়?

জবাব : এ প্রশ্নের দ্বারা আপনাদের শক্তিহীনতা প্রকাশ পাচ্ছে। হাদীসসমূহের বেলায় তো আপনারা হেরে গেলেন। এমন বাহানা বানানোর কাজে ব্যস্ত। জনাব, এখানে কথা হচ্ছে উভয় হাত তোলা সম্পর্কে যাকে আপনারা নামাযের সুন্নাত কিংবা রুকূর সুন্নাত ভেবে বসে আছেন। দু'ঈদ ও বিতরের 'উভয় হাত উত্তোলন' রুকূর সুন্নাত নয়, বরং ঈদের নামায ও দুআয়ে কুনুতের সুন্নাত। এ জন্যেই ঈদে এক রাকআতে তিন বার 'উভয় হাত উত্তোলন' হয় এবং বিতর নামাযে রুকূর আগে নয়; বরং দুআয়ে কুনুতের পূর্বে হয়। ঈদের নামাযে জামাআতের খুতবা ও অন্যান্য বিষয় আর বিতর নামাযে দুআয়ে কুনুত, তিন রাকআত ইত্যাদি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যাবলী রয়েছে; ছয় তাকবীর ও ছয়বার উভয় হাত উত্তোলনও ঈদের নামাযের বৈশিষ্ট্য। যদি পাঞ্জেগানা নামাযকে ঈদের নামায ও বিতর নামাযের উপর ক্বিয়াস করেন, তাহলে হে লা মাযহাবীরা! প্রত্যেক রুকূতে তিনবার 'উভয় হাত উত্তোলন' করুন। এবং প্রত্যেক নামাযেই দুআয়ে কুনুত পড়তে থাকুন।

www.AmarIslam.com

আপত্তি নং- ১০ : হযরত আলী (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত- যখন 'সুরায়ে কাউছার' শরীফ নাযিল হয়, তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিবরাঈলকে (আ:) প্রশ্ন করলেন, হে জিবরাঈল! 'নাহ্‌র' কি জিনিস? নামাযের সাথে আমাকে যার হুকুম দেয়া হয়েছে? তখন হযরত জিবরাঈল (আ:) বললেন এ নাহ্‌র এর অর্থ 'কুরবানী' নয়। বরং

إِذَا تَحَرَّمْتَ لِلصَّلَاةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إِذَا كَبَّرْتَ وَإِذَا رَكَعْتَ وَإِذَا رَفَعْتَ رَاسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَإِنَّهَا صَلَاتُنَا وَصَلٰوةُ الْمَلَائِكَةِ الَّذِيْنَ فِى السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ-

অর্থাৎ, 'যখন আপনি নামাযের তাকবীরে তাহরীমা বলবেন তখন আপনার উভয় হাত তুলবেন; আর যখন রুকু করবেন এবং রুকু থেকে মাথা মোবারক উঠাবেন। কেননা এটাই আমাদের নামায এবং ঐ সব ফেরেশতাদের নামায, যারা সপ্তাকাশে রয়েছেন।'

এর দ্বারা বুঝা গেল, যে ভাবে কুরআনে করীম নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি ভাবেই উভয় হাত তোলারও হুকুম দিয়েছেন। তাই 'উভয় হাত তোলা' এমনই প্রয়োজনীয়, যেমনটি নামায প্রয়োজনীয়। রব তায়ালা বলেন- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এটাও বুঝা গেল যে, ফেরেশতারাও উভয় হাত তুলেন। যারা 'উভয় হাত উত্তোলন' করে না, তারা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবায়ে কেরামের এবং ফেরেশতাদেরও বিরোধী। জমীনও আরশে আযীমে 'উভয় হাত উত্তোলন' হয়। আপনারা এক ইমাম, ইমাম আবু হানীফার আনুগত্যে ঐ সব সম্মানিতদের বিরোধীতা করো না।

জরুরী নোট : ডেরা গাযীখার লা মাযহাবীদের পক্ষ থেকে 'উভয় হাত তোলা' সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা বিনামূল্যে বন্টন করে। আমার কাছেও একটি পৌছানো হয়েছে। এতে এ আপত্তিটা উল্লেখ আছে।

জবাব : লা-মাযহাবীরা! তোমরা কিংবা তোমাদের কোন সমমনা ব্যক্তি মিথ্যা হাদীস বানিয়ে নিলে অথচ তাও ঠিকমত হয় নি। মিথ্যা বলার জন্যও পদ্ধতির দরকার রয়েছে। তোমাদের এ বানোনো হাদীসটিই তোমাদের মাযহাবের বেড়া ডুবিয়ে দিলো। যেহেতু তোমরা এ হাদীসের সনদ বর্ণনা করো নি, তাই

সনদ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে না এবং এটাও বলা হচ্ছে না যে, এ হাদীসের গঠনকারী কে? যদিও হাদীসের মতন প্রসঙ্গে কিছু কথা রয়েছে।

প্রথমত : তোমরা 'নাহ্‌র' এর অর্থ করেছো রুকুর আগে ও পরে হাত উঠানো। এটা অভিধানের কোন্ কিতাবের দ্বারা প্রমানিত? নাহর শব্দের অর্থ হাত তোলা রুকুর পূর্বে ও পরে। এতগুলো অর্থের পুটলী একটি শব্দের ভিতর কে ভরে দিলো? হযরত জিবরাঈল (আ:) এর কি আরবী অভিধানের ব্যাপারে অবগতি ছিলো না? যিনি 'নাহর' শব্দের অর্থ এটা বললেন। অতঃপর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এবং পবিত্র আহলে বাইতগণও প্রশ্ন করলেন না যে, হে জিবরাঈল! 'নাহর' এর এ নতুন অর্থ কোত্থেকে নিলেন? আর কেন নিলেন? অভিধানের প্রমাণ পেশ করো। যদি কুরআন ও হাদীসের অর্থ এমন হওয়া আরম্ভ হয়ে যায় তাহলে দ্বীনের অর্থ কি হয় আল্লাহ জানেন। 'সালাত' অর্থ রুটি খাওয়া, 'যাকাত' অর্থ পানি পান করা, 'হজ্ব' এর অর্থ কাপড় পরা, 'সাওম' অর্থ খাটের উপর শোয়া, 'জিহাদ' অর্থ দোকানদারী করা' বানিয়ে নাও। ইসলামের পাঁচটি রুকন শেষ। একটু লজ্জা করো, নিজের অসভ্য মাযহাবকে বানানোর জন্য কেন এমন হাদীসগুলো গঠন করছো?

দ্বিতীয়ত : এখানে نحر শব্দটা আরবী ব্যাকরণ অনুসারে صلوة শব্দের মা'তুফ। আর 'মা'তূফ' সর্বদা মা'তূফ আলাইহি এর বিপরীত হয়ে থাকে। তাহলে উচিত যে নাহর এর অর্থ 'উভয় হাত তোলা' না হওয়া। কেননা তা নামাযের অংশ। নামাযের ভিন্ন কিছু নয়।

তৃতীয়ত : যখন وَانْحَرْ এর অর্থ হলো 'উভয় হাত তোলা' এবং এ নির্দেশ কুরআনে করীমে নামাযের হুকুমের সাথে উল্লেখিত হলো, তাহলে উচিত হবে যেমনিভাবে নামায অকাট্য ফরয আর এর অস্বীকারকারী দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়, তেমনিভাবেই 'উভয় হাত তোলা'ও অকাট্য ফরয হবে। আর এর সকল অমান্যকারী কাফের হবে। তাহলে তোমরা এবং তোমাদের পুরো দল এটাকে ফরয কেন বলছো না? শুধুমাত্র সুন্নাত কেন বলছো? আর যখন লা-মাযহাবীরা হানাফীদের এলাকায় যায়, তখন 'উভয় হাত তোলা' ছেড়ে দেয়, এবং বলে যে 'উভয় হাত তোলা'ও সুন্নাত; না তোলাও সুন্নাত। যেটার উপর ইচ্ছা আমল করে নাও। এখন বলো- এর ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে সমস্ত লা-মাযহাবীরা

কি সাব্যস্ত হলো?

চতুর্থত : কোন মুহাদ্দিস 'উভয় হাত তোলা' কে অকাট্য ফরয বলেন নি। ইমাম তিরমিযী 'উভয় হাত না তোলা' সম্পর্কিত হাদীসকে 'হাসান' উল্লেখ করে বলেন, এর উপর অনেক আলিম সাহাবী ও তাবিয়ীর আমল রয়েছে। বলো ইমাম তিরমিযী এবং সমস্ত মুহাদ্দিস উভয় হাত তোলা' ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে তোমাদের মতে ইসলামের গন্ডিতে আছেন কি না? আর এখন তাঁদের কিতাবাদি থেকে হাদীস গ্রহন করা শরীয়ত মতে জায়িয কি না।

পঞ্চমত : আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে দলীলাদি সহকারে প্রমাণ করেছি যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদ্বি.) ওমর ফারুক, আলী মুরতাদ্বা, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন) এমন পরম সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম উভয় হাত তুলতেন না। বরং সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) এর থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। বড় আর্শ্চযের বিষয় এতো বড় কুরআনী ফরয যা নামাযের মতোই ফরয, তা ঐ সাহাবায়ে কেরামের কাছে গোপন থাকলো এবং আজ চৌদ্দশত বৎসর পরে ডেরা গাযীখার এক মৌলভী আবিস্কার করলো ?

ষষ্ঠত : তোমরা তো এ বানানো হাদীসকে হযরত আমীরুল মু'মিনীন মাওলায়ে কাইনাত আলী মুরতাদ্বা (রাদ্বি.) এর দিকে সম্পর্কিত করেছো। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, হযরত আলী (রাদ্বি.)স্বয়ং এরেওয়ায়াত উল্লেখ করছেন আবার নিজেই এর বিপরীত করছেন। অর্থাৎ 'উভয় হাত উত্তোলন' করছেন না। তিনি আমল ছেড়ে দিলেন কেন?

সপ্তমত: স্বয়ং হুযুর আনওয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত জিবরাঈল (আ.) থেকে وَانْحَرْ এর অর্থ জিজ্ঞেস করলেন, আবার নিজেই এর উপর আমল করলেন না, যা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে আলোকপাত করেছি। আর উভয় হাত তোলার এমন তাবলীগ তথা প্রচার হওয়া উচিত ছিল, যেমনিভাবে নামাযের ফরয হওয়ার প্রচার করা হয়েছে এবং 'উভয় হাত তোলা' পরিত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে এমনভাবে জিহাদ করা উচিত ছিল, যেমনিভাবে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাদ্বি.) যাকাত অস্বীকার কারীদের বিরুদ্ধে করেছেন।

মোল্লাজী! হাদীস বানানোর পূর্বে উচু নীচু চিন্তা করা উচিত ছিল।

মুসলমানগণ! চিন্তা করুন। এটাই ওদের হাদীসের আনুগত্যতা। আমাদের কাছ থেকে প্রত্যেক মাসআলার ক্ষেত্রে বুখারী ও মুসলিম শরিফের হাদীস তলব করে অথচ নিজেদের প্রয়োজনে এমন মাত্রাছাড়া হাদীসগুলো বানিয়ে নিতে খোদাকেও ভয় করে না। মনে হয় আহলে হাদীস' মানে হাদীস রচনাকারী, হাদীসের অপব্যাখ্যাকারী।

আপত্তি নং- ১১ : হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ:) বলেন- اِذَا ثَبَتَ حَدِيْثٌ فَهُوَ مَذْهَبِىْ অর্থাৎ, 'যখন কোন হাদীস প্রমাণিত হয়ে যায় তখন ওটাই আমার মাযহাব।' সুতরাং 'রফয়ে য়াদাইন' এবং ইমামের পিছনে ক্বিরাআত প্রসঙ্গে আমাদের মত প্রমাণিত হলো। কারণ ইমাম আবু হানীফার কথা হাদীসের পরিপন্থী। তাই আমরা তাঁর কথাকে দেয়ালের দিকে ছুড়ে দিয়েছি এবং হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উপর আমল করেছি। স্বয়ং তাহক্বীক তথা যাচাই বাছাই করে হাদীসের উপর আমল করাই হানাফীয়্যাত (তথা ইমাম আবূ হানীফার (রহ:) অনুসরণ)।

জবাব : জি হ্যাঁ! বিশেষ করে যখন হাদীসের মুহাক্কিক তথা যাচাই-বাছাইকারী আপনাদের মত মুহাক্কিক (হুক্কা সেবনকারী) হয়, যাদের প্রশ্রাব করার পর প্রবিত্র হওয়ার জ্ঞান নেই। আর যারা 'বুখারী'কে বুক্বারী 'মুসলিম'কে মুসাল্লাম, হাদীস-কে হাদ্দীস বলে, জনাব ইমামে আযম আপনাদের মত বুযুর্গদেরকে এ অনুমতি দেন নি।

ইমামে আযমের কথাটির অনুবাদ হবে এ ভাবে- اِذَا ثَبَتَ حَدِيْثٌ فَهُوَ مَذْهَبِىْ অর্থাৎ, 'যখন হাদীস প্রমাণিত হয়ে গেলো তখন সেটা আমার মাযহাব হয়ে গেলো।

অর্থাৎ, হে মুসলমানগণ আমরা প্রত্যেক মাসআলার ক্ষেত্রে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রত্যেক দিক নিয়ে সব রকমের চিন্তা, অনুসন্ধান, আলোচনা ও পরীক্ষা করেছি। সনদ ও মতনের ক্ষেত্রে ভাল ভাবেই যাচাই বাছাই সমালোচনা ও দোষক্রটি বিশ্লেষণ করেছি। যখন সব কটি দিক প্রমাণিত হলো, তখনই তাকে নিজের মাযহাব বানানো হয়েছে। এ মাযহাব খুবই মজবুত এবং তাহক্বীক্বী তথা সত্যাসত্য যাচাইকৃত। তাই তোমরা নিজেই

হাদীসের সমুদ্রে লাফ দিওনা, ঈমান খুইয়ে বসবে। আমাদের বের করা মুক্তা ব্যবহার করো। সমুদ্র থেকে মুক্তা বের করা সবার কাজ নয়, স্রেফ ডুবুরীরই কাজ। যদি ঔষধের দোকান থেকে ঔষধ ইচ্ছামত সেবন কর, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েই সেবন করো। কোরআন ও হাদীস হচ্ছে রূহানী ঔষধের কেন্দ্র। ইমামে আযম হলেন তাবীবে আযম তথা মহান চিকিৎসক। কোরআন ও হাদীসের ঔষধ সেবন করতে চাইলে ইমামে বরহক্ব মুজতাহিদ এর পরামর্শ নাও। দেখো! এরপর উপকার হয় কি না।

হযরত ইমামে আযমের কথার উদ্দেশ্য এটা নয় যে আমি শরীয়তের সমস্ত বিধান ও মাসআলা কোন চিন্তা, বিবেচনা ছাড়া আন্দাজ করে বর্ণনা করে দিয়েছি। ওহে অবুঝ বোকার দল! তোমরা হাদীসের ভুল ভ্রান্তিপূর্ণ অনুবাদ করো এবং মাযহাবের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করো।

যেখানে একজন যোগ্য ডাক্তার পরীক্ষা ছাড়া এবং চিন্তা বিবেচনা ছাড়া একটি রোগের প্রেসক্রিপশন লিখে না; সেখানে ইমাম আবু হানীফার মত হাকীমে মিল্লাত ও উম্মতের প্রদীপ চোখ বন্ধ করে কোরআন ও হাদীস না দেখে কি্বয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য রূহানী প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন কিভাবে? আল্লাহ তাআলা বুঝ দান করুন।

www.AmarIslam.com

সপ্তম অধ্যায়

বিত্র ওয়াজিব এবং তিন রাকআত

বিত্র এর আভিধানিক অর্থ হলো- বিজোড় সংখ্যা। অর্থাৎ যা সমানভাবে দু'ভাগ হয় না। যেমন তিন, পাঁচ, সাত ইত্যাদি। এর বিপরীত হলো 'শাফউন' তথা জোড় সংখ্যা। যা সমানভাবে দু'ভাগ করা যায়। শরীয়তের পরিভাষায় বিত্র ঐ বিজোড় নামাযকে বলা হয়, যা 'ইশা' নামাযের পরে তাহাজ্জুতের সময় কিংবা 'ইশা'র পর পর পড়া হয়।

আমাদের মাযহাব হলো- বিত্র ওয়াজিব; এটার পরিত্যাগকারী অত্যন্ত গুনাহগার। এর কাযা আবশ্যক এবং বিত্রের নামায তিন রাকআত। কিন্তু লা মাযহাবী ওয়াহাবীরা বলে যে, 'বিত্র' ওয়াজিব নয়, 'সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহ্' তথা নফল এবং বিত্র এক রাকআত।

হানাফী মাযহাব সঠিক এবং লা-মাযহাবীদের কথা সম্পূর্ণ বাতিল তথা পরিত্যাজ্য। এখানে আমাদের মূল আলোচনা হলো বিত্র নামায তিন রাকআত হওয়া প্রসঙ্গে। এর পূর্বে প্রাসঙ্গিক ভাবে বিত্র এর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কিছু হাদীস উপস্থাপন করছি।

বিত্র ওয়াজিব

হাদীস নং-১-৩ : আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ হযরত আবু আইয়ুব (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থাৎ, 'রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের উপর বিত্র আবশ্যক।'

হাদীস নং- ৪ : বায্যার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوِتْرُ وَاجِبٌ

www.AmarIslam.com

عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থাৎ, 'রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের উপর বিত্‌র ওয়াজিব।

হাদীস নং- ৫-৬ : আবু দাউদ, হাকিম হযরত বারীদাহ (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন-

قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থাৎ, 'তিনি বলেন, আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, বিত্‌র আবশ্যক; যে বিত্‌র পড়ে না সে আমাদের অর্ন্তভূক্ত নয়।'

হাদীস নং- ৭ : আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ, আবদুর রহমান ইবনে রাফি তানূখী থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাদ্বি.) যখন শাম দেশে উপস্থিত হলেন তিনি দেখলেন, শামের অধিবাসীরা বিত্‌রে অলসতা করছে। তখন তিনি হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করলেন যে, শামের লোকেরা বিত্‌র পড়ে না।

فَقَالَ مُعَاوِيَةُ اَوَاجِبٌ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ زَادَنِىْ رَبِّىْ عَزَّوَجَلَّ صَلٰوةً هِىَ الْوِتْرُ فِيْمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ

: আমীরে মুয়াবিয়া জিজ্ঞাসা করলেন, মুসলমানদের উপর কি বিত্‌র ওয়াজিব? মুয়ায ইবনে জাবাল (রাদ্বি.) বললেন, হ্যাঁ! আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, আমাকে আমার রব একটি নামায বেশী দিয়েছেন, সেটা হলো বিত্‌র- এশা এবং ফজর উদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে।'

হাদীস নং- ৮ : ইমাম তিরমীযি হযরত যায়দ ইবনে আসলাম থেকে 'মুরসাল' হিসাবে রেওয়ায়াত করেছেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهٖ فَلْيُصَلِّ اِذَا اَصْبَحَ

অর্থাৎ, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে বিত্‌র ত্যাগ করে শুয়ে যায়, সে ভোরে তা ক্বাযা পড়ে নেবে।'

হাদীস নং- ৯ : আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহমদ, ইবনে হাব্বান, হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকে হযরত আবু আইয়ুব আনছারী (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন।

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوِتْرُ حَقٌّ وَّاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থাৎ, 'হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, বিত্‌র আবশ্যক প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব।'

এ হাদীসগুলো দ্বারা দু'টো বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমত: বিত্‌র নফল নয় বরং ওয়াজিব। দ্বিতীয়ত: বিত্‌রের ক্বাযা ওয়াজিব। প্রকাশ থাকে যে, ক্বাযা শুধুমাত্র ফরয এবং ওয়াজিবেরই হয়, নফলের ক্বাযা নেই। বিত্‌রের ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে অনেক হাদীস থেকে আমরা শুধুমাত্র চৌদ্দটি বর্ণনা করেছি।

বিত্‌র তিন রাকআত

হাদীস নং- ১-৪ : নাসাঈ শরীফ, তাহাবী, তাবরাণী 'সাগীরে', হাকিম মুসতাদরাকে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ لَايُسَلِّمُ اِلَّا فِيْ اٰخِرِهِنَّ-

অর্থাৎ, 'তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিন রাকআত বিত্‌র পড়তেন, সালাম ফিরাতেন সব শেষেই।'

হাদীস নং- ৫-৬ : দারে কুতনী ও বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلَاثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ

অর্থাৎ, 'নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন-

রাতের বিত্‌র তিন রাকআত, যেমন দিনের বিত্‌র মাগরিবের নামায।'

হাদীস নং- ৭ : তাহাবী শরীফ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثِ رَكْعَاتٍ

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিত্‌র পড়তেন তিন রাকআত।'

হাদীস নং- ৮ : নাসাঈ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত- এক রাতে আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি রাতে জাগ্রত হলেন এবং অযু করলেন। মিসওয়াক করলেন আর এ আয়াতখানা তিলাওয়াত করছিলেন- إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ... الخ এরপর দু'রাকআত নফল পড়লেন।

ثُمَّ عَادَ فَنَامَ حَتّٰى سَمِعْتُ نَفْخَهُ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَاكَ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَاكَ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَاَوْتَرَ بِثَلَاثٍ

অর্থাৎ, 'এরপর তিনি আবার ঘুমিয়ে গেলেন। এমন কি আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর 'নাকডাকা' শুনতে পেয়েছি। অতঃপর তিনি উঠলেন আর অযু ও মিসওয়াক করলেন এবং দু'রাকআত নামায পড়লেন। এরপর আবার উঠলেন এবং অযু ও মিসওয়াক করলেন এবং দু'রাকআত নামায পড়লেন ও তিন রাকআত বিতর পড়লেন।'

হাদীস নং- ৯-১৩ : তিরমিযী, নাসাঈ, দারিমী, ইবনে মাজাহ, ইবনে আবি শায়বাহ প্রমুখ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ كَانَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْوِتْرِ بِسَبِّحِ الاسْمِ رَبِّكَ الاَعْلٰى وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فِىْ رَكْعَةٍ رَكْعَةٍ

অর্থাৎ, 'তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিত্‌র

নামাযে 'সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা' 'কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন' এবং 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' এক এক রাকআতে এক এক সূরা পড়তেন।'

হাদীস নং- ১৩-১৮ : তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ হযরত আবদুল আযীয ইবনে জুরাইহ, আবদুর রহমান ইবনে আবযা থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ بِأَىِّ شَيْءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْاُوْلٰى بِسَبِّحِ اِسْمِ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ-

অর্থাৎ, 'তিনি বলেন, আমরা হযরত আয়িশার (রাদ্বি.) কাছে প্রশ্ন করলাম, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিত্‌রে কি পড়তেন? তখন তিনি বললেন, প্রথম রাকআতে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা', দ্বিতীয় রাকআতে 'কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন' এবং তৃতীয় রাকআতে 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' সূরা ফালাক ও নাস পড়তেন।'

হাদীস নং- ১৯ : ইমাম নাসাঈ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اِسْمِ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَلَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বিত্‌রে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা, ' দ্বিতীয় রাকআতে 'কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন' এবং তৃতীয় রাকআতে 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পড়তেন। আর কেবল তিন রাকআতের শেষেই সালাম ফিরাতেন।'

হাদীস নং- ২০ : ইবনে আবি শায়বাহ হযরত ইমাম হাসান (রাদ্বি.) থেকে

বর্ণনা করেছেন-

قَالَ اَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَي اَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ لَايُسَلِّمُ اِلَّا فِيْ اٰخِرِهِنَّ

অর্থাৎ, 'এ কথার উপর সকল মুসলমান একমত যে, বিত্‌র তিন রাকআত এবং সালাম ফিরাবে না শেষ রাকআত ছাড়া।'

হাদীস নং- ২১ : তাহাবী শরীফে হযরত আবু খালিদ থেকে বর্ণিত-

قَالَ سَأَلْتُ اَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ عَلِمْنَا اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْوِتْرَ مِثْلُ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ هٰذَا وِتْرُ اللَّيْلِ وَهٰذَا وِتْرُ النَّهَارِ-

অর্থাৎ, 'তিনি বলেন, আমি আবুল আলিয়ার কাছে বিত্‌র সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি, তিনি বলেন, আমরা সকল সাহাবায়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো এটাই জানি যে, বিত্‌র মাগরিব নামাযের মতো। এটা রাতের বিত্‌র আর মাগরিব দিনের বিত্‌র।'

এ একুশটি হাদীস দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপস্থাপন করা হলো, না হয় বিত্‌র তিন রাকআত হওয়ার ব্যাপারে অনেক বেশী হাদীস বিদ্যমান। বিস্তারিত জানার ইচ্ছা হলে তাহাবী শরীফ ও সহীহবুখারী শরীফ দেখুন। এ সব হাদীসে এটাই রয়েছে যে, হুযুর আনওয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আমল শরীফ ছিলো তিন রাকআত বিত্‌রের উপর। সকল সাহাবীর আমলও তিন রাকআত এবং এ তিন রকআতের ব্যাপারে সকল মুসলমান একমত রয়েছেন। হানাফীরা বলছেন যে, তিন রাকআত এক সালামেই পড়বে। যেহেতু নামায নফসে আম্মারার উপর অত্যন্ত ভারী,তাই প্রবৃত্তি পুজারীরা শুধু মাত্র এক রাকআত বিত্‌র পড়েই শোয়ার অভ্যাস করেছে। পর্যবেক্ষকগণ উল্লেখিত হাদীসগুলোতে অবলোকন করেছেন যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিতরের প্রথম রাকআতে অমুক সূরা, দ্বিতীয় রাকআতে অমুক এবং তৃতীয় রাকআতে অমুক সূরা পাঠ করতেন। লা-মাযহাবীরা বলুন যে, যদি বিত্‌র এক রাকআত হয় তাহলে এ সুরাগুলো কিভাবে পড়া হলো?

বিবেকেরও চাহিদা বিত্‌র এক রাকআত না হওয়া। কারণ বিত্‌র নামায না

ফরয না নফল। বরং ওয়াজিব। অর্থাৎ তা পড়া আবশ্যক। পরিত্যাগকারী ফাসিক। তবে এর ওয়াজিব হওয়ার অস্বীকার করা কুফ্‌র নয়। ওয়াজিবে এটাই বিধান। আর প্রত্যেক গায়রে ফরয (ফরয নয় এমন) ইবাদতের উদাহরণ ফরয ইবাদতে অবশ্যই থাকতে হবে। এটা হবে না যে, কোন গায়রে ফরয ইবাদত সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হবে। অর্থাৎ ফরয ইবাদতের মত হবে না। এটা শরীয়তের সাধারণ নিয়ম, যা যাকাত, হজ্ব প্রভৃতিতে প্রচলিত। যদি বিত্‌র এক রাকআত হয় তাহলে উচিত হবে কোন ফরয নামাযও এক রাকআত হওয়া। অথচ কোন ফরয নামায এক রাকআত নয়। শুধু ফরয কেন, কোন নফল, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্‌ ও সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহও এক রাকআত নয়। ফরয নামায হয়তো দু'রাকআত যেমন- ফজর অথবা চার রাকআত যেমন- যোহর আছর-ইশা কিংবা তিন রাকআত যেমন- মাগরিব। বিত্‌র না চার রাকআত হতে পারে, না দু'রাকআত। কারণ এ দু'সংখ্য জোড়, বিত্‌র তথা বিজোড় নয়। সুতরাং অবশ্যই তিন রাকআত হবে। এক রাকআত নামায ইসলামী কানুনের পরিপন্থী, যার উদাহরণ অন্য কোন নামাযে নেই। এক রাকআত নামায অপূর্ণ, ত্রুটি যুক্ত এবং অপ্রচলিত। মোদ্দাকথাঃ এই এক রাকআত বিত্‌র আকলেরও বিরোধী। আবার 'নক্বল' তথা কুরআন হাদীসের ও বিরোধী। উম্মতের ঐকমত্য, সাহাবায়ে কেরামের আমল, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশ সব কিছুরই খেলাফ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ প্রসঙ্গে আপত্তি ও জবাব সমূহ

বিত্‌রের মাসআলার উপর এ পর্যন্ত গায়রে মুকাল্লিদ ওহাবীদের পক্ষ থেকে যে সব দলীলাদি আমরা পেয়েছি আমরা ক্রমানুসারে জবাব সহ আলোকপাত করছি। রব তাআলা কবুল করুন।

আপত্তি নং- ১ : ইবনে মাজাহ হযরত আয়িশাহ সিদ্দীকাহ (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ- (الخ)

অর্থাৎ, 'তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক

রাকআত বিত্‌র পড়তেন। এরপর (বিতরের পর) দু'রাকআত নফল পড়তেন।

বুঝা গেলো, বিতর এক রাকআত হওয়া উচিত। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ভাবেই পড়েছেন।

জবাব : আপনি হাদীসের ভুল অনুবাদ করেছেন। যার কারণে এ হাদীসটি ঐ সব হাদীসের বিপরীত হলো,যে গুলোতে তিন রাকআতের উল্লেখ রয়েছে এবং হাদীসগুলো একটি অপরটির সাথে দ্বান্দ্বিক হয়ে গেলো। হাদীসের অনুবাদ এমনভাবে করা উচিত, যাতে হাদীসগুলো সমার্থক হয়ে যায়।

এ হাদীস শরীফে ب (বা) 'ইস্তিআনাহ' তথা সাহায্য নেয়ার অর্থ বুঝিয়েছে। যেমন كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ (আমি কলম দিয়ে লিখেছি)। কেননা أَوْتَرَ শব্দটি بَاب أفعال হতে متعدى بنفسه (তথা স্বয়ং সকর্মক ক্রিয়া) সুতরাং হাদীসের অর্থ হবে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাহাজ্জুদ নামাযকে বিজোড় করলেন এক রাকআতের মাধ্যমে। এ ভাবে যে, দু'রাকআতের সাথে এক রাকআত মিলিয়ে দিলেন যাতে তাহাজ্জুদ নামাযের সংখ্যা জোড় থেকে বিজোড় হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ ঃ আট রাকআত তাহাজ্জুদ আদায় করলেন। এ সংখ্যাটি জোড় ছিলো। এরপর তিন রাকআত 'বিতর' পড়লেন। এর দ্বারা বিজোড় করলেন। (বিতরে) তৃতীয় রাকআতের কারণে মোট রাকআত এগারো হলো যা বিজোড়। এ সব নামাযকে বিজোড় করলো বিত্‌রের ঐ এক রাকআত যা দু রাকআতের সাথে মিলানো হয়েছে। এ পদ্ধতিতে এ হাদীসটি বিগত হাদীসগুলোর সমার্থক হয়ে গেলো। আমি লা-মাযহাবীদের কাছে প্রশ্ন করছি যদি তাদের মত অনুবাদ করা হয়, তাহলে ঐ সব হাদীসের কি জবাব দেবে,যেগুলোতে সুস্পষ্ট ভাবে তিন সংখ্যা উল্লেখিত রয়েছে? অথবা ঐ সব হাদীসের কি জবাব দিবে, যে গুলোতে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথম রাকআতে অমুক সূরা, দ্বিতীয় রাকআতে অমুক এবং তৃতীয় রাকআতে অমুক সূরা পড়তেন, যা প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে।

আপত্তি নং- ২ : মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত–

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ

مَثْنٰى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلّٰى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلّٰى

অর্থাৎ, 'তিনি বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন- তাহাজ্জুদের নামায দুই দুই রাকআত করে। যদি তোমাদের কেউ ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করে,তাহলে এক রাকআত পড়ে নিবে। এ রাকআতটি বিগত নামাযকে বিজোড় বানিয়ে দেবে।'

এর দ্বারা চারটি মাসআলা জানা গেলো। এক, তাহাজ্জুদে দুই দুই রাকআত করে নফল আদায় করতে হবে। দুই, তাহাজ্জুদের নামায রাতে ভোরের আগেই হওয়া। তিন, বিতর তাহাজ্জুদ নামাযের পরে উত্তম। চার, বিতর এক রাকআত। হানাফীরা প্রথম তিন মাসআলা মানে। চতুর্থ মাসআলাকে অমান্য করে। যদি এ হাদীসটি 'সহিহ' হয় তাহলে চার মাসআলাই মেনে নাও। আর যদি সহীহ না হয়, তহলে কোন মাসাআলাই না মানা চায়।

জবাব : গায়রে মুক্বাল্লিদ ওহাবী তো এ হাদীসের অনুবাদ এভাবে করে যে, যখন ভোর হওয়ার আশংকা হয়, তখন পৃথক ভাবে শুধু এক রাকআত পড়ে নেবে। এ অনুবাদের দ্বারা এ হাদীসটি ঐ সমস্ত হাদীসের বিরোধী হয়ে গেলো যে গুলো আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে উপস্থাপন করেছি। আর উভয় প্রকারের হাদীস গুলোর উপর আমল করা অসম্ভব। হানাফীরা এর অর্থ এ ভাবে করে 'যখন ভোর হওয়ার আশংকা হয় তখন দুয়ের সাথে এক রাকআত মিলিয়ে পড়ে নাও। উল্লেখ্য যে 'রাকআতান ওয়াহিদাতান' এরপর 'মাআর রাকআতাইন' উহ্য রয়েছে। কেননা আগেই مثنى مثنى তথা 'দুই দুই করে' উল্লেখ রয়েছে। এ অর্থ করলে হাদীসগুলোর মাঝে কোন দ্বন্ধ থাকে না এবং উভয় হাদীসের উপর আমল হয়ে যায়। যেমন রব তাআলা বলছেন-

وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا

অর্থাৎ, 'আসহাবে কাহ্‌ফ' নিজেদের গর্তে তিনশো বছর অবস্থান করেছে,- নয় বছর বাড়িয়ে নিলেন।'

এ আয়াতে এ নয় বছর তিনশো বছরের থেকে পৃথক নয়। বরং এর অর্ন্তভূক্তভাবার্থ হলো, তিনশো নয় বছর অবস্থান করেছেন। যেহেতু তিনশো বছর ছিলেন সৌরবর্ষ হিসাবে আর তিনশো নয় বছর ছিলেন চন্দ্রবর্ষ

হিসাবে। তাই রব তাআলা এ ভাবে বললেন। একই ভাবে বিতরের এ এক রাকআত ঐ দুই দুই রাকআত থেকে পৃথক ভাবে নয়। বরং এর সম্পর্ক শেষ দু'রাকআতের সাথেই। যেহেতু ঐ দুই দুই রাকআত ছিলো তাহাজ্জুদের এবং নফলের এবং এ তিন রাকআত ছিল বিতরের এবং ওয়াজিব। তাই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের চেয়ে অধিকতর জ্ঞানী সৃষ্টি জগতের মধ্যে অধিকতর শুদ্ধভাষী হুযুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ভাবেই ইরশাদ করেছেন। বলুন, হাদীস গুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা ভালো না পরস্পর সামঞ্জস্যতা বিধান করে সব গুলো আমল করা শ্রেয়? আহা! যদি আপনারা কোন মুকাল্লিদ্ব (মাযহাব মান্যকারী) থেকে হাদীস পড়তে! (কতই না বালো হতো।)

আপত্তি নং- ৩ : ইমাম মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদ্বি.)থেকে বর্ণনা করেছেন- اَلْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ 'বিতর' হলো শেষ রাতে এক রাকআত।'

এর দ্বারা বুঝা গেল বিতর' শুধুমাত্র এক রাকআত।

জবাব : এর জবাবও অন্যান্য আপত্তি সমূহের জবাবের অনুরূপ। লা-মাযহাবীরা এর অর্থ করে বিতর এক রাকআত, অন্য সব রাকআত থেকে পৃথক। এ অর্থে এ হাদীসটি অনেক হাদীসের বিরোধী হয়ে যায় এবং হাদীসগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান অসম্ভব। হানাফীরা এর অনুবাদ করে যে, বিতর এক রাকআত- অন্য দু'রাকআতের সাথে যার ব্যাখ্যা ঐ হাদীসসমূহে বিদ্যমান, যা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে আলোকপাত করেছি। অথবা এ হাদীসে وِتْرُ শব্দটি اسم فاعل অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাযকে বিজোড়কারী এক রাকআত- যা দু'রাকআতের সাথে মিলে সব নামাযকে বিজোড় করে দেয়। অথাৎ নামাযী আট রাকআত তাহাজ্জুদ পড়লো। এরপর যখন বিতরের নিয়্যত বাঁধলো আর দু'রাকআত পড়লো ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামায জোড় থেকে গেলো। আর যখনই এ দু'রাকআতের সাথে আরো এক রাকআত মিলিয়ে দিলো তখন বিজোড় অর্থাৎ এগারো রাকআত হয়ে গেলো। এ অর্থে এ হাদীসটি অন্যান্য সমস্ত হাদীসের সমার্থক হয়ে গেলো। হাদীস সমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব দূর করা আবশ্যক।

আপত্তি নং- ৪ : আবু দাউদ ও নাসাঈ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে রেওয়ায়াত করেছেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَاَوْتِرُوْا يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ

অর্থাৎ, 'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন- আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন বিজোড়; বিজোড়কে পছন্দ করেন। তাই তোমরা বিতর পড়ো,হে কুরআন মান্যকারীরা।'

হানাফীরা বলো- আল্লাহ এক, না তিন? যদি তিনি এক হন, তাহলে বিতরও এক রাকআতই হতে হবে, তিন নয়। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রব তাআলার বিতর তথা এক হওয়ার দ্বারা নামাযের উদাহরণ দিয়েছেন।

জবাব : এর দুটো জবাব রয়েছে। এক, পাল্টা জবাব, তথা বাধ্যতামূলক, দ্বিতীয় তাহক্বীক্বী তথা গবেষণামূলক।

ইলযামী তথা পাল্টা জবাব হলো- লা-মাযহাবীর জন্য উচিত হবে মাগরিবের ফরযও এক রাকআত পড়া, তিন নয়। কেননা মাগরিবের ফরয হলো দিনের বিতর। আর এ বিতর রাতের। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে এবং আমরা তা প্রথম পরিচ্ছেদে উপস্থাপন করেছি। যদি লা-মাযহাবীরা বলে যে, অন্যান্য বর্ণনাগুলোতে এসেছে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাগরিবে তিন রাকআত ফরয পড়তেন। তাহলে আমরা বলছি, রিওয়ায়াতগুলোতে এটাও এসেছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিতরের নামাযও তিন রাকআত পড়তেন। দেখো প্রথম পরিচ্ছেদ।

তাহক্বীক্বী তথা গবেষণামূলক জবাব হলো, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তাআলার শুধু বিতরিয়্যাত তথা বিজোড় হওয়াকে উদাহরণ দিয়েছেন, এক হওয়াকে নয়। তিনও বিজোড় একও বিজোড়। উদাহরণ দেওয়ার সময় সামান্য সামঞ্জস্যতাই যথেষ্ট। সব দিক দিয়েই অনুরূপ হওয়া আবশ্যক নয়। এ জন্য হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিতর তথা বিজোড় বলেছেন 'ওয়াহিদ' তথা এক বলেননি। অর্থাৎ এমন বলেন নি যে, আল্লাহ তাআলা এক, এক রাকআতকে পছন্দ করেন। দেখো রব তাআলা ইরশাদ করছেন مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ অর্থাৎ, 'আল্লাহ তায়ালার নূরের উদাহরণ হলো একটি দীপাধারের ন্যায়,যাতে রয়েছে একটি প্রদীপ।'

এখানে রব তাআলা স্বীয় নূরের উদাহরণ পেশ করেছেন 'প্রদীপ' দ্বারা। আর

তা সাধারণ ভাবে আলো হওয়ার কারণে। এখন কেউ যদি বলে, প্রদীপে তেল ফিতা হয়ে থাকে, তাই আল্লাহর নূরেও তৈল ও ফিতা থাকবে, তাহলে সেটা হবে তার বোকামি। আমরা বলি যে, ঐ ব্যক্তিটি বাঘ। উদ্দেশ্য হলো, শুধুমাত্র শক্তিতেই বাঘের মতো। এই নয় যে, তার লেজ রয়েছে এবং থাবাও আছে।

আপত্তি নং- ৫ : ইমাম বুখারী হযরত ইবনে আবি মুলাইকা থেকে বর্ণনা করেন-

أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلَى لِابْنِ عَبَّاسٍ فَاتَى ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

অর্থাৎ, 'সাইয়িদুনা আমীরে মুয়াবিয়া (রাদ্বি.) 'ইশা'র পরে এক রাকআত বিতর পড়েছেন। ঐ সময় তার পাশে সাইয়িদুনা ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) এর গোলাম উপস্থিত ছিলেন। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) এর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বলরেন, তাঁকে (মুয়াবিয়া (রাদ্বি.) কে) কিছু বলোনা। তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবী।'

বুঝা গেলো হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাদ্বি.) এক রাকআত বিতর পড়তেন। এটা সাহাবীর কাজ।

জবাব : এ হাদীসতো হানাফীদের মজবুত দলীল। অর্থাৎ বিতর তিন রাকআত। কেননা যখন আমীরে মুয়াবিয়া (রাদ্বি.) এক রাকআত বিতর পড়লেন তখন সাইয়িদুনা ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) এর গোলাম আশ্চার্যান্বিত হলেন। যার অভিযোগ হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) এর কাছে করলেন। আশ্চর্য ও বিস্ময় ঐ কাজের ক্ষেত্রেই আসে যা অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক হয়। এর দ্বারা তো এটা বুঝা গেলো যে কোন সাহাবী এক রাকআত বিতর পড়তেন না। না হলে তিনি না আশ্চর্য হতেন না অভিযোগ করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.)ও আপত্তি করতে নিষেধ করতেন না। কেননা আমীরে মুয়াবিয়া ফক্বীহ মুজতাহিদ ছিলেন। ফক্বীহ মুজতাহিদের ভুল-ত্রুটির সমালোচনা বৈধ নয়। এর উল্লেখ বুখারী শরীফের অন্য রেওয়ায়াতে এ ভাবে আছে-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قِيْلَ لَهٗ هَلْ لَكَ فِىْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَعَاوِيَةَ مَا اَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ قَالَ اَصَابَ إِنَّهٗ فَقِيْهٌ

অর্থাৎ, 'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) কে বলা হলো, আমীরুল মু'মিনীন হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বি.) এর বিতর এক রাকআত পড়ার ব্যাপারে আপনার কোন আপত্তি আছে কি? তিনি বললেন, তিনি ঠিক করেছেন, তিনি মুজতাহিদ আলিম।

পরিষ্কার বুঝা গেল যে, সমস্ত সাহাবী এবং স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) বিতর তিন রাকআত পড়তেন। এ জন্যই আমীরে মুয়াবিয়া (রাদ্বি.) এর এক রাকআত পড়ার অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া একজন সাহাবী, আলিম, ফক্বীহ, মুজতাহিদ, সেহেতু তার ত্রুটিও বৈধ। এর উপর আপত্তি করো না।

এ হাদীসতো হানাফীদের দলীল। আপনারা ধোঁকায় পড়ে নিজেদের দলীল মনে করে বসে আছেন। এটা আপনাদের বিরোধী।

আপত্তি নং- ৬ : হানাফীদের আচরণ আশ্চর্যজনক। আমরা এক রাকআত বিতর পড়লে আপত্তি করেন। আমীরে মুয়াবিয়া (রাদ্বি.) এক রাকআত পড়লে তার উপর কোন আপত্তি নেই। আমরা রফয়ে য়াদাইন (উভয় হাত তোলা) করলে কিংবা উচ্চস্বরে আমীন বললে আমাদের নিন্দা হয়। ইমাম শাফিঈ (রহ.) আমাদের মতোই নামায পড়লেও না তাঁকে ওয়াহাবী বলা হয়, না তাঁর উপর কোন আপত্তি হয়। এ দ'মুখো নীতি কি জন্য? এবং এ পার্থক্য কেন?

জবাব : জি হ্যাঁ! একেবারেই ঠিক। আলিম ফক্বীহ-মুজতাহিদের ত্রুটিতেও সাওয়াব রয়েছে। কিন্তু যখন জাহিল তথা মুর্খ ব্যক্তি বিজ্ঞ আলিমদের থেকে মুখ ফিরিয়ে ভুল করে, তাহলে সেটা অবশ্যই শাস্তির যোগ্য। যদি সিভিল সার্জন সনদপ্রাপ্ত সরকারী লোক কোন রোগের ভুল ঔষধ দিয়ে দেয়, তখন এর জন্য কোন নিন্দা হয় না। কিন্তু যদি কোন মুর্খ লোক একই ভাবে আন্দাজ করে কোন ভুল ঔষধ খাইয়ে দেয়, তাহলে শরীয়ত ও আইনত সে অপরাধী। জজ-হাকিম কোন অপরাধীকে শাস্তি দিলে সেটা যথার্থ, যদিও ভুল করে দেয়। কিন্তু কোন সাধারণ লোক আইন হাতে নিয়ে যদি নিজেই লোকদেরকে শাস্তি দেয়, তাহলে সে অবশ্যই অপরাধী জেলে যাওয়ার উপযুক্ত।

দেখো, হযরত আলী ও মুয়াবিয়া (রাদ্বি আল্লাহু আনহুমা)'র মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছে , যেটাতে নিঃসন্দেহে আলী মুরতাদা (রাদ্বি.) সত্যের উপর ছিলেন। আর আমীরে মুয়াবিয়া (রাদ্বি.) ছিলেন ভুলের উপর। কিন্তু ওনাদের কেউই পাপী

নন। যাকেই মন্দ বলা হোক যে বলবে, সে বেঈমান হয়ে যাবে। কুরআনে করীম হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) এর একই বিচারে দু'ধরনের রায় উল্লেখ করেছে–

إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا

অর্থাৎ, 'যখন ঐ দু'হযরত একটি ক্ষেতের ব্যাপারে ফায়সালা দিচ্ছিলেন, যখন তাতে গোত্রের বকরীগুলো ছড়িয়ে পড়েছিলো। আমি তাঁদের ফায়সালা অবলোকন করেছিলাম। অতঃপর আমি সুলায়মানকে তা বুঝিয়ে দিয়েছি এবং আমি এদের প্রত্যেককেই ইলম ও হিকমত দিয়েছি।'

দেখো, ক্ষেতের উক্ত বিচারে হযরত দাউদ (আ:) ও সুলায়মান (আ:) উভয় বুযর্গই ভিন্ন ভিন্ন রায় দিয়েছেন। হযরত সুলায়মান (আ:) এর রায় সঠিক ছিলো। যাকে রব তাআলা সমর্থন করেছেন। হযরত দাউদ (আ:) এর রায় 'খাতায়ে ইজতিহাদী' তথা গবেষনাগত ভুল ছিলো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোনরূপ নিন্দা করা হয়নি। কেননা তিনি স্বয়ং মুজতাহিদে মুতলাক তথা সাধারণ গবেষক ছিলেন এবং মুজতাহিদের ভুল নিন্দনীয় নয়। লা-মাযহাবীরা! যদি আপনারাও 'রফয়ে য়াদাইন' ও 'উচ্চস্বরে আমীন' স্যাফিঈ হয়ে করেন, তাহলে আপনাদেরকে লা-মাযহাবী বলা হবে না, না কোন অভিযোগ করা হবে। আপনারা স্বয়ং জ্ঞান হীন হয়েও আইন হাতে তুলে নিচ্ছেন এবং নিজ দায়িত্বেই এ সব পরিবর্তন করে দ্বীনের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করছেন।

আপত্তি নং- ৭ : তিন রাকআত বিতরের যতগুলো হাদীস রয়েছে, সবই 'যঈফ' তথা দুর্বল। আর 'যঈফ' হাদীসসমূহ কোন প্রমাণ নয়।

জবাব : জি হ্যাঁ! এ জন্যই যঈফ যে, তা আপনাদের বিরোধী। অথবা এ জন্য যে, সমস্ত হাদীস সাড়ে তেরোশ বছরের পুরোনো হয়ে গিয়েছে। মানুষ তো ষাট বছরেই বুড়োও দুর্বল হয়ে যায়। তাহলে প্রায় চৌদ্দশ বছরের হাদীসগুলো দুর্বল কেন হবে না? আপনাদের এ যঈফ যঈফ বলে চিৎকার মানুষকে হাদীসের আমান্যকারী বানিয়ে দিয়েছে। আপনাদের এ আপত্তির বিভিন্ন জবাব আমরা এ পুস্তকে বার বার দিয়েছি।

অষ্টম অধ্যায়

কুনূতে নাযিলাহ্ পড়া নিষেধ

বিতর নামাযের তৃতীয় রাকআতে রুকূর পূর্বে দু'আয়ে কুনূত সব সময় পড়া সুন্নাত। আর ফজরের ফরযের দ্বিতীয় রাকআতে রুকূর পরে 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়া একেবারেই মাকরূহ তথা অপছন্দনীয় এবং সুন্নাতের পরিপন্থী। কিন্তু মাযহাব অমান্যকারী ওহাবীদের আমল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা রামাদ্বানের কিছু তারিখ ছাড়া বিতর নামাযে দু'আয়ে কুনূত কখনোই পড়ে না। অথচ ফজরের নামাযে সব সময় কুনূতে নাযিলাহ পড়ে থাকে। দ্বিতীয় রাকআতের রুকূর পড়ে কিছু দেওবন্দী ওহাবী ও- যারা মূলত ছদ্মবেশী লা মাযহাবী তাল- বাহানা করে ফজরের নামাযে কুনূতে নাযিলাহ পড়ে। এ জন্য এ অধ্যায়কেও দুটো পরিচ্ছেদে ভাগ করা হচ্ছে। প্রথম পরিচ্ছেদে এ মাসআলার প্রমাণ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ মাসআলা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তর দেয়া হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুনূতে নাযিলাহর অর্থ হলো বিপদাপদের সময়কার দু'আ তথা প্রার্থনা। হুযূর সাইয়িদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার একটি বিশেষ মুসিবতের সময় কিছু দিন দু'আয়ে কুনুত ফজরের ফরয নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে রুকূর পড়ে পড়েছেন। কুরআনে করীমের আয়াত এ দু'আ মানসূখ তথা রহিত করে দেয়। এরপর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আর কখনো তা পড়েননি। দলীলাদি নিম্নরূপ-

হাদীস নং- ১,২ : ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আনাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন- তিনি (আনাস রাদ্বি.) হযরত আছিম আহওয়াল এর একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বললেন-

إِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا إِنَّهُ كَانَ بَعَثَ اُنَاسًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ سَبْعُوْنَ رَجُلًا فَاُصِيْبُوْا فَقَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا يَدْعُوْا عَلَيْهِمْ–

'হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধুমাত্র একমাস 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়েছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্তর জন ক্বারী সাহাবীকে এক জায়গায় দ্বীন প্রচারের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁদেরকে শহীদ করা হলো। তাই হুযুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক মাসব্যাপী ঐ সাহাবীদের হত্যাকারী কাফিরদেরকে অভিশাপ দিতে গিয়ে কুনূতে নাযিলাহ পড়েছেন।'

এক মাস সীমাবদ্ধকরণের দ্বারা বুঝা গেলো- হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ পবিত্র কাজটি স্থায়ী ছিলো না। ওযরের কারণে শুধুমাত্র এক মাস ছিলো। এরপর রহিত হয়ে গেলো।

হাদীস নং- ৩ : তাহাবী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত-

قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُوْا عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانْ فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ تَرَكَ اَلْقُنُوْتَ-

'হুযূর আনওয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধুমাত্র এক মাস কুনূতে নাযিলাহ পড়েছেন- 'রি'ল' ও 'যাকওয়ান' গোত্রদ্বয়ের উপর বদদোয়া করতে গিয়ে। যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের উপর জয়ী হলেন,তখন (কুনূতে নাযিলাহ পড়া) ছেড়ে দিলেন।'

এ হাদীসে পরিত্যাগ করার কথা সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।

হাদীস নং- ৪-৭ : আবূ ইয়া'লা মুছিলা, আবূ বকর বায্যার, তাবরানী 'কাবীর' গ্রন্থে এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُوْا عَلٰى عُصَيَّةَ وَذَكْوَانِ شَهْرًا فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ تَرَكَ الْقُنُوتَ وَقَالَ الْبَزَّارُ فِى رِوَايَتِهِ لَمْ يَقْنُتِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ شَهْرًا وَاحِدًا لَمْ يَقْنُتْ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ-

'হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধুমাত্র একমাস 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়েছেন। তাতে ওসাইয়া ও 'যাকওয়ান' গোত্রদ্বয়ের উপর বদদোয়া করেছেন। যখন তাদের উপর জয়ী হলেন তখন ছেড়ে দিলেন। বায্যার নিজস্ব রিওয়ায়াতে

বলেছেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধুমাত্র এক মাস 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়েছেন। এর পূর্বে ও পরে আর কখনো পড়েননি।'।

হাদীস নং- ৮,৯ : আবূ দাউদ, নাসাঈ হযরত আনাস (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন-

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ

'নিশ্চয়ই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধুমাত্র একমাস কুনূতে নাযিলাহ' পড়েছেন। এরপর ছেড়ে দিয়েছেন।'

হাদীস নং- ১০-১২ : তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ হযরত আবূ মালিক আশজাঈ থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ يَااَبَتِ اِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ هٰهُنَا بِالْكُوْفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِيْنَ كَانُوْا يَقْنُتُوْنَ قَالَ يَابُنَيَّ مُحْدَثٌ-

'তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে প্রশ্ন করলাম, আব্বাজান! আপনি হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বকর সিদ্দীক (রাদ্বি.), উমর (রাদ্বি.), উসমান (রাদ্বি.) এবং আলী (রাদ্বি.) এর পিছনে কুফাতে প্রায় পাঁচ বছর নামায পড়েছেন, এ সম্মানিত ব্যক্তিগণ কি 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়তেন? তিনি বললেন, হে বৎস! এটা বিদ্আত।'

অর্থাৎ সর্বদা কুনূতে নাযিলাহ পড়া সুন্নাতের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং 'বিদআতে সাইয়িআহ্' তথা মন্দ প্রচলন।

হাদীস নং- ১৩, ১৪: ইমাম মুসলিম ও বুখারী হযরত আবূ হুরায়রা (রাদ্বি.) থেকে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন,যার শেষের কয়েকটি শব্দ নিম্নরূপ-

وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ بَعْضِ صَلٰوتِهِ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا لِاَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ-

'হুযূর আনওয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কোন কোন নামাযে বলতেন- হে আল্লাহ! অমুক, অমুকের (আরবের কয়েকটি গোত্রের) উপর লা'নত করো। শেষ পর্যন্ত এ আয়াতে করীমাহ অবতীর্ণ হলো-

"لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ"

এ হাদীস দ্বারা কয়েকটি মাসআলা জানা গেলো-

এক, দু'আয়ে 'কুনূতে নাযিলাহ' ফজরের নামাযে পড়া মানসূখ তথা রহিত। দুই, হাদীস শরীফ কুরআনে করীমের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যায়। যেমন 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং এর রহিত হওয়াটা কুরআনে করীম দ্বারা প্রমাণিত। তৃতীয়, দ্বীনের শত্রুদের উপর বদদোয়া করা বৈধ। যাদের উপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদদোয়া করেছেন, তারা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যক্তিগত শত্রু ছিলো না, বরং দ্বীনে ইসলামের শত্রু ছিলেন। যখন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন,তখন বদদোয়া ও করেছেন। হ্যাঁ, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় ব্যক্তিগত শত্রুদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। ফলে হাদীসসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই।

হাদীস নং- ১৫ : মুহাদ্দিস হাফিয তালহা ইবনে মুহাম্মদ স্বীয় 'মুসনাদে' ইমামে আযম আবূ হানীফা (রাদ্বি.) এর সনদে বর্ণনা করেন-

عَنِ الاِمَامِ الاَعْظَمِ عَنْ اَبَانِ ابْنِ عَيَّاشٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمْ يَقْنُتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْفَجْرِ اِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا لِاَنَّهُ حَارَبَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَنَتَ يَدْعُوْا عَلَيْهِمْ-

'ইমামে আযম আবূ হানীফা (রাদ্বি.) হযরত ইবনে আইয়াশ থেকে, তিনি ইবরাহীম নাখঈ থেকে, তিনি হযরত আলক্বামা থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) বলেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের নামাযে কখনো 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়েননি, এক মাস ব্যতীত। কেননা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।' তখন ওদের উপর এক মাস বদদোআ করেছিলেন।

হাদীস নং- ১৬,১৭ : হাফিয ইবনে খসরু স্বীয় 'মুসনাদে' এবং ক্বাযী উমর ইবনে হাসান আশনানী হযরত আবূ হানীফা (রাদ্বি.)) থেকে তিনি হাম্মাদ থেকে, তিনি হযরত ইবরাহীম নাখঈ থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ مَا قَنَتَ اَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ وَ لَاعُثْمَانُ وَلَاعَلِىٌّ حَتّٰى حَارَبَ اَهْلَ الشَّامِ فَكَانَ يَقْنُتُ-

'তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাদ্বিআল্লাহু আনহুম) কখনও 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়েননি। কেবল হযরত আলী (রাদ্বি.) যখন শামবাসীদের সাথে যুদ্ধ করেছেন, তখন কুনূতে নাযিলাহ পড়েছেন।

হাদীস নং- ১৮ : আবূ মুহাম্মদ বুখারী হযরত ইমামে আযম আবূ হানীফা (রাদ্বি.) থেকে, তিনি আতিয়্যাহ আওফী থেকে, তিনি হযরত আবূ সাঈদ খুদরী সাহাবী (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْنُتْ إِلَّا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا يَدْعُوْا عَلٰى عُصَيَّةٍ وَذَكْوَانَ ثُمَّ لَمْ يَقْنُتْ إِلٰى أَنْ مَاتَ-

'তিনি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন- হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চল্লিশ দিন ব্যতীত 'কুনূতে নাযিলাহ' কখনো পড়েন নি। ঐ চল্লিশ দিন তিনি 'ওসাইয়াহ' ও 'যাকওয়ান' গোত্রের উপর বদদোয়া করেছেন। এরপর ইন্তিকাল পর্যন্ত আর কখনো পড়েন নি।'

এ আঠারটি হাদীস দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করা হলো। নয়তো 'কুনূতে নাযিলাহ' না পড়া সম্পর্কিত অনেক বেশী হাদীস শরীফ বিদ্যমান। যদি ইচ্ছা হয় তাহলে তাহাবী শরীফ, সহীহুল বিখারী ইত্যাদি অধ্যয়ন করুন।

বিবেকেরও চাহিদা এটা যে, নামাযে 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়া অনুচিত কয়েকটি কারণে- **এক:** পাঞ্জেগানা ফরয নামাযগুলোর রাকআত ভিন্ন। ফজরের দুই, যোহর- আসর ইশার চার, মাগরিবের তিন। কিন্তু কোন ফরয নামায, নামাযের রুকনসমূহ বা দুআ ইত্যাদির ক্ষেত্রে রুকন দু'আসমূহ ইত্যাদি একই ধরনের। তাই যখন অন্য চার নামাযে 'কুনূতে নাযিলাহ নেই তেমনি ফজরের ফরয নামাযেও না হওয়া চাই। **দুই :** জামাআত সহকারে ফরয নামায গুলোতে দু'আসমূহ, যিকর ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত। নফলের ক্ষেত্রে এর স্বাধীনতা রয়েছে। দেখুন রুকূ থেকে উঠার সময় একা নামাযী 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্'ও বলে আবার 'রাব্বানা লাকাল হাম্দ'ও বলে থাকে। কিন্তু যখন জামাআতের সাথে পড়ে তখন ইমাম 'রাব্বানা লাকাল হাম্দ' বলেন না। শুধুমাত্র 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলেন। আর মুকতাদী এর বিপরীত। অর্থাৎ, 'রাব্বানা লাকাল হাম্দ' বলে কিন্তু 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলেনা। যখন এ সকল নামাযে এ ধরনের সীমাবদ্ধতা কাঙ্খিত,তা হলে ফজরের রুকূর পরে এতো লম্বা দু'আ 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়া শরীয়তের চাহিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। **তিনঃ** নামায বিশেষ করে

পাঞ্জেগানা ফরয নামাযগুলোর আরকান একই ধরনের হওয়া উচিত। অর্থাৎ, দাঁড়ানোর পরে দ্রুত রুকূ এবং রুকূর পরপরই সিজদা আর সিজদার পরে তাড়াতাড়ি ক্বিয়াম তথা দাঁড়ানো অথবা বসা। এ গুলোর মাঝখানে বিরতি কিংবা ব্যবধান শরীয়তের চাওয়ার বিপরীত। ফজরের রুকূর পরে যে কিয়াম রয়েছে তাতে শুধুমাত্র 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলার সময়টুকু থামা উচিত। যদি এতে 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়া হয় তাহলে নামাযের সর্বোচ্চ রুকন সিজদা করতে বিলম্ব হয়ে যায়। যদি ভুল করে ফরয আদায়ে দেরী হয় তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব। আর যদি ইচ্ছাকৃত হয় তখন নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। এ জন্যই নামাযের অভ্যন্তরে 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়া উচিত নয়। যাতে নামাযের রুকনসমূহ পরস্পর সংযুক্ত থাকে।

ফিক্বহী মাসআলা

হানাফী মাযহাবের মতে যুদ্ধ বা অন্যান্য সাধারণ বিপদের ক্ষেত্রে নামাযের বাইরে 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়া উত্তম। এতে সাহাবায়ে কেরামের মতানৈক্য থেকে বাঁচা যায়। কেননা কোন কোন সাহাবী বিপদাপদ ও যুদ্ধের ক্ষেত্রে 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়তেন। আর কেউ কেউ এটাকে রহিত হিসাবে মানতেন। কিন্তু যদি কেউ ফজরের ফরযের দ্বিতীয় রাকআতে রুকূর পরে 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়ে তাহলে তা ভাল করেনি, কিন্তু বৈধ। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বিষয় বৈধ হয়ে যায়। তবে নীচু স্বরে পড়বে উচ্চ স্বরে নয়। ফজর ব্যতীত আর কোন নামাযে পড়লে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা সে কোন কারণ ছাড়া ইচ্ছাকৃত ভাবে সিজদায় বিলম্ব করেছে। ফরয আদায়ে বিলম্ব হলে নামায ভেঙ্গে যায়।

একটি সন্দেহ

কিছু লোক বলে থাকে- সকল বিপদাপদ কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে সমস্ত জাহেরী তথা প্রকাশ্য নামাযে অর্থাৎ ফজর-মাগরিব-ইশা'য় কুনূতে নাযিলাহ পড়া উচিত। কেননা 'শরহে নিক্বায়াহ' ও 'গায়াতুল আওতারে' রয়েছে-

قَنَتَ الْإِمَامُ فِىْ صَلٰوةِ الْجَهْرِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىْ وَاَحْمَدُ

অর্থাৎ, ' ইমাম 'জাহেরী' নামাযে (ফজর, মাগরিব, ইশা) কুনূতে নাযিলাহ পড়েছেন। ইমাম সাওরী ও আহমদ এর এটাই অভিমত।

পাঞ্জাবে অনেক দিন থেকে কয়েকজন মূর্খ ইমাম এ দলীলের ভিত্তিতে

মাগরিব, ইশা ও ফজরে, এমনকি জুমআ'র নামাযেও 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়ে লোকদের নামায বরবাদ করছে।

সন্দেহের অপনোদন

'শরহে নিক্বায়াহ' ও 'গা-য়াতুল আওতার' গ্রন্থদ্বয়ে কাতিব ভুলবশতঃ ফজরের স্থানে 'জাহ্‌র' লিখে দিয়েছেন। অর্থাৎ 'ফা' কে 'জীম' এবং 'জীম'কে 'হা' বানিয়ে দিয়েছেন। উদারহণ স্বরূপ- 'আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর' গ্রন্থে এ স্থানে صَلٰوةِ الْجَهْرِ এর পরিবর্তে صَلٰوةِ الْفَجْرِ রয়েছে। আর তাহতাবী 'দুররুল মুখতারে' এবং আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী 'মিনহাতুল খালিক আলা বাহ্‌রির রা-ইক্ব' এ বলেন- وَلَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنِ الْفَجْرِ

সম্ভবতঃ جهر শব্দটি فجر শব্দের পরিবর্তিত রূপ।'

তাহতাবী'র ইবারত এরূপ-

وَالَّذِىْ يَظْهَرُلِىْ اَنَّ قَوْلَهُ فِى الْبَحْرِ وَ اِنْ نَزَلَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ نَازِلَةٌ قَنَتَ الْإِمَامُ فِىْ صَلٰوةِ الْجَهْرِ تَحْرِيْفٌ مِنَ النُّسَّاخِ وَصَوَابُهُ الْفَجْرِ-

'বাহ্‌রুর রা-ইক' যা বলেছে 'যদি মুসলমানদের উপর কোন বিপদ আসে তখন ইমাম 'জাহরী' নামাযে (ফজর, মাগরিব, ইশা) 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়বে,। আমার ধারণা এটা কাতিবের ভুল। বিশুদ্ধ হলো 'ফজর'।'

আমরা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে এ প্রসঙ্গে কিছু লিখলাম। যদি 'কুনূতে নাযিলাহ' সম্পর্কে অধিক তাহক্বীক্ব তথা পর্যালোচনার ইচ্ছা হয়, তাহলে আমার লিখিত 'ফাত্‌ওয়ায়ে নাঈমিয়্যাহ' অধ্যয়ন করুন। যেহেতু বর্তমানে কোন কোন দেওবন্দীও কিছু ক্ষেত্রে 'কুনূতে নাযিলাহ, পড়তে শুরু করেছে। তাই ওখানে এ মাসআলার উপর কিছুটা খোলাসা করে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলার ক্ষেত্রে আপত্তি ও জবাবসমূহ

গায়রে মুক্বাল্লিদ ওহাবীদের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত যে সব আপত্তি আমাদের কাছে পৌঁছেছে আমরা চূড়ান্ত সততার সাথে সেগুলোর জবাব সহ

উপস্থাপন করছি। যদি আগামীতে নতুন কোন আপত্তি দৃষ্ট হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ এর জবাব সমূহও আলোকপাত করা হবে।

আপত্তি নং- ১ : আপনারা 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়ার সম্পর্কে যে সব হাদীস উপস্থাপন করেছেন, তার সবকটিই 'যঈফ'। এবং 'যঈফ' হাদীস সমূহের দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা যায় না। (পুরোনো প্রলাপ)

জবাব : এর বিভিন্ন জবাব আমরা বারবার দিয়েছি। এখন একটি মীমাংসাপূর্ণ আলোচনা করছি। আর সেটা হলো- আমাদের দলীলাদিতো এ রিওয়ায়াত গুলো নয়। আমাদের মূল দলীল তো ইমামে আযম আবূ হানীফা (রাদ্বি.)এর নির্দেশ। আমরা এ আয়াত ও হাদীসসমূহ মাসাইলের দৃঢ়তার জন্য উপস্থাপন করে থাকি। হাদীস ও আয়াত সমূহ ইমাম আবূ হানীফা (রাদ্বি.) এর দলীল। তাঁর হাদীসগুলোর সনদ এ গুলো নয়। তাঁর সনদ একেবারে সংক্ষিপ্ত এবং সম্পূর্ণ খাঁটি। যেখানে দু-তিনজন রাবী হয়ে থাকেন। তাঁরাও খুবই বিশ্বস্ত। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে আপনারা ১৮ নং হাদীসে দেখেছেন ইমামে আযমের সনদে শুধুমাত্র দু'জন রাবী 'আতিয়্যাহ আওফী' আবূ সাঈদ খুদরী (রাদ্বি.) এবং ১৫ নং হাদীসে শুধুমাত্র চারজন রাবী, আব্বান ইবনে আইয়াশ ইবরাহীম নাখঈ আলক্বামা ইবনে মাসউদ। বলোন এঁদের মধ্যে কে দুর্বল? যেহেতু ইমামে আযমের সময়কাল 'খায়রুল কুরুন' তথা 'সর্বোত্তম যুগ সমূহের' অন্তর্ভুক্ত তাই তাঁর হাদীসগুলোর সনদ সমূহে খুবই অল্পসংখ্যক রাবী রয়েছেন। এ জন্য সেখানে 'যঈফ' এর প্রশ্নই সৃষ্টি হয়নি। দুর্বলতা, ত্রুটি গোপনকরণ ইত্যাদি রোগব্যাধি পরবর্তীতে ঢুকেছে। হ্যাঁ, আপনাদের কোন রিওয়ায়াত দুর্বল হওয়াটা আপনাদের জন্য কিয়ামত। কারণ এ রিওয়ায়াতগুলোই আপনাদের দলীলাদি, যার উপর আপনাদের মাযহাবের ভিত্তি। আর আপনাদের সময় হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অনেক দূরে, আপনাদের রিওয়ায়াতগুলোর সনদ সমূহ অত্যন্ত লম্বা, যেটাতে সব ধরণের রোগ ব্যধি বিদ্যমান। তাই যঈফ, যঈফ, বলে চিৎকার করে কোন গায়রে মুকাল্লিদের ভয় দেখানোতে হানাফীদের জন্য কোন সমস্যা নেই। বাকী উত্তর সমূহ তাই যা আমরা পূর্বের অধ্যায়গুলোতে আলোকপাত করেছি। আমরা আল্লাহ তায়ালার রহমতে প্রত্যেক হাদীসের এমন সব সনদ পেশ করেছি যাতে ঐ হাদীসগুলো 'হাসান' হয়ে গিয়েছে; দুর্বলতা কেটে গিয়েছে।

আপত্তি নং- ২ : ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন- কোন এক ব্যক্তি আনাস

(রাঃ) থেকে প্রশ্ন করেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখন কুনূত পড়েছেন? তখন তিনি উত্তর দিলেন-

قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ وَفِىْ رِوَايَةِ الرُّكُوْعِ وَبَعْدَهُ

'হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকুর পর 'কুনূত নাযিলাহ' পড়েছেন। অন্য এক রিওয়ায়াতে রয়েছে, রুকূর পূর্বে ও পড়েছেন এবং পরেও পড়েছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, 'কুনূতে নাযিলা' পড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত।

জবাব : এর কয়েকটি জবাব রয়েছে। এক, এ হাদীসে 'কুনূতে নাযিলাহ'র উল্লেখ নেই এবং মিশকাত শরীফের সংকলক এ হাদীসটি দু'আয়ে কুনূতের আলোচনায় এনেছেন, যা বিতরে পড়া হয়। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, এখানে দু'আয়ে কুনূত উদ্দেশ্য। এ জন্য আপনাদের দলীল গ্রহণ ভুল হয়েছে। দুই, যদি 'কুনূতে নাযিলাহই উদ্দেশ্য হয়, তবুও এখানে এটা উল্লেখ নেই যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা পড়েছেন। আর আমরা প্রথম পরিচ্ছেদ প্রমাণ করেছি যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধুমাত্র একমাস 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়েছেন। এরপর চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করেন। তাই এ হাদীসটি রহিত। এবং রহিত হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করা কঠিন অপরাধ। তিন : যদি এ হাদীসে 'কুনূতে নাযিলাহ'ই উদ্দেশ্য হয়, তবুও এতে এ সিদ্ধান্ত দেয়া হয়নি যে, রুকূর আগে পাঠ কর রছেন,না পরে। আপনারা রুকূর পরের সিদ্ধান্ত কিভাবে নিলেন? এ হাদীসটি আপনাদেরও বিরোধী।আপনাদের এ হাদীসটি ইবনে মাজাহর। এর সনদ মাজরূহ তথা খুঁতযুক্ত। এ জন্যই তা ইমাম মুসলিম ও বুখারী গ্রহণ করেন নি। মুসলিম ও বুখারীর রিওয়ায়াত গুলো এ হাদীসের বিপরীত, যা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে উপস্থাপন করেছি। এ জন্য এ হাদীসটি 'মাজরূহ'। মোটকথা এই, এ হাদীসটি আপনাদের জন্য কোন ভাবেই দলীল নয়।

আপত্তি নং- ৩ : তাহাবী অনেক সনদের মাধমে হযরত আবূ হুরায়রা (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন- (এতগুলো সনদ বিশিষ্ট রিওয়ায়াত যঈফ হতে পারে না।)

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ حِيْنَ يَفْرُغُ

مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأسَهُ وَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ ابْنِ الْوَلِيْدِ-

'হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ফজর নামাযের ক্বিরাআত থেকে অবসর হতেন; তাকবীর বলে রুকূ করতেন এবং রুকূ থেকে মাথা মুবারক তুলতেন। আর 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন। এরপর তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় এ ভাবে দু'আ করতেন- হে আল্লাহ! ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদকে নাজাত দিন।'

তাহাবী শরীফ হানাফীদের গ্রন্থ। এতে 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়ার প্রমাণ রয়েছে।

জবাব : সম্ভবতঃ আপনারা তাহাবী শরীফের একই পৃষ্ঠায় হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবী বকর এর এ রিওয়ায়াত দেখেননি। আর দেখবেনও বা কিভাবে। সেটাতো আপনাদের বিরোধী। শেষের ক'টি শব্দ দেখুন-

فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئٌ فَمَا دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُعَاءٍ عَلٰى اَحَدٍ-

'হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরে 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়তেন। এরপর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো- لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ এর পরে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আর কখনো কারো উপর নামাযে বদদোয়া করেননি।'

সুতরাং আপনাদের উপস্থাপিত সকল হাদীস এ আয়াতে করীমা দ্বারা মানসূখ তথা রহিত। আর মানসূখ হাদীস দ্বারা নিজের পক্ষে দলীল পেশ করা আপনাদের মত বুযুর্গদেরই (!) সাজে।

আপত্তি নং- ৪ : বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হযরত আলী (রাদ্বি.) সিফ্ফীনের যুদ্ধ চলাকালীন ফজরের নামাযে 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়তেন। কিছু বর্ণনায় হযরত উমর (রাঃ) থেকে 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়ার কথা উদ্ধৃত রয়েছে। এমন পরম সম্মানিত সাহাবীদের 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়া এর সুন্নাত হওয়ার উজ্জ্বল প্রমাণ।

জবাব : এর দু'টো উত্তর রয়েছে। এলজামী তথা পাল্টা জবাব এবং

www.AmarIslam.com

তাহক্বীক্বী তথা অনুসন্ধানমূলক। জওয়াবে ইলযামী এ যে, এ বর্ণনাগুলো আপনাদেরও বিরোধী। কেননা এতে যুদ্ধাবস্থার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ, হযরত উমর (রাদ্বি.) কাফিরদের বিরুদ্ধে এবং হযরত আলী ((রাদ্বি.) খারিজী তথা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় এ দু'আ পাঠ করতেন। বুঝা গেল, শান্তিপূর্ণ সময়ে পড়তেন না। অথচ আপনারা সব সময়ই পড়ছেন। আপনারা আজ পর্যন্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে কয়টা যুদ্ধ করেছেন? আপনারা মুসলমানদেরকে মুশরিক বানানো আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া আর কোন জিহাদ করেছেন?

অনুসন্ধানমূলক জবাব এ যে, আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে আলোকপাত করেছি যে 'কুনূতে নাযিলাহ' প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য ছিলো। কোন কোন সাহাবী এটাকে মানসূখ (রহিত) মানতেন এবং বিদআত বলতেন। যেমন হযরত আবূ মালিক আশজাঈ (রাদ্বি.) যা আমরা নাসাঈ ও ইবনে মাজাহর রেফারেন্স দিয়ে প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। আবার কিছু সাহাবী যুদ্ধাবস্থায় 'কুনূতে নাযিলাহ' পাঠ করতেন। যেমন হযরত উমর ও আলী (রাদ্বি.)। এ জন্য আমাদের ফক্বীহগণ বলছেন যে, এখনও যুদ্ধাবস্থায় 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়া বৈধ। তবে উত্তম নয়। কিন্তু সব সময় পড়াটা কোন সাহাবীর মত নয়। আমাদের সকল আলোচনা সব সময় পড়া নিয়ে। কিন্তু আপনাদের দাবীও ভিন্ন দলীলও ভিন্ন।

সমস্ত লা-মাযহাবীদের প্রতি সাধারণ ঘোষণা এমন একটি মারফু সহীহ হাদীস দেখাও যেটাতে সব সময় 'কুনূতে নাযিলাহ' পড়ার নির্দেশ কিংবা উল্লেখ রয়েছে। ইনশাআল্লাহ ক্বিয়ামত পর্যন্ত খুজে পাবে না। তাই জেদ কেন করছেন, মুকাল্লিদ হয়ে বিশুদ্ধভাবে নামায পড়তে থাকেন।

বিত্‌রে দু'আয়ে কুনূত সব সময় পড়ুন

যেহেতু গায়রে মুক্বাল্লিদ ওয়াহাবীরা বিত্‌রের মধ্যে সর্বদা দু'আয়ে কুনূত পড়তে নিষেধ করে; আমরা হানাফীরা সারা বছরই পড়ে থাকি। তাই সংক্ষিপ্ত ভাবে এ প্রসঙ্গেও সামান্য আলোচনা করছি। বিত্‌রের শেষ রাকআতে ক্বিরাআতের পরে রুকূর পূর্বে দু'আয়ে কুনূত পড়া সুন্নাত। এর বিপরীত করা খুবই মন্দ। নিম্নের হাদীস শরীফসমূহ পর্যবেক্ষন করুন-

হাদীস নং- ১,২ : ইমাম মুহাম্মদ 'আছার' গ্রন্থে এবং হাফিয ইবনে খসরু

www.AmarIslam.com

মুহাদ্দিস ইমাম আবূ হানীফা (রাদ্বি.) থেকে, তিনি হযরত হাম্মাদ থেকে, তিনি ইবরাহীম নাখঈ থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) (সাহাবীয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন-

أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِى الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ-

'তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিতরে সারা বছর রুকূর পূর্বে দু'আয়ে কুনূত পড়তেন।'

হাদীস নং- ৩, ৪ : দারে কুত্বনী এবং বায়হাকী হযরত সুওয়াইদ ইবনে গাফ্লা (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ سَمِعْتُ اَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا يَقُوْلُوْنَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اٰخِرِ الْوِتْرِ وَكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ-

'তিনি বলেন, আমি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, উমর ফারুক, উসমান গনী, আলী মুরতাদা (রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে শুনেছি তাঁরা বলতেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিত্‌রের শেষ রাকআতে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করতেন এবং সমস্ত সাহাবীও এ ভাবেই পড়তেন।'

হাদীস নং- ৫-৮ : আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ হযরত আমীরুল মু'মিনীন আলী মুরতাদ্বা (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন-

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ اٰخِرِ وِتْرِهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ

'নিশ্চয়ই হুযুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় বিতরের শেষ রাকআতে এ দূ'আ পড়তেন, 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা........।'

এ হাদীসগুলো উদাহরণ স্বরূপ পেশ করলাম। নয়তো এ ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে। ওগুলোতে কোথাও এটা উল্লেখ নেই যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিংবা সাহাবায়ে কেরাম শুধুমাত্র রামাদ্বানের শেষার্ধে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করেছেন- আগে পরে পড়েননি। বরং সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) থেকে সুস্পষ্ট ভাবে উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সারা বছর দু'আয়ে কুনূত পড়তেন। বুঝা গেল, বিতরে

www.AmarIslam.com

রুকূর পূর্বে সারা বছর দু'আয়ে কুনূত পড়া হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরও সুন্নাত এবং সাহাবায়ে কেরামেরও।

স্মর্তব্য যে, গায়রে মুকাল্লিদ ওহাবীদের কাছে রামাদ্বানের শেষার্ধে 'দুআয়ে কুনূত' পড়ার ব্যাপারে শুধুমাত্র একটি হাদীস রয়েছে, যা আবূ দাউদ হযরত হাসান বাসরী (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেছেন। শব্দ গুলো এরূপ-

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلٰى اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّىْ بِهِمْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَلَايَقْنُتُ بِهِمْ إِلَّا فِى النِّصْفِ الْبَاقِى-

'হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বি.) লোকদেরকে উবাই ইবনে কা'ব এর কাছে একত্রিত করলেন। তিনি তাঁদেরকে রাতে বিশ রাকআত তারাবীহ পড়িয়েছেন এবং কুনূত পড়তেন না। তবে রামাদ্বানের বাকী অর্ধেকে (কুনূত পড়েছেন)।'

লা-মাজহাবীরা বলে থাকে, রামাদ্বানের শেষার্ধে দু'আয়ে কুনূত পড়া সাহাবায়ে কিরামের সুন্নাত।

জবাব : এর দু'টো উত্তর রয়েছে। এক, হে ওহাবীরা! তোমাদের কি পূর্ণ হাদীসের উপর বিশ্বাস আছে, না অর্ধেকের উপর? যদি অর্ধেকের উপর হয়, তাহলে কেন? আর যদি পূর্ণ হাদীসের উপর হয়, তাহলে এতে এটাও উল্লেখিত রয়েছে যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব সমস্ত সাহাবীকে বিশ রাকআত তারাবীহ পড়াতেন। তোমরা সব সময় আট রাকআত তারাবীহ কেন পড়ো? বিশ রাকআত কেন পড়ো না? এ ধরণের রদবদল সম্পর্কে কুরআনে করীম ইরশাদ করছে-

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ

'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের উপর বিশ্বাস করছো আর কিছু অংশ অস্বীকার করছো?'

যদি এ হাদীস দ্বারা পনেরো দিন দু'আয়ে কুনূত প্রমাণিত হয়, তাহলে বিশ রাকআত তারাবীহও সাব্যস্ত হয়। এ জন্য এ হাদীসটি তোমাদেরও বিরোধী।

দ্বিতীয় জবাব, এ হাদীসে দুআয়ে কুনূতের উল্লেখ নেই। স্পষ্টতঃ এটা অন্য কোন দু'আ হতে পারে। যাতে কাফিরদের ধ্বংসের জন্য বদদোয়া করা হয়ে থাকতে পারে। যেহেতু ঐ সময়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে অনেক বেশী যুদ্ধ হতো।

www.AmarIslam.com

তাই সাহাবায়ে কিরাম রামাদ্বানের শেষার্ধে যেথানে কদরের রজনী ও ই'তিকাফের রাতসমূহ রয়েছে। তাই কাফিরদের ধ্বংস এবং ইসলামের বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করেছেন। যদি এর দ্বারা দু'আয়ে কুনূত উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ঐ সব হাদীসের বিরোধী হয়ে যায়, যা আমরা উপস্থাপন করেছি। যেখানে বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম সারা বছর দু'আয়ে কুনূত পড়তেন। যে ভাবেই হোক, হাদীস সমূহের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে দেয়া যায় না।

তৃতীয় জবাব, এ হাদীস দ্বারা ও পনেরো দিন দু'আয়ে কুনূত পড়ার বিধান সাব্যস্ত হচ্ছে না। কেননা উবাই ইবনে কাব (রাদ্বি.) বিশ রজনী তারাবীহ পড়িয়েছেন। তম্মধ্যে শেষার্ধে দুআয়ে কুনূত পড়েছেন। হিসাব করলে দশদিনই হয়। অর্থাৎ ২০ শে রামাদ্বান থেকে ৩০ শে রামাদ্বান পর্যন্ত দু'আয়ে কুনূত পড়া হয়েছে। আপনারা পনেরো থেকে তিরিশ তারিখ পর্যন্ত কেন পড়েন?

আমাদের ঘোষণা

আমরা সারা পৃথিবীর লা-মাযহাবীদের প্রতি ঘোষণা করছি যে, সহীহ মুসলিম ও বুখারী শরীফের এমন একটি মারফূ হাদীস পেশ করেন, যাতে পনেরো দিন দু'আয়ে কুনূত পড়ার নির্দেশ এসেছে। ক্বিয়ামত পর্যন্তও পারবে না। তাই নিজের মনগড়া আমল থেকে তাওবা করে সব সময় দুআয়েকুনূত পড়ুন। সর্বদা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে লজ্জা করছেন কেন?

নবম অধ্যায়

'আত্তাহিয়্যাত' পড়ার সময় বসার পদ্ধতি

পুরুষের জন্য সুন্নাত হলো 'উভয় আত্তাহিয়্যাতে' ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসা। মহিলারা উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে এবং মাটিতে (জায়নামাযে) বসবে। গায়রে মুকাল্লিদরা প্রথম আত্তাহিয়্যাতে পুরুষদের মতোই বসে এবং দ্বিতীয় বার বসে মেয়েদের মতো। এটা সুন্নাতের পরিপন্থী এবং খুবই মন্দ কাজ। তাই আমরা এ অধ্যায়কেও দুটো পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে এর প্রমান এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এর উপর আপত্তি সমূহের জবাব দেয়া হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আত্তাহিয়্যাতে প্রথম বৈঠক হোক কিংবা দ্বিতীয় বৈঠক পুরুষ ডান পা খাড়া রাখবে, আঙ্গুল গুলোর মাথা থাকবে কা'বার দিকে। বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসবে। এ প্রসঙ্গে প্রচুর হাদীস বর্ণিত,উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো-

হাদীস নং- ১ : ইমাম মুসলিম (রহ.) হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা সিদ্দীকা (রাদ্বি.) থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। যার শেষের কয়েকটি শব্দ এরূপ-

وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيُنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى

'তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন।'

হাদীস নং- ২,৩ : ইমাম বুখারী ও নাসাঈ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ اِنَّمَا السُّنَّةُ فِى الصَّلٰوةِ اَنْ تَنْصِبُ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى وَتُثْنِىَ رِجْلَكَ الْيُسْرٰى زَادَ النِّسَاءِ وَاسْتِقْبَالُهُ بِاَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ

'সুন্নাত হলো, তুমি ডান পা খাঁড়া রাখবে এবং বাম পা বিছিয়ে দিবে। নাসাঈ শরীফে এ কথাটি অতিরিক্ত রয়েছে যে, 'ডান পায়ের আঙ্গুল গুলো কিবলামুখী রাখবে।

হাদীস নং- ৪-৭ : ইমাম বুখারী, মালিক, আবূ দাউদ, নাসাঈ হযরত সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِى الصَّلٰوةِ اِذَا جَلَسَ قَالَ فَعَلْتُهُ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ فَنَهَانِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ سُنَّةُ الصَّلٰوةِ أَنْ تُنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى وَتُثْنِىْ رِجْلك الْيُسْرٰى فَقُلْتُ لَهُ اِنَّكَ تَفْعَلُ ذٰلِكَ فَقَالَ إِنَّ رِجْلَىَّ لَاتَحْمِلَانِى-

'তিনি তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) কে দেখতেন যে, তিনি নামাযে চারজানু হয়ে বসতেন। তিনি বলেন, এক দিন আমিও একই ভাবে বসলাম। তখন আমি খুবই অল্প বয়সী ছিলাম। তা দেখে আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) নিষেধ করলেন এবং বললেন, নামাযের সুন্নাত হলো, ডানপাকে খাঁড়া রাখবে এবং বাম পা বিছিয়ে রাখবে। আমি তাঁকে বললাম, আপনি যে এরূপ করলেন! তিনি বললেন, আমার পা দুটি আমাকে বহন করতে পারছে না। (অর্থাৎ, অপারগতার কারণেই)

হাদীস নং- ৮,৯ : ইমাম তিরমীযী এবং তাবরানী হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ قُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ إِلٰى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَلَسَ يَعْنِىْ لِلتَّشَهُّدِ اِفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى-

'তিনি বলেন, আমি মদীনা মুনাওয়ারায় এসেছি। তখন আমি মনে মনে স্থির করালাম, আমি হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামায দেখবো। যখন তিনি নামযে বসবেন অর্থাৎ তাশাহুদে বসলেন, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় বাম বিছিয়ে দিলেন আর বাম হাত বাম উরুর উপর রাখলেন এবং ডান পা খাঁড়া করলেন।'

www.AmarIslam.com

হাদীস নং- ১০-১৩ : ইমাম আহমদ, ইবনে হাব্বান, তাবরানী 'কাবীর' গ্রন্থে হযরত রিফাআ ইবনে রাফি' (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ فَاِذَا جَلَسْتَ فَاجْلِسْ عَلٰى فَخِذِكَ الْيُسْرٰى-

'তিনি বলেন, অতঃপর যখন তুমি বসবে, বাম উরুর উপরই বসবে।'

হাদীস নং- ১৪ : তাহাবী হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন,

إِنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ اِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ فِى الصَّلٰوةِ أَنْ يَّفْرِسَ قَدَمَهُ الْيُسْرٰى عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَجْلِسُ عَلَيْهَا-

'তিনি মুস্তাহাব মনে করতেন যে, পুরুষ স্বীয় বাম পা মাটিতে বিছিয়ে দিবে এবং এর উপর বসবে।'

হাদীস নং- ১৫ : আবূ দাউদ হযরত ইবরাহীম নাখঈ থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ اِفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى حَتّٰى اسْوَدَّ ظَهْرُ قَدَمِهِ

'তিনি বলেন, যখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযে বসতেন তখন স্বীয় বাম পা বিছিয়ে দিতেন। এমনকি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পা মোবারকের পিঠ কালো হয়ে গিয়েছিলো।'

হাদীস নং- ১৬ : বায়হাকী সাইয়িদুনা আবূ সাঈদ খুদরী (রাদ্বি.) থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যার শেষের কয়েকটি শব্দ এরূপ

فَاِذَا جَلَسَ فَلْيَنْصِبْ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَ لِيَخْفِضْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى

যখন নামাযে বসবে তখন, ডান পা খাঁড়া রাখবে এবং বাম পা বিছায়ে দিবে।

হাদীস নং ১৭: তাহাবী শরীফে হযরত ওয়ায়েল ইবনে হাজার (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত আছে।

قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَاَحْفَظَنَّ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا قَعَدَ

www.AmarIslam.com

لِلتَّشَهُّدِ فَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰي ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا

'তিনি বলেন, আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছে নামায আদায় করেছি। আর মনে মনে বলেছি, আমি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নামায আত্মস্থ করবো। তিনি বলেন, যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আত্তাহিয়্যাত এর জন্য বসেন; বাম পা বিছিয়ে দিলেন। অতঃপর এর উপর বসে গেলেন।'

হাদীস নং- ১৮ : তাহাবী হযরত আবূ হুমাইদ সাইদী থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। যার শেষের শব্দগুলো এরূপ-

فَاِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ اَضْجَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى عَلٰى صَدْرِهَا وَيَتَشَهَّدُ-

'যখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আত্তাহিয়্যাতের জন্য বসেন তখন তিনি স্বীয় বাম পা বিছিয়ে দিলেন। আর ডান পা-এর সামনের অংশ খাড়া করলেন এবং আত্তাহিয়্যাত পড়লেন।'

এ আঠারটি হাদীস উদাহরণ স্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে। নয়তো এ সম্পর্কে প্রচুর হাদীস রয়েছে। ঐ সব হাদীসের মধ্যে আত্তাহিয়্যাতের উল্লেখ রয়েছে, প্রথম দ্বিতীয় এর কোন শর্ত নেই। বুঝা গেল যে, পুরুষ আত্তাহিয়্যাত পড়ার সময় বাম পায়ের উপর বসবে। মেয়েদের মতো উভয় পা এক দিকে বের করে মাটির উপর বসবে না।'

বিবেকের চাওয়াও এটা যে, দ্বিতীয় আত্তাহিয়্যাতেও বাম পায়ের উপর বসবে। কেননা এ ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য যে, প্রথম আত্তাহিয়্যাতে পুরুষ বাম পায়ের উপর বসবে এবং উভয় সিজদার মাঝখানেও একই ভাবে বসবে। শেষ বৈঠকে লা-মাযহাবীদের ভিন্নমত রয়েছে। প্রথম আত্তাহিয়্যাতে বসা ওয়াজিব এবং উভয় সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে বসা ফরয। দ্বিতীয় আত্তাহিয়্যাতে বসা যদি ফরয মনে কর, তাহলে তা দু'সিজদার মাঝখানে বৈঠকের মতোই হওয়া উচিত। অর্থাৎ বাম পায়ের উপর বসা। আর যদি এ বৈঠককে ওয়াজিব মান, তাহলে তা প্রথম আত্তাহিয়্যাতের বৈঠকের মতোই হওয়া উচিত। অর্থাৎ বাম পায়ের উপর, এটা কেমন যে, ঐ দু'বৈঠক বাম পায়ের উপর হবে আর এ শেষ বৈঠক মাটির উপর বসে উভয় পা একদিকে বের করে দেয়া। এধরনের উদাহরণ নামাযে পাওয়া যায় না। মোটকথা বাম পায়ের উপর বসা ক্বিয়াস সমর্থিত। আর মাটির উপর

নিতম্ব রেখে বসা আক্বল (বিবেক) ও নক্বল (দলীল) সব কিছুরই বিপরীত। এর থেকে বেঁচে থাকা উচিত। স্মর্তব্য যে, মেয়েরা যমীনের উপর নিতম্ব রেখে উভয় পা ডান দিকে বের করে বসে থাকে। তারা প্রথম আত্তাহিয়্যাতেও এ ভাবে বসে। এবং দু'সিজদার মাঝেও একই ভাবে বসে। এ জন্য এ ভাবে বসা ক্বিয়াস সম্মত। কারণ তার সব বৈঠকই এভাবেই। মোটকথা মেয়েদের সকল বৈঠক মাটির উপর এবং পুরুষদের সকল বৈঠক বাম পায়ের উপর। অবুঝ লা-মাযহাবীদের এ দু 'ধরনের বৈঠকের কোন ভিত্তি নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলার উপর আপত্তি ও জবাবসমূহ

এ পর্যন্ত এ মাসআলা প্রসঙ্গে ওহাবী গায়রে মুক্বাল্লিদদের যে সব দলীলাদি আমরা পেয়েছি,সব গুলোর জবাব উপস্থাপন করছি। রব তায়ালা কবূল করুন। আমীন।

আপত্তি নং- ১ : তাহাবী হযরত ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন-

أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهَمُ الْجُلُوسَ فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَثَنّٰى رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَجَلَسَ عَلٰى وَرْكِهِ الْيُسْرٰى وَلَمْ يَجْلِسْ عَلٰى قَدَمَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَرَانِىْ هٰذَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰه بْنِ عُمَرَ وَ حَدَّثَنِىْ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللّٰهِ اِبْنَ عَمَرَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ-

'কাসিম ইবনে মুহাম্মদ লোকদেরকে নামাযে বসার নিয়ম দেখিয়েছেন, তিনি তাঁর ডান পা খাড়া করলেন আর বাম পা বিছিয়ে দিলেন। এবং তাঁর বাম নিতম্বের উপর বসলেন। তিনি তাঁর উভয় পায়ের উপর বসলেন না। অতঃপর কাসিম ইবনে মুহাম্মদ বললেন, এ ভাবেই আমাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ উমর ইবনে ওমর দেখিয়েছেন। আর আমাকে এও খবর দিয়েছেন যে, তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) ও এরূপই করতেন।'

এর দ্বারা বুঝা গেল, উভয় পা ডান দিকে বের করে মাটির উপর বসা সাহাবায়ে কিরামের সুন্নাত। আর সাহাবায়ে কিরাম এ আমল এ জন্যই করেছেন যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এরূপই করতে দেখেছেন।

জবাব : এর কয়েকটি জবাব রয়েছে। **এক,** এ হাদীসটি আপনাদেরও

বিরোধী। কেননা এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, সাইয়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) নামাযের প্রত্যেক আত্তাহিয়্যাতে এ ভাবেই বসতেন। অথচ আপনারা বলছেন যে, প্রথম আত্তাহিয়্যাতে বাম পায়ের উপর বসবে; দ্বিতীয় বার এ ভাবে বসবে। তাই এ হাদীসটি আপনাদেরও বিরোধী।

দুই : এ হাদীসটি ঐ রিওয়ায়াতের বিপরীত,যা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে উপস্থাপন করেছি। অর্থাৎ সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) উভয় আত্তাহিয়্যাতে বাম পায়ের উপর বসতেন। ঐ হাদীসটি পরিপূর্ণ শক্তিশালী ছিলো। এ হাদীসটি সনদের দিক থেকেও যঈফ তথা দুর্বল। শরীয়তের কিয়াসেরও বিরোধী। আর যখন কয়েকটি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়,তখন যে হাদীস শরীয়তের ক্বিয়াস সম্মত হয়,সেটাই প্রাধান্য পায়।

তিন ঃ এ হাদীস দ্বারা আপনাদের অভিমত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। কেননা এতে এটা সুস্পষ্ট নয় যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) উভয় পা ডান দিকে বের করে মাটির উপর নিতম্ব রেখে বসতেন। এটাই আছে যে, উভয় পায়ের উপর বসতেন না। বাস্তবতা হলো নামাযী উভয় পায়ের উপর বসে না বরং শুধুমাত্র এক পা তথা বাম পায়ের উপর বসে। তাই এ হাদীসে আপনাদের পক্ষে কোন দলীল নেই।

আপত্তি নং- ২ : তাহাবী ও আবূ দাউদ, মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আতা থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। যার সারমর্ম এই-

سَمِعْتُ اَبَاحُمَيْدِ السَّاعِدِىَّ فِىْ عَشَرَةٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ فِى الْجَلْسَةِ الْاَوْلٰى يُثْنِىْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتّٰى اِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِىْ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِهَا التَّسْلِيْمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ فَقَالُوْا جَمِيْعًا صَدَقْتَ-

'আমি আবূ হুমাইদ সাইদীকে দশজন সাহাবীর একটি দলে বলতে শুনেছি, আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামায সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশী অবগত। অতঃপর বললেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথম আত্তাহিয়্যাতে স্বীয় বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং এর উপর বসতেন। আর যখন সিজদায় যেতেন যার শেষে সালাম রয়েছে- তখন স্বীয় বাম পা একদিকে

বের করে দিতেন এবং বাম নিতম্বের উপর ভর দিয়ে মাটিতে বসবেন। তখন সাহাবায়ে কিরাম বললেন, তুমি সত্য বলেছো।'

এ হাদীসে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে, প্রথম আত্তাহিয়্যাতে পায়ের উপর আর দ্বিতীয় আত্তাহিয়্যাতে মাটির উপর বসা সুন্নাত। এবং আবূ হুমাইদ সাইদী এ হাদীসটিকে দশজন সাহাবীর একটি দলে উল্লেখ করেছেন। এবং তারা সবাই একে সত্যায়িত করেছেন। বুঝা গেল যে, সমস্ত সাহাবীর সে পদ্ধতিই ছিলো,যার উপর আমরা আমল করে থাকি। (এটা গায়রে মুকাল্লিদ ওহাবীদের গর্ব করার মতো হাদীস।)

আবূ হুমাইদ সাইদীর সহীহ হাদীস ওটাই,যা তাহাবী শরীফ এ অধ্যায়ে আব্বাস ইবনে সাহাইল এর রিওয়ায়াতে বর্ণনা করেছে, যা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি, যেটাতে তিনি বলেছেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসতেন এবং আত্তাহিয়্যাত পড়তেন। আফসোসের বিষয়- আপনারা এমন বাজে এবং যঈফ তথা দুর্বল বরং মিথ্যাবাদী রাবীদের বর্ণনার উপর নিজেদের মাযহাবের ভিত রচনা করছো। আর যখন হানাফীরা নিজেদের সমর্থনে সহীহ হাদীস পেশ করে,তখন এর উপর তাল বাহানা করে, 'যঈফ' 'যঈফ' বলে চিৎকার শুরু করো এবং যদি এ হাদীসকে সহীহ মেনেও নেয়া হয়, তাহলে তা আগের ঐ সব হাদীসের বিরোধী হয়ে যায়, যা আমরা উপস্থাপন করেছি। যেহেতু আমাদের সমস্ত হাদীস শরীয়তের ক্বিয়াসে সমর্থনের দ্বারা শক্তি অর্জন করেছে,সেহেতু ওটাই আমলযোগ্য। এ হাদীসটি (উপরোল্লেখিত) আমলের অযোগ্য।

আপত্তি নং- ৩ : তিরমিযী শরীফ হযরত আব্বাস ইবনে সুহাইল সাইদী থেকে বর্ণনা করে-

قَالَ اجْتَمَعَ أَبُوْ حُمَيْدٍ وَأَبُوْ اُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنِ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنِ مَسْلَمَةٍ فَذَكَرُوْا صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ يَعْنِىْ لِلتَّشَهُّدِ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَاَقْبَلَ الْيُمْنٰى عَلٰى قِبْلَتِهٖ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُمْنٰى وَكَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰي، وَأَشَارَ بِاَصْبُعِهٖ يَعْنِى السَّبَابَةَ-

'একবার আবূ হুমাইদ, আবূ উসাইদ, সাহল ইবনে সা'দ ও মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা একত্রিত হলেন। তাঁরা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামায সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন আবূ হুমাইদ বলতে লাগলেন, আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামায প্রসঙ্গে আপনাদের চেয়ে বেশী জানি। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আত্তাহিয়্যাতের জন্য বসলেন। তখন তিনি স্বীয় বাম পা বিছিয়ে দিলেন আর ডান পায়ের সামনের অংশ কিবলার দিকে করলেন। ডান হাতের তালু ডান হাটুর উপর রাখলেন আর বাম হাতের তালু বাম হাঁটুর উপর রাখলেন এবং স্বীয় আঙ্গুলী (শাহাদাত আঙ্গুল) দ্বারা ইশারা করলেন।'

এ হাদীসের মাধ্যমে বুঝা গেলো যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ভাবে আত্তাহিয়্যাতে বসতেন,যে ভাবে আমরা বসে থাকি। নয়তো তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডান পায়ের বুক কিবলার দিকে হতো না, যদি তা খাড়া হতো।

জবাব : এ আপত্তির কয়েকটি জবাব রয়েছে। **এক,** এ হাদীসটি আপনাদেরও বিরোধী। কেননা এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক আত্তাহিয়্যাতে মাটির উপর বসতেন। আপনার-াতো প্রথম আত্তাহিয়্যাতে বাম পায়ের উপর বসে থাকেন। দ্বিতীয় আত্তাহিয়্যাতে মাটির উপর। এটা কেন? আপনারা যে উত্তর দিবে, তা-ই আমাদের উত্তর হবে। এখন চিন্তা করে দেখুন।

দুই, আপনাদের আত্তাহিয়্যাতে তিনটি কাজ হয়। বাম পা ডান দিকে বের করা, ডান পা খাঁড়া হওয়া, মেয়েদের মতো নিতম্ব মাটির সাথে লাগা। উল্লেখিত হাদীসে এ তিনটি বিষয়ের একটিও প্রমাণিত নয়। না বাম পা ডান দিকে বের করা, না নিতম্ব মাটির উপর রাখা, না ডান পা খাড়া হওয়া। আশ্চর্যের বিষয় এ হাদীসটিকে আপনারা আপনাদের পক্ষে কিভাবে মনে করলেন? ডান পায়ের সামনের অংশ দ্বিতীয় রাকআতে কিবলার দিকে হওয়া আপনাাদেরও বিরোধী।

তিন, আবূ হুমাইদ সাইদীর এ হাদীসটি ঐ সব হাদীসের বিপরীত, যা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। এমনকি স্বয়ং আবূ হুমাইদ সাইদী থেকেও এর বিপরীত বর্ণিত রয়েছে। ঐ সব হাদীস এ হাদীস থেকে বেশী শক্তিশালী। যেমন আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে এবং এ পরিচ্ছেদেও আলোকপাত

করেছি। তাই ঐ হাদীসগুলো আমলযোগ্য আর এটা আমলের অযোগ্য।

চার, তিরমিযী শরীফে একই স্থানে হযরত আবূ ওয়াইলের ঐ হাদীসও বিদ্যমান, যে টাতে হানাফীদের মতো বসার কথা উল্লেখিত রয়েছে। এ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীস হাসান, সহীহ এবং বললেন, অধিকাংশ আলেমের এর উপরই আমল। আপনারা এমন সহীহ ও সুস্পষ্ট হাদীসকে কেন ছেড়ে দিলেন? আর এ মুজমাল হাদীসের উপর আমল করলেন,যা আপনাদের সমর্থক নয়। বুঝা গেল যে, আপনারা হাদীসের অনুসারী নও, নিজের মতের অনুসরণ করেন আপনারা আপনাদের নাম আহলে হাদীস না রেখে আহলে রা'য়' (ধারনার অনুসরণকারী) অথবা 'আহলে জিদ' রাখলে যথাযথ হতো।

আপত্তি নং-৪ : বাম পায়ের উপর বসা সম্পর্কিত যে সব হাদীস আপনারা পেশ করেছেন সব গুলোই 'যঈফ' তথা দুর্বল, দলীল হওয়ার উপযুক্ত নয়। (পুরোনো প্রলাপ)

জবাব : কোন হানাফীকে আপনাদের এ মন্ত্র দিয়ে ভয় দেখাতে পারবে না। হানাফীদের উপর রিওয়ায়াত 'যঈফ' হওয়ার কোন প্রভাব পড়ে না। আল হামদুলিল্লাহ হানাফীরা এত বেশী হাদীস পেশ করে থাকে যে, সে সব তার সব গুলোই যদি যঈফ হয়,তবুও শক্তিশালী হয়ে যায়। উপরন্তু ইমামে আযমের মতো উঁচু মর্যাদার মুজতাহিদ, উম্মতের প্রদীপের অভিমত দেওয়াটাই এর শক্তিশালী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। হানাফী মাযহাবের জন্য এ বর্ণনাগুলো দলীল নয়। এ গুলো হচ্ছে নিছক সমর্থনের জন্যই। ইমামের কথাই হানাফীদের দলীল। আমাদের ঈমান কুরআনুল করীমের উপর যেমনি,তেমনি সুন্নাতের উপরও আবার উম্মতের ইজমার তথা ঐকমত্য ও মুজতাহিদের ক্বিয়াসের উপরও রয়েছে। আমাদের সামনে এ আয়াতে করীমা বিদ্যমান-

أَطِيْعُوا اللّٰهِ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

'তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং রাসূলের আর তোমাদের মধ্য থেকে উলুলআমরদের (উম্মতের মুজতাহিদগণের)।'

দশম অধ্যায়

বিশ রাকআত তারাবীহ

আমি বিশ রাকআত তারাবীহ প্রসঙ্গে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা লিখেছি। যার নাম 'লুমআতুল মাছাবীহ আলা রাকআতিত তারাবীহ।' এতে অনেকটা বিস্তারিত ভাবেই এ মাসআলা বর্ণনা করেছি। এ গ্রন্থকে পরিপূর্ণ করতে এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে যথসামান্য আলোকপাত করা হচ্ছে। যারা বিস্তারিত দেখতে চান, তারা আমার উপরোল্লেখিত পুস্তিকা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

স্মর্তব্য যে, সমস্ত উম্মাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ বিষয়ের উপর ঐকমত্য রয়েছে যে, তারাবীহ আট রাকআত নয়। হ্যাঁ অধিকাংশ মুসলমান পড়ে থাকে বিশ রাকআত। আবার কেউ কেউ পড়ে চল্লিশ রাকআত। কিন্তু লা-মাযহাবী এমন একটি দল যাদের উপর নামায খুবই ভারী। পুরোপুরি পড়া নফসের উপর বোঝা মনে করে শুধু মাত্র আট রাকআত তারাবীহ পড়ে থাকে। আর কিছু রিওয়ায়াতকে বাহানা হিসাবে দাঁড় করায়। এ জন্য আমরা এ মাসআলাকে দু'টি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করছি। প্রথম পরিচ্ছেদে বিশ রাকআত তারাবীহ সংক্রান্ত দলীলাদি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে লা-মাযহাবীদের আপত্তিসমূহের জবাব। রব তাআলা কবূল করুন। আমীন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিশ রাকআত তারাবীহ'র প্রমাণ

বিশ রাকআত তারাবীহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরাম ও সমস্ত মুসলমানদের সুন্নাত। আট রাকআত তারাবীহ সুন্নাতের বিরোধী। দলীলাদি লক্ষ্য করুন-

হাদীস নং- ১-৫ : ইবনে আবী শায়বাহ, তাবরানী গ্রন্থে, বায়হাকী, আব্দ ইবনে হুমাইদ এবঙ ইমাম বগবী প্রমুখ সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

إِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ كَـانَ يُصَلِّىْ فِىْ ...

عِشْرِيْنَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ وَزَادَ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ–

'নিশ্চয়ই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাদ্বান মাসে বিত্‌র ছাড়া বিশ রাকআত পড়তেন। বায়হাকী একথাটি অতিরিক্ত বলেছেন যে, জামাআত ব্যতীত তারাবীহ পড়তেন।'

এ হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা গেল যে, স্বয়ং হুযূর আনওয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশ রাকআত তারাবীহ পড়তেন। যে সব রিওয়ায়াতে এসেছে যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধুমাত্র তিন দিন তারাবীহ পড়েছেন সেখানে জামায়াতের সাথে পড়াটাই উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ জামায়াত ছাড়া তো সব সময় পড়তেন; জামায়াতের সাথে শুধুমাত্র তিন দিন পড়েছেন। ফলে হাদীসগুলোর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। এটাও প্রতিভাত হলো যে, তারাবীহ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ আলাল আইন'। কারণ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সব সময় পড়েছেন। আর লোকদেরকে পড়তে উৎসাহিতও করেছেন।

হাদীস নং- ৬ : ইমাম মালিক হযরত ইয়াযীদ ইবনে রূমান থেকে বর্ণনা করেন-

كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِىْ زَمَنِ عُمَرَابْنِ الْخَطَّابِ فِى رَمْضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ رَكْعَةً–

'হযরত উমর (রাদ্বি.) এর সময়ে রামাদ্বানে লোকেরা তেইশ রাকআত পড়তেন।' এর দ্বারা দুটো মাসআলা বুঝা গেল। এক, তারাবীহ বিশ রাকআত। দুই, বিত্‌র তিন রাকআত। এই জন্য মোট তেইশ রাকআত হলো।

হাদীস নং- ৭ : বায়হাকী 'মা'রিফাহ' গ্রন্থে সহীহ সনদে হযরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ كُنَّانَقُوْمُ فِىْ عَهْدِ عُمَرَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ

'আমরা সাহাবীরা হযরত উমর (রাদ্বি.) এর সময় বিশ রাকআত এবং বিত্‌র পড়তাম।'

হাদীস নং- ৮ : ইবনে মুনী' হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّىَ بِاللَّيْلِ فِىْ رَمْضَانَ قَالَ إِنَّ

النَّاسَ يَصُوْمُوْنَ النَّهَارَ وَلَايُحْسِنُوْنَ أَنْ يَّقْرَءُوْا فَلَوْقَرَأْتَ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ قَالَ يَاأَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هٰذَا شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ وَلٰكِنَّهُ حَسَنٌ فَصَلّٰى بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً-

'হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাদ্বি.) তাঁকে(উবাই (রাদ্বি.) কে) রামাদ্বানের রাত্রিতে তারাবীহ পড়তে নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, 'লোকেরা দিনে রোযা রাখার কারণে ভাল ভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেনা। তুমি তাদেরকে রাত্রিতে কুরআন পাঠ করালে ভাল হয়।' তখন হযরত উবাই ইবনে কা'ব বললেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! এ রেওয়াজতো ইতিপূর্বে ছিলো না।' উমর (রাদ্বি.) বললেন, 'তাতো আমি জানি, কিন্তু এটাতো একটা উত্তম কাজ।' এরপর হযরত উবাই (রাদ্বি.) তাদেরকে বিশ রাকআত পড়ালেন।'

এ হাদীসখানা দ্বারা কয়েকটি মাসআলা জানা গেল। **প্রথমত :** ফারূকে আযম (রাঃ) এর আগেও মুসলমানদের মধ্যে তারাবীহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিশেষভাবে জামায়াতের সাথে সব সময় তারাবীহর রেওয়াজ হযরত উমর (রাদ্বি.) এর খিলাফতের সময় থেকেই শুরু হয়েছে। মূলতঃ তারাবীহ হচ্ছে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত। আর জামাআতের সাথে গুরুত্ব সহকারে সব সময় পড়া ফারূকে আযমের (রাদ্বি.) সুন্নাত।

দ্বিতীয়ত : বিশ রাকআত তারাবীহ্'র উপর সমস্ত সাহাবীর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাদ্বি.) সাহাবীদেরকে বিশ রাকআত পড়িয়েছেন; সাহাবীগণ পড়েছেন। কেউ আপত্তি করেন নি।

তৃতীয়ত : 'বিদআতে হাসানাহ' (নবসংযোজিত ভাল কাজ) একটি উত্তম বিষয়। কারণ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাদ্বি.) আরয করলেন, হুযূর তারাবীহ নির্দিষ্ট নিয়মে দলবদ্ধ ভাবে গুরুত্ব সহকারে পড়া বিদআত, ইতিপূর্বে হয়নি। ফারূকে আযম (রাদ্বি.) বললেন, তা ঠিক, বাস্তবিকই এটা বিদআত, তবে উত্তম বিদআত।

চতুর্থত: যে কাজ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যামানায় ছিল না, তা বিদআত। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের সময়ে অর্থাৎ তারাবীহ্'র জামাআত ফারূকে আযমের সময়ে প্রচলিত হলেও 'বিদআতে হাসানাহ' বলা হয়েছে।

হাদীস নং- ৯: বায়হাকী স্বীয় সুনানে হযরত আবূ আবদির রহমান সুলামী

(রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

أَنَّ عَلِيَّ بْنِ أَبِىْ طَالِبِ دَعَا الْقُرَّاءَ فِىْ رَمْضَانَ وَأَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَكَانَ عَلِيٌّ يُوْتِرُ بِهِمْ-

'হযরত আলী (রাদ্বি.) রামাদ্বান শরীফে কারীদেরকে ডাকলেন। তন্মধ্যে একজনকে লোকদের বিশ রাকআত পড়ানোর নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী (রাদ্বি.) তাদেরকে বিত্র পড়াতেন।

হাদীস নং- ১০ : বায়হাকী হযরত আবুল হাসনা থেকে বর্ণনা করেন-

أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِىْ طَالِبِ أَمَرَ رَجُلًا يُّصَلِّىْ بِالنَّاسِ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً-

'হযরত আলী (রাদ্বি.) এক ব্যক্তিকে লোকদেরকে পাঁচ তারাবীহ্ তথা বিশ রাকআত পড়াতে নির্দেশ দিলেন।'

উদাহরণ স্বরূপ কিছু হাদীস পেশ করা হলো। নয়তো বিশ রাকআত তারাবীহ'র অনেক হাদীস রয়েছে। ইচ্ছা হলে আমার প্রণীত 'লুমআতুল মাসাবীহ্' ও সহীহ বুখারী শরীফ দেখুন।

বিবেকের চাওয়াও এটা যে, তারাবীহ বিশ রাকআত হওয়া, আট রাকআত নয়। আর তা কয়েকটি কারণে- প্রথমত : দিনেও রাতে ফরয ও ওয়াজিব মিলিয়ে মোট বিশ রাকআত। সতেরো রাকআত ফরয এবং তিন রাকআত ওয়াজিব। রামাদ্বানে মাসে বিশ রাকআত পড়া হয় ঐ বিশ রাকআতের পরিপূর্ণতা দান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। তাই আট রাকআত তারাবীহ কিয়াসের পরিপন্থী।

দ্বিতীয়ত : সাহাবায়ে কিরাম তারাবীহ্'র প্রতি রাকআতে এক রুকূ তিলাওয়াত করতেন। এমনকি কুরআনে করীমের রুকুকে এ জন্য রুকু বলা হয় যে, এতটুকু আয়াত পড়ার পরে হযরত উমর, ওসমান ও সাহাবায়ে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) তারাবীহ নামাযে রুকূ করতেন এবং সাতাশতম রাত্রিতে খতমে কুরআন হতো। আট রাকআত হলে কুরআনে করীমের মোট রুকু হবে 'দুইশত ষোল'। অথচ কুরআনে করীমের মোট রুকূ 'পাঁচশত সাতান্ন'। বিশ রাকআত হিসেবে হয় ৫৪০ (পাঁচশত চল্লিশ) রুকূ। কোন লা-মাযহাবী আট রাকআত তারাবীহ মেনে নিয়ে কুরআনে করীমের রুকুর সংখ্যার কারণ বলুন।

তৃতীয়ত : تَرَاوِيْحُ শব্দটি تَرْوِيْحَةٌ এর বহুবচন। প্রতি চার রাকআত অন্তর কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম নেয়াকে تَرْوِيْحَةٌ বলা হয়। যদি তারাবীহ আট রাকআত হতো তখন মাঝখানে একবার تَرْوِيْحَةٌ তথা বিশ্রাম হতো। তাহলে এর নাম বহুবচন হিসাবে تَرَاوِيْحُ (তারাবীহ) হতো না। কমপক্ষে তিনের ক্ষেত্রেই বহুবচন ব্যবহার করা হয়।

উলামায়ে উম্মতের আমল সকল যুগেই এমনকি প্রায় সব মুসলমানের আমল বিশ রাকআত তারাবীহ'র উপর ছিল এবং আজো আছে। হারামাইন শরীফাইন এবং সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানগণ বিশ রাকআত তারাবীহই পড়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ তিরমীযি শরীফে 'বাবু কিয়ামি শাহরি রামাদ্বানে' এভাবে বলা হয়েছে-

وَاَكْثَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ عَلٰى مَارُوِىَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هٰكَذَا اَدْرَكْتُ بِبَلَدِ مَكَّةَ يُصَلُّوْنَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً-

'এবং অধিকাংশ আলিমের আমল এর উপর যা হযরত উমর, আলীও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ বিশ রাকআত তারাবীহ। আর এটাই সুফয়ান ছাওরী, ইবনুল মুবারক, ও ইমাম শাফিঈর অভিমত। ইমাম শাফিঈ (রা:) বলেন, আমি মক্কাবাসীদেরকে বিশ রাকআত তারাবীহ পড়তে দেখেছি।' সহীহ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'উমদাতুল ক্বারী' (পঞ্চম খন্ড, পৃষ্ঠা : ৩৫৫) তে বলা হয়েছে-

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ وَبِهِ قَالَ الْكُوْفِيُّوْنَ وَالشَّافِعِيُّ وَاَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ عَنْ اُبَيِّ ابْنِ كَعْبٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ-

'ইবনে আবদিল বার বলেন, বিশ রাকআত তারাবীহই জামহুরের অভিমত। এটাই কুফাবাসীগণ, ইমাম শাফিঈ ও অধিকাংশ ফক্বীহ বলেছেন। এবং এটাই সহীহ তথা বিশুদ্ধ যা উবাই ইবনে কা'ব (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই।'

'শরহে নিক্বায়াহ' গ্রন্থে মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বিশ রাকআত তারাবীহ

প্রসঙ্গে বলেন-

فَصَارَ اِجْمَاعًا لِمَارَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ كَانُوْا يُقِيْمُوْنَ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَعَلٰى عَهْدِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ-

'বিশ রাকআত তারাবীহ'র ব্যাপারে সকল মুসলমানের ঐক্যমত্য রয়েছে। যেমন বায়হাকী সহীহ সনদে বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কিরাম এবং সকল মুসলমান হযরত উমর, আলী ও ওসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) এর সময়ে বিশ রাকআত তারাবীহ পড়তেন।'

'আল্লামা ইবনে হাজর মাযনামী' বলেন,

اِجْمَاعُ الصَّحٰبَةِ عَلٰى اَنَّ التَّرَاوِيْحَ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً

'সকল সাহাবীর এটার উপর ঐকমত্য রয়েছে যে, তারাবীহ বিশ রাকআত।'

এ সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে বুঝা গেল বিশ রাকআত তারাবীহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত। এ ব্যাপারে সকল সাহাবীর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত এবং এটার উপর সকল মুসলমানের আমল। বিশ রাকআত তারাবীহ হারামাইন শরীফাইনে পড়া হয়। বিশ রাকআত তারাবীহ বিবেকের চাহিদা। বিশ রাকআত তারাবীহ কুরআনে করীমের রুকূগুলোর সংখ্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বরং বর্তমানে যদিও হারামাইন শরীফাইনে নাজদীদের শাসন চলছে তবুও সেখানে আজও বিশ রাকআত তারাবীহ পড়া হয়ে থাকে। যার ইচ্ছা হয় গিয়ে দেখে আসতে পারে। আমাদের এখানকার বোকা লা-মাযহাবী গায়রে মুকাল্লিদরা কার তাকলীদ করে যে আট রাকআত তারাবীহ পড়ে!

আট রাকআত তারাবীহ সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সুন্নাতে সাহাবা (রাদ্বি.), সমস্ত মুসলমানের সুন্নাত, উলামা মুজতাহিদীনের সুন্নাত এবং হারামাইনে তাইয়িবাইনের সুন্নাতের বিরোধী। তবে হাঁ! প্রবৃত্তির চাহিদার অনুকূলে। কারণ নামায নাফসে আম্মারার (দুষ্ট প্রবৃত্তি) উপর বোঝা। রব তাআলা নাফসে আম্মারা'র ফাঁদ থেকে রক্ষা করে সুন্নাতে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশ রাকআত তারাবীহ'র উপর আপত্তি ও জবাব সমূহ

বাস্তবতা হলো, লা-মাযহাবীদের কাছে আট রাকআত তারাবীহ'র পক্ষে কোন মজবুত দলীল নেই। রয়েছে কিছু উদ্ভট কল্পনা ও ভ্রান্ত ধারণা। ওসব উল্লেখ করতেও মন চায়নি। কিন্তু আলোচনার পরিপূর্ণতা দানের জন্য তাদের আপত্তি সমূহ জবাব সহ উপস্থাপন করছি। রব তাআলা তাদেরকে হিদায়াত দান করুন।

আপত্তি নং- ১ : ইমাম মালিক সাইব ইবনে যায়ীদ থেকে বর্ণনা করেন-

أَنَّهُ قَالَ اَمَرَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّاب اُبَىَّ بْنِ كَعْبٍ وَتَمِيْمَ الدَّارِى أَنْ يَقُوْمَ لِلنَّاسِ بِاِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً (الخ)

'তিনি বলেন, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাদ্বি.) হযরত উবাই ইবনে কা'ব ও তামীম আদ্‌দারী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) কে নির্দেশ দিয়েছেন লোকদেরকে এগার রাকআত নামায পড়াতে। এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো, হযরত ফারূকে আযম (রাদ্বি.) আট তারাবীহ'র হুকুম দিয়েছে। তারাবীহ বিশ রাকআত হলে বিত্‌র সহ মোট তেইশ রাকআত হতো।

জবাব : এর কয়েকটি জবাব রয়েছে। **প্রথমত:** এ হাদীসটি আপনাদেরও সম্পূর্ণ বিরোধী। কেননা, এর দ্বারা আট রাকআত তারাবীহ্‌র পাশাপাশি তিন রাকআত বিতরও প্রমাণিত হয়েছে। তারপরেই তো মোট রাকআত এগারো হলো। অর্থাৎ আট রাকআত তারাবীহ,তিন রাকআত বিতর। যদি বিতর এক রাকআত হতো তখন মোট নয় রাকআত হতো, এগারো রাকআত নয়। এখন বলুন,আপনারা বিতর এক রাকআত কেন পড়েন? একই হাদীসের কিছু অংশের স্বীকৃতি আর কিছু অংশের বিরোধীতা? অতএব এ রিওয়ায়াতের যে জবাব আপনারা দেবেন,তাই আমাদের জবাব হবে।

দ্বিতীয়ত : এ হাদীসের রাবী (বর্ণনাকারী) মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের বর্ণনাগুলোর মধ্যে প্রচন্ড গরমিল। মুয়াত্তা ইমাম মালিকের এ বর্ণনায় তাঁর (মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ) থেকে এগার রাকআত উদ্ধৃত হয়েছে, মুহাম্মদ ইবনে নাসর মারওযী তাঁর থেকে তের রাকআত বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস আবদুর রাযযাক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাঁর থেকে একুশ রাকআত উদ্ধৃত করেছেন। দেখুন বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী', চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৮০, ছাপাঃ মাতবায়ে খায়রিয়া,মিসর। তাই তাঁর (মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ) কোন রিওয়ায়াত বিবেচ্য নয়। আশ্চর্যের বিষয় আপনারা নিজেদের দুষ্ট প্রবৃত্তির খাহেশ মিটানোর জন্য এ ধরনের মিথ্যা বর্ণনাগুলোর আশ্রয় নিচ্ছেন।

তৃতীয়ত : ফারূকে আযম (রাদ্বি.) এর সময়ে সর্বপ্রথম আট রাকআতের হুকুম দেয়া হয়েছিল। এরপর বারো রাকআত। তারপর স্থায়ী ভাবে বিশ রাকআতের উপর আমল করা হয়েছে। যেমন মুয়াত্তা ইমাম মালিকে' হযরত আ'রাজ থেকে একটি লম্বা হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যার শেষের কিছু শব্দ এরূপ-

وَكَانَ الْقَارِىْ يَقْرَأُ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِىْ ثَمَانِ رَكْعَاتٍ فَاِذَا اَقَامَهَا فِى اِثْنَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَاَى النَّاسُ اَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ-

'ক্বারী আট রাকআত তারাবীহ্‌তে সূরা বাক্বারাহ পড়তেন। এরপর যখন বারো রাকআতে পড়তে লাগলেন,তখন লোকেরা বুঝতে পারলো যে, তাঁদের উপর সহজ হয়ে গেলো।'

এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) মিরকাত শরহে মিশকাতে বলেন-

نَعَمْ ثَبَتَ الْعِشْرُوْنَ فِىْ زَمَنِ عُمَرَ وَفِى الْمُوْطَارِ وَايَةً بِاَحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً وَجُمِعَ بَيْنَهُمَا اَنَّهُ وَقَعَ اَوَّلاً ثُمَّ اسْتَقَرَّ الْاَمْرُ عَلَى الْعِشْرِيْنَ فَاِنَّهُ الْمُتَوَارِثُ-

'হ্যাঁ! বিশ রাকআতের হুকুম হযরত উমর (রাদ্বি.) এর যামানায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুয়াত্তা শরীফে এগারো রাকআতের উল্লেখ রয়েছে। এ দু'ধরনের বর্ণনার সামঞ্জস্যতা বিধান এ ভাবেই করা যায় যে, ফারূকে আযমের (রাদ্বি.) সময়ে প্রথমে আট রাকআতের নির্দেশ ছিলো এরপর বিশ রাকআতের উপর তারাবীহ'র হুকুম সাব্যস্ত হলো। এটাই মুসলমানদের মধ্যে বিধিবদ্ধ হয়েছে।'

বুঝা গেলো, আট রাকআত তারাবীহর উপর আমল পরিত্যাজ্য। বিশ রাকআত তারাবীহ সাহাবায়ে কিরাম এবং সমস্ত মুসলমানের মধ্যে কার্যকর।

আপত্তি নং- ২ : আপনাদের পেশকৃতত হাদীস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, হুযূর আনওয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশ রাকআত তারাবীহ

www.AmarIslam.com

পড়তেন। তাহলে হযরত উমর (রাদ্বি.) প্রথমে আট রাকআত তারাবীহর হুকুম কেন দিলেন। সুন্নাতের পরিপন্থী নির্দেশ দেয়া সাহাবায়ে কিরামের শান নয়।

জবাব : হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো স্বয়ং বিশ [illegible]আত তারাবীহ পড়েছেন কিন্তু সাহাবায়ে কিরামকে এর সংখ্যার ব্যাপারে সু[illegible]র্দেশ দেননি। শুধুমাত্র রামাদ্বানের রাতগুলোতে বিশেষ নামাযের প্রতি উ[illegible]িত করেছেন। বরং নিজেও সব সময় নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে জামায়াত পড়াননি। কার[illegible] হিসেবে তারাবীহ ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকাই ব্যক্ত করেছেন। এ জন্যই সাহাবায়ে কেরামের কাছে তারাবীহর রাকআত সংখ্যা স্পষ্ট হয়নি। হযরত উমর (রাদ্বি.) প্রথমে নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে আট এরপর বারো রাকআত নির্ধারিত করেছেন। বিশ রাকআতের সনদ পাওয়ার পর স্থায়ী ভাবে বিশ রাকআতেরই নির্দেশ দিয়ে দিলেন। ঐ সময়ে আজকের মতো কিতাবগুলোতে হাদীস একত্রিত অবস্থায় ছিলো না। একেকটি হাদীস অনেক চেষ্টা পরিশ্রমের পরই পাওয়া যেতো।

আপত্তি নং- ৩ : বুখারী শরীফে রয়েছে যে, হযরত সালমা উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা সিদ্দীকা (রাদ্বি.) এর কাছে জানতে চাইলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাদ্বানের রাত সমূহে কত রাকআত পড়তেন? তখন উম্মুল মু'মিনীন ইরশাদ করলেন-

مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلَافِىْ غَيْرِهٖ عَلٰى اِحْدٰى عَشَرَ رَكْعَاتٍ-

'হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাদ্বান ও রামাদ্বানের বাইরে এগারো রাকআত থেকে বেশী পড়তেন না। এর দ্বারা বুঝা গেল, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তারাবীহ আট রাকআত পড়তেন। যদি বিশ রাকআত পড়তেন তাহলে মোট তেইশ রাকআত হতো।

জবাব : এ আপত্তির কয়েকটি জবাব রয়েছে। **প্রথমত:** এ হাদীসটি আপনাদেরও বিরোধী। কারণ এর দ্বারা যদি আট রাকআত তারাবীহ সাব্যস্ত হয় তাহলে তিন রাকআত বিতরও প্রমাণিত হলো। এরপরই তো মোট এগারো রাকআত হয়েছে। বলুন, আপনারা বিতর এক রাকআত কেন পড়ে থাকেন? জবাব দিন, এটা কি হাদীসের এক অংশের স্বীকৃতি দান আর কিছু অংশের অস্বীকৃতি নয়?

দ্বিতীয়ত : হযরত উম্মুল মু'মিনীন এখানে তাহাজ্জুদ নামাযের কথাই উল্লেখ করেছেন, তারাবীহ নামাযের নয়। এ জন্যই তিনি বললেন যে, রামাদ্বান ও রামাদ্বান ভিন্ন অন্যান্য মাসে এগারো রাকআতের বেশী পড়তেন না। তারাবীহ রামাদ্বান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে পড়া হয়? আপনারা একথাটি চিন্তা করলে এ (আট রাকআত বলার) সাহস করতেন না। ইমাম তিরমিযী (রহ.) এ হাদীসটিকে 'সালাতুল লাইল অর্থাৎ তাহাজ্জুদ শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। এমনকি এ হাদীসেরই শেষে [illegible] হযরত আয়িশা সিদ্দীকাহ (রাদ্বি.) বললেন, আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে জানতে চেয়েছি- ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি বিতরের পূর্বে শুয়ে যান কেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হে আয়িশা! আমার চোখ ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না। এর দ্বারা জানা গেলো, সরকার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ নামায (বিতর) শেষ রাতে শোওয়ার পর পূনরায় উঠে আদায় করতেন। শোওয়ার পরে তারাবীহ পড়া হয় না তাহাজ্জুদ পড়া হয়।

তৃতীয়ত : যদি এ নামায দ্বারা তারাবীহ উদ্দেশ্য হয় এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আট রাকআত তারাবীহ পড়ে থাকেন, তাহলে হযরত ওমর (রাদ্বি.) বিশ রাকআত তারাবীহর নির্দেশ কেন দিলেন? আর সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বি.) এ নির্দেশ মেনে নিলেন কেন? এবং স্বয়ং উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাদ্বি.) সব কিছু দেখার পর কেন ঘোষণা কররেন না যে, 'আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আট রাকআত তারাবীহ পড়তে দেখেছি, অথচ আপনারা বিশ রাকআত পড়ছেন, এটা সুন্নাতের পরিপন্থী এবং বিদআতে সাইয়িআহ (মন্দ বিদআত)? কেন তিনি চুপ থাকলেন? একটু ভেবে দেখুন, হাদীসকে ভালো ভাবে বুঝার চেষ্টা করুন।

লা-মাযহাবীদের কাছে প্রশ্ন : সারা পৃথিবীর লা-মাযহাবীদের প্রতি নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো রইল। সবাই মিলে এ গুলোর জবাব দিন।

(১) আপনারা বলে থাকেন আট রাকআত তারাবীহ সুন্নাত। বিশ রাকআত হলো 'বিদআত সাইয়িআহ এবং সুন্নাতের পরিপন্থী, তাহলে বলুন, হযরত উমর, উসমান ও আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) প্রমুখ বিশ রাকআতের হুকুম কেন দিয়েছেন? তাঁরা কি এ সুন্নাত সর্ম্পকে জানতেন না? আজ প্রায় চৌদ্দশত বছর পরে খুঁজে পেলেন?

(২) যদি (নাউযুবিল্লাহ) খোলাফায়ে রাশিদীন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) 'বিদআতে সাইয়িআহ্র নির্দেশ দিয়ে দেন, তাহলে সমস্ত সাহাবী (রাদ্বি.) বিনা দ্বিধায় কি ভাবে মেনে নিলেন? তাঁদের মধ্যে কেউ কি সত্যপন্থী ও সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন না? আজ এতোকাল পর আপনারা সত্যকথক আর সুন্নাতের অনুসারী হয়ে গেলেন?

(৩) যদি সমস্ত সাহাবী (রাদ্বি.) ও চুপ থাকেন তবুও উম্মুল মু'মিনীন আয়িশাহ সিদ্দীকা (রাদ্বি.) সুন্নাতে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিপন্থী একটি 'বিদআত সাইয়িআহ'র (!) প্রচলন দেখেও কেন চুপ থাকলেন? তাঁর উপর তো সত্য প্রচার করা ফরয ছিলো। আজ যেমন আপনারা আট রাকআত তারাবীহ'র জন্য মুখে কলমে শারীরিক ও আর্থিকভাবে জোরেসোরে অপপ্রচার চালাচ্ছেন, তিনিও তেমনটি করলেন না কেন? তাহলে আপনারা কি উম্মুল মু'মিলীনের চেয়ে উত্তম হয়ে গেলেন?

(৪) খোলাফায়ে রাশিদীন এবং সমস্ত সাহাবী এমনকি স্বয়ং উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লুহু আনহুম) বিশ রাকআত তারাবীহ পড়ে, পড়িয়ে কিংবা প্রচলন হতে দেখে চুপ থেকে হিদায়াতের উপর ছিলেন, নাকি গোমরাহীর উপর? (নাউযুবিল্লাহ) যদি বর্তমানে হানাফীরা বিশ রাকআত তারাবীহ পড়ার কারণে পথভ্রষ্ট ও বিদআতী হয়ে থাকেন, তাহলে এ সম্মানিত ব্যক্তিগণের ব্যাপারে তোমাদের ফাতওয়া কি? জবাব দিন! জবাব দিন! জবাব দিন!

(৫) যদি বিশ রাকআত তারাবীহ 'বিদআতে সাইয়িআহ' এবং আট রাকআত তারাবীহ সুন্নাত হয় আর আপনারা বাহাদুরগণ চৌদ্দশত বছর পর এ সুন্নাত প্রচলন করলেন, তাহলে বলুন! হারামাইনে তাইয়িবাইনের সমস্ত মুসলমান কি বিদআতী ও পথভ্রষ্ট? নাহলে কেন নয়? আর যদি হয়ে থাকেন তাহলে আপনারা আজ নজদী ওয়াহাবীদের কাছে এর তাবলীগ করছেন না কেন? আপনাদের সমস্ত ফাতওয়া শুধুমাত্র ভারত ও পাকিস্তানে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যই।

(৬) সম্মানিত ইমাম মুজতাহিদগণ এবং তাঁদের আনুগত্যকারী যাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ অলী, আলিম, মুহাদ্দিস, ফক্বীহগণ অন্তর্ভুক্ত- যারা সবাই বিশ রাকআত তারাবীহ পড়তেন, তাঁরা সবাই কি পথভ্রষ্ট?

(৭) যদি সম্মানিত ব্যক্তিগণ সবাই পথভ্রষ্ট হন আর আপনাদের একমুঠো পরিমাণ দলটি হিদায়াতের উপর হয়, তাহলে ঐ পথভ্রষ্টদের (?) কিতাবাদি

www.AmarIslam.com

থেকে হাদীস গ্রহণ করা- হাদীস পড়া জায়িয, না হারাম? আর তাঁদের হাদীস বর্ণনা সহীহ কিনা? যখন বদআমলকারী লোকদের রিওয়ায়াত বিশুদ্ধ না হয়, তাহলে বদ আক্বীদাহ সম্পন্ন লোকের রিওয়ায়াত কি ভাবে সহীহ হতে পারে?

(৮) সারা পৃথিবীর মুসলমান যারা বিশ রাকআত তারাবীহ পড়ে থাকেন, তাঁরা সবাই আপনাদের মতে পথভ্রষ্ট ও বিদআতী কিনা? যদি হন তাহলে এ হাদীসের অর্থ কি- اِتَّبِعُوْا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ,

'মুসলমানদের মধ্যে বড় দলের আনুগত্য করো।' এবং কুরআনে করীম সকল মুসলমানকে 'শ্রেষ্ঠ জাতি' ও মানব জাতির জন্য 'স্বাক্ষীদাতা' কেন বললেন? আশা করছি ওহাবী হযরতগণ নজদের আলিমরা সহ মিলে এ প্রশ্নগুলোর জবাব দিবেন। আমরা অপেক্ষাই থাকলাম।

আমাদের আহবান : আমরা সমগ্র পৃথিবীর লা-মাযহাবী, নজদীদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি- একটি সহীহ, মারফূ হাদীস মুসলিম ও বুখারী শরীফ অথবা কমপক্ষে 'সিহাহ সিত্তাহ' থেকে পেশ করুন- যাতে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখিত আছে যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আট রাকআত তারাবীহ পড়তেন এবং এর নির্দেশ দিতেন। (কিন্তু তারাবীহ শব্দ থাকতে হবে।) অথবা সাহাবায়ে কিরাম স্থায়ী ভাবে কায়িম করেছেন।

এটাও বলে দিচ্ছি যে, কিয়ামত পর্যন্তও দেখাতে পারবেন না। কেবলমাত্র জেদের উপরই থেকে গেলেন। রব তায়ালা তাওফীক দান করুন। আমীন ! আলহাম্‌দুলিল্লাহ বিশ রাকআত তারাবীহ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র আমল, সাহাবায়ে কিরামের নির্দেশ ও আমল, সমস্ত মুসলমানের শরয়ী পন্থা এবং আক্বলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গেলো। সকল প্রশংসা সমগ্রজ াহানের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য।

সূক্ষ্ম রস : কোন গায়রে মুকাল্লিদ ওহাবী যখন হানাফীদের মধ্যে মিশে যায় তখন তারাবীহ বিশ রাকআত পড়ে নেয়- যা অনেকবার দৃষ্টিগোচর হয়েছে এবং হচ্ছে। বুঝা গেল যে, তাদের নিজ মাযহাবের উপরও আস্থা নেই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একাদশ অধ্যায়

খতমে কুরআনে আলোকসজ্জা করা

সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে আবহমান কাল থেকে এ নিয়ম চলে আসছে যে, তারা সব সময়ই ছাওয়াব ও কবরে আলো হাসিল করার জন্য বিশেষ করে রামাদ্বান শরীফে অথবা শবে ক্বদরে এবং খতমে কুরআনের দিন মসজিদগুলোতে বেশ ঘটা করে আলোকসজ্জা করে থাকে। মসজিদগুলোকে সুন্দর সুসজ্জিত করে। ওহাবীদের মসজিদগুলো জাঁকজমকহীন ও নিস্প্রভ থাকে। তাদের মসজিদ আলোকিত ও সুসজ্জিত করার তাওফীক হয় না। ওহাবীরা মুসলমানদের এ ছাওয়াবের কাজকে বিদআত ও হারাম এমনকি শিরক পর্যন্ত বলে থাকে। তাই আমরা এ অধ্যায়কেও দুটো পরিচ্ছেদে ভাগ করছি। প্রথম পরিচ্ছেদে এ মাসআলা সমূহের প্রমাণ; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ মাসআলা গুলোর ব্যাপারে আপত্তি সমূহ জবাব দেয়া হয়েছে। পাঠকদের থেকে ইনসাফের প্রত্যাশা আর রাব্বুল আলামীনের নিকট কবুলের আশা করছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মসজিদে আলোকসজ্জা করার প্রমাণ

মসজিদে সব সময় আলোকসজ্জা করা বিশেষতঃ রামাদ্বান মাসে বিশেষ করে শবে কদরে কিংবা কুরআন শরীফ খতমের দিন আলো ঝলমলে করা উত্তম ইবাদত। যা অত্যন্ত ছাওয়াবের কাজ।

১নং ঃ আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেন-

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের মসজিদগুলোকে তারাই আবাদ করে যারা আল্লাহ তাআলা এবং ক্বিয়ামতের উপর ঈমান রাখে।

মুফাস্‌সিরীনে কিরাম বলেছেন, মসজিদগুলোতে নামাযের জামাআত কায়িম করা, মসজিদগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, ভালো ভালো চাটাই বিছানা ইত্যাদি বিছানো, আলোকসজ্জা করা ইত্যাদি মসজিদ আবাদীর অন্তর্ভূক্ত।

তাফসীরে রূহুল বায়ান বলছে- হযরত সুলায়মান (আ.) মসজিদে বায়তুল মুকাদ্দাসে 'কিবরীতে আহমার' (লাল বাতি) দ্বারা আলোকসজ্জা করতেন, যার আলোতে অনেক মাইল পর্যন্ত মহিলারা সুতা কাটতো।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল মসজিদগুলোতে জাঁকজমক ও আলোকসজ্জা করা ঈমানের নিদর্শন। সুস্পষ্ট ব্যাপার হলো, মসজিদগুলোকে নিস্প্রভ ও আবাদহীন রাখা কাফিরদের নিদর্শন।

(২) ইবনে মাজাহ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ اَوَّلُ مَنْ اَسْرَجَ فِى الْمَسَاجِدِ تَمِيْمُ الدَّارِى

'তিনি বলেন, যিনি সর্বপ্রথম মসজিদে বাতি জ্বালিয়েছেন তিনি হলেন সাহাবী হযরত তামীম আদ্‌দারী (রাদ্বি.)।'

এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো যে, মসজিদে আলোকসজ্জা করা সাহাবীর সুন্নাত। স্মতর্ব্য যে, হুযূর আনওয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময়কালে বাতি জালানোর সাধারণ রেওয়াত ছিলো না। জামাআতের সময় খেজুর গাছের লাকড়ী জালিয়ে আলোকিত করা হতো। সে ক্ষেত্রে হযরত তামীম আদ্‌দারী (রাদ্বি.) বাতি জ্বালিয়েছেন।

(৩) আবূ দাউদ হযরত উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْتِنَا فِىْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِئْتُوْهُ فَصَلُّوْا فِيْهِ وَكَانَتِ الْبِلَادُ فِىْ ذٰلِكَ حَرْبًا فَاِنْ لَمْ تَأْتَوْهُ وَتُصَلُّوْا فِيْهِ فَابْعَثُوْا بِزَيْتٍ يُسْرَجُ فِىْ قَنَادِيْلِهٖ-

'তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে 'মসজিদে বায়তুল মাকদিস সম্পর্কে হুকুম দিন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করলেন, ঐ মসজিদে যাও এবং সেখানে নামায পড়ো। ঐ সময়ে শহর গুলোতে যুদ্ধ বিগ্রহ চলছিলো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যদি তুমি সেখানে পৌছতে ও নামায পড়তে না পারো, তাহলে সেখানে তৈল পাঠিয়ে দাও। তা দ্বারা চেরাগ জালানো হবে। এ হাদীস থেকে কয়েকটি মাসআলা জানা গেলো।

প্রথমত :সজিদে বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায পড়ার জন্য সফর করা সুন্নাত। আমাদের হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিরাজে যেখানে সমস্ত নবীকে নামায পড়িয়েছেন। স্বয়ং হুযূর আনওয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সকল পয়গাম্বর (আলাইহিমুস সালাম) সফর করে সেখানে নামায পড়তে গিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত মসজিদে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রচুর বাতি জালানো হতো। যেমন ক্বানাফীল (বাতিসমূহ) বহুবচন হিসাবে ব্যবহার করার দ্বারা জানা গেল।

তৃতীয়ত: মসজিদে আলো জালানো সেখানে নামায পড়ার মতোই। অর্থাৎ তা অত্যন্ত উত্তম ইবাদত এবং ছাওয়াবের কাজ।

চতুর্থত : মসজিদে বাতি জ্বালানোর জন্য দূর থেকে তৈল পাঠানো সাহাবায়ে কিরামের সুন্নাত।

(৪) মুহাদ্দিস ইমাম রাফিঈ হযরত মুআয বিন জাবাল (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَنٰى لِلّٰه مَسْجِدًا بَنِىَ اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ عَلَّقَ فِيْهِ قَنْدِيْلاً صَلَّىٰ عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفِ مَلَكٍ حَتّٰى يَنْطَفِىْ ذٰلِكَ الْقَنْدِيْلُ-

'নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার জন্য মসজিদ তৈরী করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন। আর যে ব্যক্তি মসজিদে একটি বাতি জ্বালাবে, তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা দু'আ করতে থাকবেন যতক্ষণ ঐ বাতি নিভে না যায়।'

জানা গেল মসজিদ আলোকিত করা সত্তর হাজার ফেরেশতার দুআ নেয়ার মাধ্যম।

(৫) ইবনে বুখারী হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَقَ فِىْ مَسْجِدِ قَنْدِيْلاً صَلَّىٰ عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفِ مَلَكٍ حَتّٰى يَنْطَفِىَ ذٰلِكَ الْقِنْدِيْلُ-

www.AmarIslam.com

'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মসজিদে একটি বাতি লাগাবে তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা দুআ করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ বাতি নিভে না যায়।'

বুঝা গেল, যেমনিভাবে মসজিদে বাতি জালানো ছাওয়াব তেমনি ভাবে মসজিদে প্রদীপ তৈল অথবা বাতি দেওয়াও ছাওয়াব। চাই বাতি একটি হোক কিংবা অনেক।

(৬) মুহাদ্দিস ইবনে শাহীন হযরত আবূ ইসহাক হামদানী থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ خَرَجَ عَلِىُّ بْنُ أَبِىْ طَالِبٍ فِىْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَان وَالْقَنَادِيْلُ تَزْهَرُ وَكِتَابُ اللّٰهِ يُتْلٰى فَقَالَ نَوَّرَ اللّٰهُ لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فِىْ قَبْرِكَ كَمَا نَوَّرْتَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ تَعَالٰى بِالْقُرْاٰنِ-

'তিনি বলেন, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাদ্বি.) রামাদ্বানের প্রথম রাতে মসজিদে নব্বীতে আগমন করলেন তখন মসজিদে নব্বীতে প্রদীপগুলো ঝলমল করছিলো এবং কুরআনে করীমের তিলাওয়াত চলছিলো। তখন তিনি বললেন, হে উমর ইবনে খাত্তাব (রাদ্বি.) আল্লাহ তায়ালা আপনার কবরকে আলোকিত করুন, যেমনি ভাবে আপনি মসজিদকে কুরআনে তিলাওয়াতের সময় আলোকিত করেছেন।

(৭) ইমাম বুখারী কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস থেকে বর্ণনা করেছেন যে আমীরুল মু'মিনীন আলী (রাদ্বি.) থেকে তাঁদের কাছে এ রিওয়ায়াত পৌঁছে যে-

أَنَّهُ قَالَ نَوَّرَ اللّٰهُ قَبْرَ عُمَرَ كَمَا نَوَّرَ عَلَيْنَا مَسَاجِدَنَا

'তিনি বলেন, আল্লাহ তাঁয়ালা হযরত উমর (রাঃ) এর কবরকে আলোকিত করে দিন যেভাবে তিনি আমাদের মসজিদ গুলোকে আলোকিত করেছেন।'

শেষের এ বর্ণনাগুলো দ্বারা বুঝা গেল যে, রামাদ্বান শরীফে মসজিদে আলোকসজ্জা করা হযরত উমর (রাদ্বি.) এর সময় থেকে প্রচলিত। সম্মানিত সাহাবায়ে কিরাম এ ব্যাপারে কোন আপত্তি করেননি। বরং হযরত আলী মুরতাদ্বা (রাদ্বি.) এ ব্যাপারে তাঁর জন্য দু'আ করেছেন। এটাও বুঝা গেল যে, মসজিদ আলোকিত করার দ্বারা কবর ও আলোকিত হবে ইনশা আল্লাহ। এ জন্য এখন যে ব্যক্তি মসজিদ আলোকিত করতে বাধা দিচ্ছে, সে পরোক্ষ ভাবে সাহাবায়ে

www.AmarIslam.com

কিরামের সুন্নাতের উপর আপত্তি করছে। এ আলো জ্বালানোর বিরুদ্ধবাদীরা নিজেদের কবরকে অন্ধকারময় করে দিচ্ছে।

(৮) রব তাআলা এ সব বিরুদ্ধবাদী সম্পর্কে ইরশাদ করেন-

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا-

'তার চেয়ে বড় যালিম কে যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার মসজিদগুলোতে আল্লাহর যিকর থেকে বাধা দেয় আর এর ক্ষতি করার চিন্তা করে।'

এ আয়াতে ঐ সব লোকদেরও নিন্দা রয়েছে যারা মসজিদগুলোতে নামায, আল্লাহর যিকর, কুরআন তিলাওয়াত, না'ত খানী ইত্যাদি থেকে বাধা দেয়। এবং ঐ সব লোকের ও নিন্দা করা হয়েছে, যারা মসজিদে চাটাই বিছানা বিছানো, আলো জ্বালানো ইত্যাদি থেকে বাধা দেয়। কারণ মসজিদের আবাদী তথা পরিচর্যার মধ্যে এ সবও রয়েছে।

বিবেকেরও চাওয়া যে, বর্তমান সময়ে মসজিদগুলো সাজানো, সব সময় কিংবা বিশেষ বিশেষ সময়ে আলোকসজ্জা করা উত্তম। কেননা আমরা বর্তমানে আমাদের আবাসস্থল গুলোকে সাজানো গোছানো রাখি। বিয়ে শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠানে উদার হস্তে আলোকসজ্জা করে থাকি, বিল্ডিংগুলো সাজাই। যদি আমাদের ঘর-বাড়ি সুসজ্জিত ও আলোকসজ্জিত করা যায়, তাহলে আল্লাহর ঘর যা সকল ঘরের চেয়ে উত্তম, কেন সুসজ্জিত করা যাবেনা? মানুষের মনে মসজিদের মহত্ত ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এসব করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলার ব্যাপারে আপত্তি ও জবাবসমূহ

লা-মাযহাবী ওহাবীদের যে সব আপত্তি এ পর্যন্ত আমরা শুনেছি তা চূড়ান্ত আমানতদারীর সাথে জবাবসহ আলোকপাত করছি। রব তাআলা কবূল করুন।

আপত্তি নং- ১ : মসজিদে আলোকসজ্জা করা অতিরিক্ত ব্যয় ও অপচয়। কুরআনে করীমে অপচয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। রব তাআলা বলেন-

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ-

'খাও ও পান করো এবং অপচয় করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।'

জবাব : মসজিদে আলোকসজ্জা করাকে অপচয় বলা ভুল। অপচয় বলা হয় ঐ ব্যয়কে যেটাতে পার্থিব ও দ্বীনি কোন উপকার হয় না। মসজিদের আলোকসজ্জার দ্বারা মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, যা ইবাদত ও ছাওয়াবের কাজ।

আপত্তি নং- ২ : যখন একটা বাতি দ্বারাই আলো পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে অন্য বাতিগুলো অনর্থক। আর অনর্থক তথা অহেতুক ব্যয় অপচয়ের অন্তর্ভূক্ত।

জবাব : যখন একটি পোশাক ও পায়জামায় ছতর ঢাকা যায়, সে ক্ষেত্রে আচকান, কোট ইত্যাদি পরিধান করা অপব্যয় ও হারাম হওয়াই উচিত। যখন দশ-বিশ টাকা গজের কাপড়ে ছতর ঢেকে যায়, সেখানে দু'শত টাকা গজ মূল্যের মসৃণ সূতির মলমল কাপড় পরিধান করা হারাম হওয়া চাই। ঘরে যখন দু'টাকা মূল্যের চেরাগ দিয়ে আলো পাওয়া যায়, সেখানে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে বিদ্যুৎ সংযুক্ত করা, গ্যাসের বাতি দ্বারা আলোকিত করা অপচয় ও হারাম হওয়াই উচিত। যখন ট্রেনের থার্ড ক্লাসে বসে রাস্তা অতিক্রমের সুযোগ রয়েছে, সে ক্ষেত্রে ইন্টার, ফাস্ট সেকেন্ড ক্লাসের জন্য টাকা ব্যয় করা হারাম হওয়া চাই। জনাব, একটি বাতি দ্বারা তো আলো পাওয়া যায় আর অন্য বাতিগুলো হচ্ছে মসজিদের সৌন্দর্য ও শোভা বর্ধনের জন্যই। মসজিদ আলোকিত করা যেমন ইবাদত, তেমনি সেখানকার সৌন্দর্যবর্ধন করাও ইবাদত।

আপত্তি নং- ৩ : যদি মসজিদে আলোকসজ্জা করা উত্তম হয়ে থাকে, তাহলে স্বয়ং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ যুগে মসজিদে নববী শরীফে আলোকসজ্জা করেননি কেন? আপনারা কি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চেয়ে উত্তম (নাউযুবিল্লাহ)? কিংবা দ্বীনের জন্য বেশী দরদী? যে কাজ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেননি, তা আপনাদের করার কি অধিকার রয়েছে?

জবাব : যদি ওয়াচকোট, আচকান ইত্যাদি মূল্যবান কাপড়গুলো পরা ভালো কাজ হয়, তাহলে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেন তা ব্যবহার করেননি? যে কাজ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেননি, হে ওহাবীরা তা তোমরা কেন করো? তোমরা নিজেদের ঘরে বিদ্যুৎ সংযুক্ত করো কেন? বিজলী বাতি কেন জ্বালাও? জনাব হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) এর সময়ে লোকদের ঘরগুলো ছিলো সাধারন। তখন যুদ্ধ বিগ্রহের যুগ ছিল। এ দিকে খেয়াল করার সময় ছিলো না। যখন সাহাবায়ে কিরামের সময় লোকেরা নিজেদের ঘর বাড়ী সুন্দর ভাবে তৈরী করতে শুরু করলেন, তখন সাহাবীদের মধ্যে ফক্বীহগণ চিন্তা করলেন দ্বীন তথা ধর্মতো দুনিয়া থেকে উত্তম। আর আল্লাহর ঘর তথা মসজিদে নব্বী আমাদের ঘর গুলো থেকে অনেক উত্তম। যেহেতু আমাদের ঘর জাঁকজমক পূর্ণ, তাই আল্লাহর ঘরও শান শওকত পূর্ণ হওয়া চাই। এটা ভেবে হযরত উসমান (রাদ্বি.) মসজিদে নববীকে অধিক জাঁকজমক পূর্ণ ভাবে তৈরী করলেন। আর সেখানে যথেষ্ট সাজসজ্জা করলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ-

'তোমরা আমার ও আমার খোলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরো।'

যেমনি ভাবে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত আমলের উপযোগী, তেমনি ভাবেই হুযূরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাহাবায়ে কিরামের (রাদ্বি.) সুন্নাতও আমলযোগ্য। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে নব্বীতে আলোকসজ্জা করেছেন। এমনকি স্বয়ং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে বায়তুল মুকাদ্দাসে আলোকসজ্জা করার জন্য তৈল পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

আপত্তি নং- ৪ : আবূ দাউদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى-

'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমাকে মসজিদ সাজানোর নির্দেশ দেয়া হয় নি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) বলেন, তোমরাকি ইহুদী নাসারাদের মতো মসজিদগুলোকে সুসজ্জিত করবে?'

এ হাদীস থেকে এটাও প্রতিভাত হলো যে, মসজিদ সুসজ্জিত করার নির্দেশ

নেই। এও রয়েছে যে, ইবাদতখানা সাজানো ইয়াহুদী নাসারাদের সুন্নাত। মুসলমানদের তরীকা নয় এবং সুস্পষ্ট হলো যে, মসজিদগুলোতে আলোকসজ্জা করা মসজিদ সাজানোর পর্যায়ভুক্ত। তাই এটাও নিষিদ্ধ।

জবাব : এ আপত্তির দুটো জবাব রয়েছে। **এক,** এ হাদীসের উদ্দেশ্য যদি এটাই হয়ে থাকে যে, মসজিদকে সুসজ্জিত করা তথায় আলোকসজ্জা করা নিষেধ হয়, তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) হযরত উমর ও উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) কে মসজিদগুলো সুন্দর ও আলোকসজ্জা করতে দেখেও নিষেধ করলেন না কেন? তিনি কি নিজেই নিজের বর্ণনার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন? আর সাহাবায়ে কিরামও এ হাদীসের ঐ উদ্দেশ্য অনুধাবন করেননি, যা তোমরা মনে করছো। এমনকি এ পর্যায়ে এ হাদীসটি কুরআনে করীমের বিরোধী হয়ে যায়। কারণ রব তাআয়ালা বলেন, اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ الخ বুঝা গেল, তোমরা হাদীসের মর্মাথ ভুল বুঝেছো।

দুই, এখানে সব ধরনের সুসজ্জিতকরণের নিষেধাজ্ঞা নেই। বরং অবৈধ সাজ সজ্জার নিন্দা রয়েছে। যেমন ছবি, চিত্র ইত্যাদি দ্বারা সাজানো। এ জন্যই ইয়াহুদী নাসারাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাঁদের ইবাদত খানগুলো বিভিন্ন চিত্র ও ফটো দ্বারা সাজানো হয়ে থাকে। কিংবা ঐ সাজসজ্জা উদ্দেশ্য, যা আল্লাহর উদ্দেশ্যে নয়: বরং প্রদর্শনী ও সুনাম অর্জনের জন্য হয়। যেমন পূর্বের হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে। কিন্তু যে সুন্দর ও আলোকসজ্জা শুধুমাত্র মসজিদের সম্মান ও রব তাআলার সন্তুষ্টির জন্য হয়, তা উত্তম। রব তাআলা তাঁর ও তাঁর মাহবূব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথাকে ভালো ভাবে বুঝার তাওফীক দান করুন।

আপত্তি নং- ৫ : আবূ দাউদ, নাসাঈ, দারিমী ও ইবনে মাজাহ প্রমুখ হযরত আনাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ-

'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি হলো লোকেরা মসজিদগুলোতে অহংকার করবে।'

এ হাদীস দ্বারা প্রতিভাত হলো যে, মসজিদগুলোকে সুসজ্জিতকরণ

কিয়ামতের নিদর্শন। আল্লাহ তাআলা এর থেকে রক্ষা করুন।

জবাব : এ হাদীসের মর্মাথ তাই যা আমরা আপত্তি নং ৪ এর জবাবে আলোকপাত করেছি। অর্থাৎ অহমিকা প্রদর্শনের জন্য মসজিদ তৈরী করা ও আস্ফালনের নিয়তে মসজিদ সাজানো কিয়ামতের নিদর্শন। যেমন এক মহল্লাবাসীরা অন্য মহল্লার লোকদের মোকাবিলায় মসজিদকে সুশোভিত করে তাদেরকে এ বলে খোঁচা দেয় যে, আমাদের মসজিদ তোমাদের মসজিদের চেয়ে সুন্দর। জনাব, অহংকার ও প্রদর্শনীর জন্য নামায পড়াও নিষিদ্ধ। এ কারণে ইখলাস তথা একাগ্রতার সাথে নামায পড়াও নিষেধ হতে পারে না। অথবা হাদীসের অর্থ এ যে, কিয়ামতের পূর্বে লোকেরা মসজিদে গিয়ে আল্লাহর যিকরের পরিবর্তে দুনিয়াবী কথা বলবে এবং পরস্পর অহমিকা প্রদর্শন করবে। এটা কঠিন গুনাহ এবং যদি হাদীসের ঐ অর্থ হয়, যা তোমরা মনে করেছো অর্থাৎ মসজিদগুলোতে সুসজ্জিত করা কিয়ামতের নিদর্শন, তাহলেও এর দ্বারা নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয় না। কারণ কিয়ামতের প্রত্যেক নিদর্শন মন্দ নয়। ঈসা (আ.) এর অবতরণ ইমাম মাহ্দীর আত্ম প্রকাশও কিয়ামতের নিদর্শন। কিন্তু মন্দ নিদর্শন নয়। বরং এ গুলো বরকতময়।

আপত্তি নং- ৬ : মসজিদে আলোকসজ্জা করা বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্টতা।

জবাব : এটা ভুল। এটাতো সাহাবীদের সুন্নাত। যা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। আর যদি এটা বিদআতও হয়, তবুও প্রত্যেক বিদআত না অবৈধ, না গোমরাহী। বুখারী শরীফ ছাপানো বিদআত। কিন্তু হারাম নয় বরং ছাওয়াব। হাদীস শাস্ত্র এর প্রকারভেদ গুলো বিদআত। কিন্তু হারাম নয়। বিদআতের সঠিক বিশ্লেষণ 'জা'আল হক্ব' এর প্রথম খণ্ডে দেখুন। এতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, বর্তমানে কালিমাহ, নামায বরং সকল ইবাদতে প্রচুর বিদআত অর্ন্তভূক্ত। এ বিদআত গুলোতে সাওয়াব রয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

শবীনা পড়া ছাওয়াব

আবহমান কাল থেকে নেককার মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত রীতি হলো, তাঁরা রামাদ্বানুল মুবারক মাসে শবীনা করে থাকে। কখনো এক রাতে কখনো দু'রাতে কখনো তিন রাতে তারাবীহ নামাযে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করে। কোন কোন বুযুর্গ সম্পর্কে বলা হয়েছে তাঁরা রামাদ্বান ছাড়াও প্রতিদিন একবার কুরআন শরীফ পূর্ণ তিলাও,য়াত করেন। এ সব কিছু বৈধ এবং ছাওয়াব। তবে শর্ত হচ্ছে, এমন দ্রুত তিলাওয়াত করবে না যাতে কুরআনে করীমের হুরূফ তথা বর্ণগুলো যথাযথ ভাবে তিলাওয়াত না হয়। আলস্য নিয়েও তিলাওয়াত করবে না। অথচ গায়রে মুকাল্লিদ ওহাবীরা এটাকেও হারাম বলে। সারা রাত সিনেমা দর্শকদেরকে মন্দ বলে না। কিন্তু রাতভর কুরআন তিলাওয়াতকারীদেরকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে থাকে। তাঁদের উপর শিরক বিদ্আতের ফাতওয়া লাগায়। তাই আমরা এ অধ্যায়কেও দু'টো পরিচ্ছেদে ভাগ করছি। প্রথম পরিচ্ছেদে শবীনার প্রমান, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এর উপর আপত্তি ও জবাব সমূহ দেয়া হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শবীনার প্রমাণ

এক রাতে কুরআনে করীম খতম করা ছাওয়াবের কাজ। এর প্রমাণ স্বরূপ কুরআন, হাদীস, যুক্তি এমনকি ওয়াহাবীদের কিতাবাদির দলীলাদি লক্ষ্য করুন।

(১) কুরআনে করীম স্বীয় মাহবূবকে সম্বোধন করে বলছে-

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ- قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا- نِّصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا- أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا-

'ওহে বস্ত্রাবৃত! প্রেমাস্পদ! রাতের কিছু অংশ ছাড়া সারারাত জাগ্রত থেক। রাতের অর্ধাংশ বা তার চেয়ে কিছু কম। অথবা তার চেয়ে কিছু বেশী করো আর থেমে থেমে কোরআন তিলাওয়াত কর।

এ আয়াতে করীমায় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রায় সারারাত নামায পড়ার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে সারারাত

ইবাদত করা ফরয ছিলো। অল্প সময় বিশ্রামের জন্য রাখা হয়েছিলো। আবার এক বছর পর এ ফরযিয়্যাত রহিত হয়ে গেলো। কিন্তু ইস্তিহবাব তথা মুস্তাহাব হওয়াটা বাকী রয়েছে। এখানো যে ব্যক্তি শবীনায় সারারাত জাগ্রত থাকে, অল্প সময়ই ঘুমায়.সে এ আয়াতের উপরই আমলকারী। কিন্তু আবশ্যক হলো শবীনা সেই পড়বে, যে ব্যক্তি কুরআন বিশুদ্ধভাবে পড়তে পারে, যা তারতীলের নির্দেশ থেকে বুঝা যায়।

(২) ইমাম মুসলিম ও বুখারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে চন্দ্রগ্রহণের নামাযের উল্লেখ রয়েছে। এর কয়েকটি শব্দ এরূপ-

فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ-

'হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চন্দ্র গ্রহণের নামাযে প্রায় সূরা বাকারা পড়ার পরিমাণ দীর্ঘক্ষণ ক্বিয়াম করলেন।'

বুঝা গেলো যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চন্দ্রগ্রহণের নামাযে সূরায়ে বাক্বারা অর্থাৎ আড়াই পারার সমান তিলাওয়াত করেছেন। শবীনায় প্রতি রাকআতে দেড় পারা পড়া হয়। যখন এক রাকআতে আড়াই পারা পড়াটা প্রমাণিত হলো, তাহলে দেড় পারা পড়াতো অগ্রাধিকার ভিত্তিতেই বৈধ।

(৩) আবূ দাঊদ হযরত হুযায়ফা (রাদ্বি.) থেকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তাহাজ্জুদ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার শেষের কয়েকটি শব্দ এরূপ-

فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ قَرَأَفِيْهِنَّ الْبَقَرَةَ وَآلِ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ وَالْاَنْعَامَ-

'হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চার রাকআত তাহাজ্জুদ পড়েছেন। যেখানে সূরা বাক্বারা, আলে ইমরান, সূরা নিসা, সূরা মায়িদাহ ও সূরা আনআম তিলাওয়াত করেছেন।'

দেখুন! নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চার রাকআত তাহাজ্জুদে প্রায় আট পারা অর্থাৎ প্রতি রাকআতে প্রায় দু'পারা তিলাওয়াত করেছেন। শবীনায় প্রতি রাকআতে এ পরিমাণ পড়া হয় না। প্রতি রাকআতে দেড় পারা পড়া হয়। তাহলে এটা (শবীনা) কেন হারাম হলো?

(৪) ইমাম মুসলিমও বুখারী (রাদ্বি.) হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا وَقَدْ غُفِرَلَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا-

'তিনি বলেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতের নামাযে এত অধিক সময় ক্বিয়াম ফরমালেন যে, তাঁর উভয় পা মুবারক ফুলে গেলো। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি এত কষ্ট করছেন কেন? অথচ আপনার উম্মতের আগে-পরের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?'

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, ইবাদতের মধ্যে কষ্ট করা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত। আর কোন শবীনায় কোন মু'মিনের পা ফুলে গেলে সেটা তার সৌভাগ্য। কারণ একটা সুন্নাত পালন হলো। ওহাবীদের নিজেদের তো ইবাদত করার তাওফীক হয় না। অন্যদেরকেও ইবাদত থেকে বাধা দিচ্ছে।

(৫) তাহাবী হযরত ইবনে সীরীন থেকে বর্ণনা করেন,

قَالَ كَانَ تَمِيْمُ الدَّارِيْ يُحْيِيْ اللَّيْلَ كُلَّهُ بِالْقُرْاٰنِ كُلِّهٖ فِيْ رَكْعَةٍ-

'তিনি বলেন, হযরত তামীম দারী (রাদ্বি.) সারা রাত জাগ্রত থাকতেন এবং প্রতি রাকআতে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন।'

শবীনার ক্ষেত্রে তো বিশ রাকআত তারাবীহতে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা হয়। হযরত তামীম দারী সাহাবীয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক রাকআতেই সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন।

(৬) তাহাবী হযরত ইসহাক ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন-

عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فِيْ رَكْعَةٍ

'তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাদ্বি.) এক রাকআতে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করেছেন।'

(৭) আবূ নুআইম 'হুলিয়া'তে হযরত উসমান ইবনে আবদুর রহমান তাইমী থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ لِىْ أَبِىْ اَغْلِبَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى الْمَقَامِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ تَخَلَّصْتُ إِلَى الْمَقَامِ حَتّٰى قُمْتُ فِيْهِ فَبَيْنَا اَنَا قَائِمٌ اِذَا رَجُلٌ وَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَىَّ فَاِذَا هُوَ عُثْمَانُ ابْنُ عَفَّانَ فَبَدَأَ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَقَرَأَ حَتّٰى خَتَمَ الْقُرْاٰنَ فَرَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ اَخَذَ نَعْلَيْهِ فَلَا اَدْرِىْ اَصَلّٰى قَبْلَ ذٰلِكَ شَيْئًا اَمْ لَا-

'তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা বলেছেন, আজ আমি সারারাত 'মাক্বামে ইবরাহীমে' জাগ্রত থাকব। আমি ইশা'র নামায শেষ করে 'মাক্বামে ইবরাহীমে' পৌঁছলাম। আমি দাঁড়িয়েই ছিলাম। হঠাৎ একজন আমার কাঁধে হাত রাখলেন। তিনি ছিলেন হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাদ্বি.)। তিনি সূরা ফাতিহা দিয়ে ক্বিরাআত শুরু করলেন। এরপর তিনি পড়তেই থাকলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কুরআন খতম করে ফেললেন। এরপর তিনি রুকূ করলেন এবং সিজদা করলেন। অতপর স্বীয় জুতোদ্বয় নিলেন। আমি জানি না তিনি ইতিপূর্বে আরো নামায পড়েছেন কিনা।

(৮) আবূ নুআইম 'হুলিয়া' গ্রন্থে হযরত ইবরাহীম নাখঈ থেকে বর্ণনা করেন-

كَانَ اَسْوَدُ يَخْتِمُ الْقُرْاٰنَ فِىْ رَمَضَانَ فِىْ كُلِّ لَيْلَتَيْنِ وَكَانَ يَنَامُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

'হযরত আসওয়াদ (রাদ্বি.) রামাদ্বান মাসে প্রতি দু'রাতে একবার কুরআন শরীফ খতম করতেন এবং মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ঘুমাতেন।'

(৯) তাহাবী হযরত হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন-

عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ اَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فِىْ رَكْعَةٍ فِى الْبَيْتِ-

'সাহাবী হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাদ্বি.) বায়তুল্লাহ শরীফে এক রাকআতে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পড়েছেন।

এ হাদীস শরীফ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, অধিক রাত্রি জাগরণ, নামায পড়া, প্রতিদিন নামাযে কিয়াম করা যাতে পা ফুলে যায়, এক রাকআতে আড়াই

পারা তিলাওয়াত করা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত এবং এক রাত, দু'রাত বরং এক রাকআতে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পড়া সাহাবায়ে কিরামর সুন্নাত। যে ব্যক্তি শবীনাকে হারাম, অথবা শিরক বা ফিস্‌ক বলে, সে খাঁটি মুর্খ।

(১০) মিরকাত শরহে মিশকাত, 'তিলাওয়াতুল কুরআন' অধ্যায়ে ৬১৫ পৃষ্ঠায় সাহাবায়ে কেরামের রীতি এ ভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে-

فَخَتَمَهُ جَمَاعَةٌ فِىْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَرَّةً وَاٰخَرُوْنَ مَرَّتَيْنِ وَاٰخَرُوْنَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَخَتَمَهُ فِىْ رَكْعَةٍ مَّنْ لَا يُحْصَوْنَ كَثْرَةً-

'একটি দল দিনে ও রাতে একবার কুরআন শরীফ খতম করলেন, আরেক দল দু'বার এবং কেউ কেউ তিন বার। প্রতি রাকআতে সম্পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াতকারী অসংখ্য।

বিবেকেরও চাওয়া এটাই যে, শবীনা ইবাদত,হারাম নয়। কেননা ইবাদতের ছাওয়ার কষ্টের পরিমাণ অনুযায়ী অর্জিত হয়। গ্রীষ্মকালীন রোযা, তরবারীর জিহাদ, কষ্ট করে হজ্ব পালনের ক্ষেত্রে ছাওয়াবই অর্জিত হবে, আযাব (শাস্তি) নয়। এটা কি ভাবে হতে পারে যে, মুসলমান রবের সন্তুষ্টির জন্য সারা রাত নামাযও পড়বে,কুরআন শরীফও তিলাওয়াত করবে আর ছাওয়াবের পরিবর্তে আযাব পাবে? কুরআনের একটি হরফ পড়লে দশটি নেকী রয়েছে। তাহলে আশ্চর্যের বিষয় হলো, সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পড়ার কারণে নেকীর পরিবর্তে উল্টো আযাব হবে! হযরত দাউদ (আ.) মুজিযা স্বরূপ অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ যবূর শরীফ পড়ে নিতেন,যা হাদীস শরীফে বিদ্যমান। তাহলে যদি এক রাতে সম্পূর্ণ কুরআন পড়ার জন্য আযাব হয়, তবে তো নাঊযুবিল্লাহ দাউদ আলাইহিস্ সালাম ওহাবীদের কথা মতো সম্পূর্ণ যাবূর পড়ার কারণে গুনাহগার হবেন। রব তাআলা বুঝ দান করুন।

সুক্ষরস : ওহাবীরা নিজেদের কিতাব 'আরওয়াহে ছালাছায়' তাদের মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী ইসমাঈল সাহেবের ফাযাইল (মর্যাদা) বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছে, মৌলভী ইসমাঈল সাহেব আসর থেকে মাগরিবের মধ্যে কুরআন করীম খতম করতেন। লোকেরাও তার কাছ থেকে এ সময়টুকুর মধ্যে সম্পূর্ণ কুরআন শুনেছেন। এখন আমরা ওহাবীদের থেকে জানতে চাই, তোমরা আমাদের ইমামে আযম আবূ হানীফা (রাদ্বি.) কে এ জন্যই নিন্দা ঠাট্টা করো,

আর তাঁকে গালি দাও। কারণ তিনি রামাদ্বান মাসে প্রতিদিন দিনের বেলা একবার ও রাতে একবার কুরআন শরীফ খতম করতেন। বলো- তোমাদের ইসমাঈল তো আসর থেকে মাগরিবের মধ্যেই একবার কুরআন খতম করে নিতেন। তিনিও এ অভিশপ্পাত ও ঠাট্টার উপযোগী কিনা? তিনিও ফাসিক ফাজির হলেন কিনা? না তোমাদের ইমাম যা করে তা বৈধ? জবাব দাও।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শবীনার ব্যাপারে আপত্তি ও জওয়াবসমূহ

শবীনা প্রসঙ্গে আমরা ঐ সব আপত্তি পেশ করছি,যা গায়রে মুকাল্লিদ ওহাবীরা করে থাকে। আর ঐ সব আপত্তিও বর্ণনা করছি, যা আজো তাদের বুঝে আসেনি। আমরা তাদের পক্ষ থেকে তা জবাবসহ আলোপাত করছি। রব তায়ালা কবূল করুন।

আপত্তি নং- ১ : কুরআনে করীম বলছে- وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا

'তোমরা থেমে থেমে কুরআন তিলাওয়াত করা।'

আর সুস্পষ্ট বিষয় হলো, যখন প্রতি রাকআতে দেড় পারা পাঠ করে এক রাতেই সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করা হবে,তখন হাফিযকে খুব দ্রুত পড়তে হবে। যাতে 'ইয়ালামুন' 'তা'লামূলন' ছাড়া কিছুই বুঝা যাবে না। তাই শবীনা পড়া কুরআনের হুকুমের বিরোধী।

জবাব : এ আপত্তির দু'টো জবাব রয়েছে। **এক,** তোমাদের মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী ইসমাঈল আসর থেকে মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে পূর্ণ কুরআন পড়ে ফেলতেন। বলো, তিনি কি থেমে থেমে পড়তেন নাকি ইয়া'লামূন তা'লামূন ধরনের পড়তেন? হযরত দাউদ (আ.) খুব দ্রুত সম্পূর্ণ যবূর তিলাওয়াত করতেন। হযরত উসমান গনী, তামীম দারী, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম) এবং অন্যান্য সিনিয়র সাহাবায়ে কিরাম এক রাকআতে সম্পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করেছেন। স্বয়ং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং চন্দ্র গ্রহণের নামাযে এক রাকআতে আড়াই পারা তিলাওয়াত করতেন, যার উদ্ধৃতি প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। তোমাদের এ আপত্তি ঐ সব পরম সম্মানিত ব্যক্তিদের উপরও কি আরোপিত হবে? না হলে কেন নয়? দ্বিতীয় জবাব এ যে, রব তাআলা কোন লোককে তিলাওয়াতের এমন শক্তি দান

করেছেন যে, সে অত্যন্ত দ্রুত পড়েও বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট ভাবে তিলাওয়াত করতে পারে। আবার কারো কারো মধ্যে এমন শক্তি নেই। সে দ্রুত পড়তে গেলে কেবল ইয়ালামূল তা'লামূন ছাড়া আর কিছু বুঝা যায় না। শবীনা শুধুমাত্র প্রথম প্রকারের হাফিযগণ পড়বেন। দ্বিতীয় প্রকারের হাফিযগণ কখনোই পড়বেন না। এ আয়াতে করীমার এটাই উদ্দেশ্য। আয়াতে করীমা আপন জায়গায় সঠিক। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং ঐ সব প্রবীণ সাহাবায়ে কেরাম যে এক রাকআতে অনেক দীর্ঘ পরিমাণ তিলাওয়াত করেছেন তাও স্বীয় ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ।

দ্বিতীয় আপত্তি : তিরমীযী আবূ দাউদ, দারিমী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করেন, (মিশকাত, তিলাওয়াতুল কুরআন অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَتَفَقَّهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فِىْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ-

'নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন পড়বে সে কুরআন বুঝতে পারবে না।' এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, তিন দিনের কমে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পড়া কখনো উচিত নয়। কেননা তখন কুরআন বুঝা যাবে না। তাই শবীনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

জবাব : এর কয়েকটি জবাব রয়েছে। **প্রথমত :**এ হাদীসটি অপনাদেরও বিরোধী। আপনারা তিন রাতের শবীনাকেও হারাম বলেন অথচ এ হাদীসে এর অনুমতি এসেছে। **দ্বিতীয়ত :** আপনাদের নেতা ইসমাঈল দেহলভী আসর থেকে মাগরিবের মধ্যে কুরআন করীম খতম করতেন। তিনিও সমর্থক দলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান।

তৃতীয়ত : সরকারে দো আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ হাদীস শরীফে সাধারণ লোকদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ সাধারণত: হাফিযগণ যদি এক কিংবা দু'দিনের মধ্যে খতমে কুরআন করে, তাহলে বুঝতে পারবে না। কিন্তু কিছু লোক যারা এ ব্যাপারে সক্ষম তারা এ হুকুমের বাইরে। যেমন হযরত উসমান গণী ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) এক রাকআতে কুরআন খতম করতেন। এ জন্যই উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মিরকাত ও লুমআতে বর্ণিত আছে যে, কোন কোন বুযুর্গ এক দিন ও এক রাতে তিন খতম করতেন। কেউ আট খতম করতেন। আর শায়খ আবূ মুদায়ন

মাগরিবী এক দিন ও রাতে সত্তর হাজার বার কুরআন পড়তেন। তিনি একবার হাজরে আসওয়াদে চুমু দিয়ে কা'বার দরজার কাছে আসতে আসতেই কুরআন খতম করেছেন। আর লোকেরা প্রতিটি হরফ শুনেছেন।

(মিরকাত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২১৬, বাবু তিলাওয়াতিল কুরআন)

'বাস্তবতা হলো এ হুকুমটি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হবে।'

আপত্তি নং- ৩ : মুসলিম ও বুখারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার শেষের কয়েকটি শব্দ নিম্নরূপ ঃ

وَاقْرَأْ فِىْ كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ وَّلَاتَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ (مشكوة – صوم تطوع)

'প্রতি সপ্তাহে একবার কুরআন খতম করো। এর চেয়ে বেশী করো না।

দেখুন- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাদ্বি.) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছ থেকে দ্রুত খতম করার অনুমতি চেয়েছেন। আর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো প্রথমে হুকুম দিয়েছেন এক মাসে এক খতম করো। আবার বিশেষ তাগিদ সহকারে ইরশাদ হয়েছে- এক সপ্তাহের কম সময়ে কুরআন শরীফ খতম না করা উচিত। এ জন্য শবীনা নিষিদ্ধ।

জবাব : সরকারে দু'আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ জবাব সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাদ্বি. এর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই হতে পারে। তিনি দুয়েক রাতে খতম করতে গেলে সুস্পষ্টভাবে পাঠ করতে পারতেন না। অথবা এ ক্ষেত্রে সব সময় তিলাওয়াতের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি প্রতিদিন সব লোক এক খতম আদায় করে,তাহলে দুনিয়াবী কাজ কর্ম বন্ধ হয়ে যাবে। আর যদি বছরে এক আধ দিনে কুরআন খতম করা হয়,তাহলে কোন অসুবিধা নেই। যে সব সাহাবী প্রতি রাকআতে একবার করে কুরআন তিলাওয়াত করেছেন,তাঁদের এ হাদীসটি জানা ছিলো। তবুও এক রাকআতে খতম করতেন।

আপত্তি নং- ৪ : হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো দুয়েক রাতে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পড়েননি। তাই শবীনা বিদআত। আর বিদআত থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

জবাব : হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এক রাতে পূর্ণ

কুরআন না পড়ার দু'টি কারণ রয়েছে। এক, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রাথমিক জীবনে পূর্ণ কুরআন নাযিলই হয়নি। ওফাতের কিছু সময় আগে কুরআন সম্পূর্ণ হয়েছে। তাই তখন খতমে কুরআনের প্রশ্নই আসেনি। দ্বিতীয়ত, তিনি স্বীয় উম্মতের উপর অনুগ্রহ করেছেন যাতে তাদের উপর শবীনা পড়াটা আবশ্যক সুন্নাত হয়ে না যায়। এরপরও সাহাবায়ে কিরাম শবীনা পড়েছেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তারাবীহ সব সময় পড়েননি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সাহাবায়ে কেরাম নিয়মতান্ত্রিকভাবে জামাআত সহকারে আদায় করেছেন। শবীনা সাহাবায়ে কিরামের সুন্নাত। এর উপর আমল করার ফলে ইনশাআল্লাহ ঐ ছাওয়াবই পাওয়া যাবে যা সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর আমল করার কারণে অর্জিত হয়। সাহাবায়ে কিরামের সুন্নাতকে বিদআত বলে নিষেধ করা ওহাবীদেরই চিরাচরিত অভ্যাস। আমরা আহলে সুন্নাত এটা বলতে পারিনা।

আপত্তি নং- ৫ : আজকাল শবীনার এমনই অবস্থা যে, হাফিয তিলাওয়াত করছে আর মুকতাদীদের কেউ শুয়ে আছে, কেউবা ঝিমুচ্ছে আবার কেউ অলসভাবে বসে আছে। এটা কুরআনে করীমের সাথে বেআদবী। তাই শবীনা বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত।

জবাব : এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। শবীনায় অনেক লোক যথা নিয়মে শবীনা শোনার জন্য আসে। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আন্তরিকতা ও একাগ্রতার সাথে শ্রবণ করে। আর কেউ কেবলমাত্র শবীনা দেখার জন্য আসে। তারা শুয়ে বসে থাকে। এতে কোন অসুবিধা নেই। কুরআন শোনা ফরযে কিফায়াহ। কিছু লোকের শোনাই যথেষ্ট। আর যদি বাধ্য হয়ে মেনেও নেয়া হয় যে, সকল মুসলমান অলসতার সাথে শোনে, তাহলে সচেষ্ট হয়ে অলসতা দূর করো- শবীনা বন্ধ করো না। বর্তমানে বিয়ে শাদীতে অনেক গর্হিত কার্যকলাপ করা হয়ে থাকে। নাচ-তামাশা বাজি-আতশবাজি সব কিছুই হয়। মেহেরবানী করে বিবাহ বন্ধ করো না। বরং ঐ সব কাজ নির্মূল করার চেষ্টা করো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময়ে কা'বা শরীফে মূর্তি ছিলো। এ জন্য হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বাকে ভেঙ্গে ফেলেননি। বরং যখন আল্লাহ তায়ালা শক্তি দিয়েছেন তখন মূর্তিগুলো বের করে দিয়েছেন। মসজিদে কুকুর ঢুকলে মসজিদ ত্যাগ করো না, কুকুরটাকে বের করে দাও। যদি খাট পালংকে

ছার পোকা, কাপড় কিংবা মাথার চুলে উকুন হয়ে যায়, তখন কীট মেরে ফেল। খাট-পালংক, কাপড় অথবা মাথার চুল জ্বালিয়ে দিও না। ওহাবীদের এ এক অদ্ভুত চরিত্র যে তারা যাবতীয় ইবাদত থেকে মন্দ প্রথা সমূহ দূর করার পরিবর্তে স্বয়ং ইবাদতগুলোকেই নির্মূল করতে চেষ্টা করে থাকে। এ লোকগুলো এ ধরনের বাহানার মাধ্যমে সমস্ত ভালো কাজগুলো থেকে বাধা দেয়। যেমন মীলাদ শরীফ,খতমে বুযুর্গান ইত্যাদি। যদি সুন্নী ভাইয়েরা আমাদের এ জবাব স্মরণ রাখেন তাহলে ইনশাআল্লাহ ওহাবীদের বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকতে পারবেন। আমরা শবীনার মাসআলার ব্যাপারে বিস্তারিত ভাবে এ জন্যই আলোচনা করলাম যে, বর্তমানে ওহাবীরা ব্যাপাক ভাবে এর পিছনে উঠে পড়ে লেগেছে। রামাদ্বান শরীফে যে সব জায়গায় শবীনার ব্যবস্থা করা হয় সে সব জায়গায় লা-মাযহাবীরা খুব তাড়াতাড়ি হারাম ও শিরকের ফাতওয়া দিতে তৎপর হয়ে উঠে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জামা'আত চলাকালীন ফজরের সুন্নাত পড়া

ফিক্বহী মাসআলা হলো এ যে- যদি কোন ব্যক্তি ফজরের নামাযের জামাআত চলাকালীন মসজিদে আসে, আর সে তখনো ফজরের সুন্নাত পড়েনি- তাহলে সে জামাআত থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ফজরের সুন্নাত পড়ে নিবে। তবে শর্ত হচ্ছে জামাআত পাওয়ার দৃঢ় আশা থাকতে হবে। যদি আত্তাহিয়্যাতও পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তখনও ফজরের সুন্নাত পড়ে নেবে। অথচ লা-মাযহাবী ওহাবীরা এর ঘোর বিরোধী এবং এ মাসআলার কারণে তারা হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাদ্বি. এর নিন্দা বিদ্রুপ করে। তারা বলে, এ অবস্থায় (জামাআত চলাকালীন) ফজরের সুন্নাত ছেড়ে দিবে এবং জামাআতে শরীক হবে। আমরা পূর্ণ আমানতদারীর সাথে এ অধ্যায়কে দুটো পরিচ্ছেদে ভাগ করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে হানাফী মাযহাবের সপক্ষে দলীলাদি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গায়রে মুকাল্লিদ ওহাবীদের প্রশ্ন সমূহের জবাব দেয়া হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

হানাফী মাযহাবের দলীল সমূহ

(১) তাহাবী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী মুসা আশআরী (রাদ্বি. থেকে বর্ণিত-

عَنْ أَبِيْهِ حِيْنَ دَعَاهُمْ سَعِيْدُ ابْنُ الْعَاصِ دَعَا اَبَامُوْسٰى وَحُذَيْفَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ ثُمَّ خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِهٖ وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَجَلَسَ عَبْدُ اللّٰهِ إِلٰى اُسْطُوْنَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ-

'তিনি তার পিতা আবূ মুসা অ. শআরী (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন- যখন সাঈদ ইবনুল 'আস তাদেরকে ডাকলেন, তিনি হযরত আবূ মুসা আশআরী হযরত হুযায়ফা এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাদ্বি.) কে ফজরের নামাযের পূর্বেহ ডাকলেন। এরপর তাঁরা হযরত সাঈদ ইবনুল আসের কাছ থেকে ফিরে আসলেন। ততক্ষনে ফজরের জামাআত আরম্ভ হয়ে গেছে। তখন

www.AmarIslam.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাদ্বি.) মসজিদের একটি স্তম্ভের পাশে বসে দু'রাকআত নামায পড়লেন। এরপর জামাআতে শরীক হলেন।'

দেখুন- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাদ্বি.) যিনি একজন ফক্বীহ সাহাবী হযরত আবূ মুসা আশআরী ও হযরত হুযায়ফা (রাদ্বি.) এর উপস্থিতিতে ফজরের জামা'আতের সময় ফজরের সুন্নাত পড়েছেন। এরপর জামাআতে শামিল হয়েছেন। আর এ ব্যাপারে না উক্ত দু'সাহাবী কোন আপত্তি করেছেন, না অন্য কোন নামাযী। বুঝা গেল সমস্ত সাহাবীর সাধারণ রীতি এটাই ছিলো যে, তাঁরা ফজরের জামাআত চলাকালীন সুন্নাত পড়তেন। এরপর জামাআতে শামিল হতেন। সাহাবায়ে কিরাম হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হুকুম না থাকলে এরূপ করতেন না। মূলকথা এ কাজটি সাহাবায়ে কিরামের সুন্নাত।

(২) তাহাবী হযরত আবূ মিজলায থেকে আরো বর্ণনা করেন- ।

قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْاِمَامُ يُصَلِّىْ فَاَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَدَخَلَ فِى الصَّفِّ وَاَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْاِمَامِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْاِمَامُ قَعَدَ ابْنُ عُمَرَ مَكَانَهُ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ-

'তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) এর সাথে ফজরের নামাযের সময় মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন ইমাম নামায পড়াচ্ছিলেন। হযরত ইবনে উমর (রাদ্বি.) নামাযের কাতারে প্রবেশ করলেন। আর ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) প্রথমে দু'রাকআত সুন্নাত পড়লেন। এরপর ইমামের সাথে জামাআতে শরীক হলেন। অতঃপর যখন ইমাম সালাম ফিরালেন ইবনে উমর (রাদ্বি.) আপন জায়গায় বসে রইলেন। ইতোমধ্যে সূর্য উদিত হলো। তারপর তিনি দু'রাকআত নফল আদায় করে নিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) যিনি বড় ফক্বীহ সাহাবী এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র আহলে বায়তের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন- হযরত ইবনে উমর (রাদ্বি.)ও সকল সাহাবীর উপস্থিতিতে ফজরের জামাআত চলাকালীন দু' রাকআত সুন্নাত পড়েই জামাআতে শরীক হয়েছেন। অথচ কেউ তাঁর ব্যাপারে আপত্তি করেননি।

(৩) তাহাবী হযরত আবূ উসমান আনসারী (রাদ্বি.) থেকে আরো বর্ণনা করেন-

www.AmarIslam.com

قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْاِمَامُ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلّٰى اِبْنُ عَبَّاسٍ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْاِمَامِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُمْ-

'তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) এমন অবস্থায় মসজিদে আসলেন যে, তখন ইমাম ফজরের নামাযে ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) তখনো ফজরের সুন্নাত পড়েননি। তাই তিনি প্রথমে ইমামের পিছনে (একটু দূরে) দাঁড়িয়ে দু'রাকআত সুন্নাত পড়লেন। এরপর তাঁদের সাথে জামাআতে শরীক হলেন।'

(৪) তাহাবী হযরত মুহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনা করেন-

قَال خَرَجَ ابْنَ عُمَرَ مِنْ بَيْتِه فَاُقِيْمَتْ صَلٰوةُ الصُّبْحِ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ فِى الطَّرِيْقِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى الصُّبْحَ مَعَ النَّاسِ-

'তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদ্বি.) স্বীয় ঘর থেকে বের হলেন- ওদিকে ফজরের নামাযের জামাআত আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। তিনি মসজিদে আসার পূর্বেই দু'রাকআত সুন্নাত পড়লেন। তখন তিনি রাস্তায় ছিলেন। এরপর মসজিদে প্রবেশ করলেন অতঃপর সবার সাথে নামায পড়লেন।'

(৫) তাহাবী হযরত আবূ ওবায়দুল্লাহ (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ فِى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّلٰوةِ-

লোকেরা ফজরের নামাযের জন্য কাতারবন্দী হলেই 'হযরত আবুদ্ দারদা (রাদ্বি.) মসজিদে প্রবেশ করতেন। অতঃপর তিনি মসজিদের একপাশে দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতেন। তারপর সবের সাথে নামাযে শামিল হতেন।'

(৬) তাহাবী হযরত আবূ ওসমান নাহদী থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ كُنَّا نَأْتِىْ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّىَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ [illegible] فِي الصَّلٰوةِ فَنُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ فِىْ اٰخِرِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ

www.AmarIslam.com

করেন-

www.AmarIslam.com

يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِى صَلٰوتِهِمْ–

'তিনি বলেন, আমরা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বি.) এর নিকট ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত পড়ার পূর্বে আসতাম। তখন হযরত উমর (রাদ্বি.) নামাযে থাকতেন। অতঃপর আমরা মসজিদের প্রান্তে দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতাম। এরপর গোত্রের সাথে নামাযে শামিল হতাম।'

(৭) তাহাবী হযরত ইউনুস থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُوْلُ يُصَلِّيْهِمَا فِى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِى صَلٰوتِهِمْ–

'ইমাম হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, ফজরের দুরাকআত সুন্নাত মসজিদের এক পাশে পড়বে। এরপর গোত্রের সাথে নামাযে শামিল হবে।'

(৮) তাহাবী হযরত নাফে (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

يَقُوْلُ اَيْقَظْتُ ابْنَ عُمَرَ لِصَلٰوةِ الْفَجْرِ وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَقَامَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ–

'তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) কে ফজরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দিলাম। ততক্ষনে ফজরের জামাআত শুরু হয়ে গেছে। তখন তিনি আগে ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করলেন।'

(৯) তাহাবী হযরত শা'বী থেকে বর্ণনা করেন-

كَانَ مَسْرُوْقٌ يَجِيْئُ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ فَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِى صَلٰوتِهِمْ–

'হযরত মাসরূক (রাদ্বি.) ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত না পড়েই গোত্রের লোকদের কাছে আসতেন। তখন তারা নামাযরত থাকতেন। অতঃপর তিনি দু'রাকআত সুন্নাত পড়ে গোত্রের সাথে নামাযে শামিল হতেন।'

(১০) তাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী মুসা আশআরী (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْاِمَامُ فِى الصَّلٰوةِ فَصَلّٰى رَكْعَتَى الْفَجْرِ

'হযরত আবূ মুসা আশআরী (রাদ্বি.) মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন ইমাম নামাযরত অবস্থায় ছিলেন। তখন তিনি প্রথমে ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত পড়লেন।'

এ দশটি হাদীস দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করা হলো। না হয় এ সম্পর্কে প্রচুর বর্ণনা রয়েছে। ইচ্ছা হলে তাহাবী শরীফ অধ্যয়ন করতে পারেন।

বিবেকের চাওয়াও এটাই যে, এ অবস্থায় আগে ফজরের সুন্নাত পড়ে এরপর জামাআতে শরীক হওয়া। কেননা, সমস্ত সুন্নাতে মুআক্কাদার মধ্যে ফজরের সুন্নাতের উপর বিশেষ তাগিদ রয়েছে। এমনকি ইমাম মুসলিম, বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ প্রমুখ উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকাহ (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى شَيْئٍ مِنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ–

'হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের সুন্নাত আদায়ে যতটুকু নিয়মানুবর্তিতা ও সতর্কতা অবলম্বন করতেন, অন্য কোন সুন্নাতের ক্ষেত্রে তা করতেন না।'

আহমদ, তাহাবী, আবূ দাউদ হযরত আবূ হুরায়রা (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَدَعُوْا رَكْعَتَى الْفَجْرِ وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ–

'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, তোমরা ফজরের সুন্নাত পরিত্যাগ করো না। এমনকি যদি তোমাদের দিকে অশ্বারোহী শত্রুবাহিনী তেড়েও আসে।

মূলকথা হলো- ফজরের সুন্নাতের ব্যাপারে কঠোর তাগিদ রয়েছে। যদি ফজরের সুন্নাত থেকে যায়; ফরয পড়ে নেয়া হয়, তাহলে এর কাযা করা যাবে না। যোহর নামাযের সুন্নাত যোহরের ফরযের পরও পড়া যায়। ওদিকে জামাআতও ওয়াজিব। যদি এ ব্যক্তি ফজরের সুন্নাতের কারণে জামাআত ছেড়ে দেয়,তাহলে ওয়াজিব পরিত্যাগকারী হবে। আর যদি জামাআতের কারণে ফজ

রের সুন্নাত ছেড়ে দেয়, তাহলে গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্‌র পরিত্যাগকারী হবে। তাই এ দুটোর কোনটিই ছেড়ে দেবে না। যদি জামাআত পাওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তখন প্রথমে ফজরের সুন্নাত পড়ে নেবে। এরপর জামাআতে যোগ দেবে। উভয় ইবাদতই করতে পারলে ভাল। একটাকে ছেড়ে দেয়া ঠিক নয়।

এটাও খেয়াল রাখা চাই যে, যেখানে জামাআত চলছে, ঠিক সে জায়গাতেই ফজরের সুন্নাত পড়া নিষেধ। কারণ এতে জামাআতের বিরোধীতা ও এর প্রতি বিমুখতাই প্রকাশ পায়। এ জন্য এমন জায়গায় দাঁড়াতে হবে, যাতে তাকে জামাআতের অন্তর্ভূক্ত বলে মনে না হয়। মসজিদের এক কোণে কিংবা অন্য অংশে দাঁড়াতে হবে।

যোহরের প্রথমের সুন্নাতগুলো মুআক্কাদাহ। কিন্তু ফরযের পরও পড়া যায়। আছর ও ইশার সুন্নাতগুলো মুআক্কাদাহ নয়; গায়রে মুআক্কাদাহ। এ জন্য এগুলো জামাআতের সময় পড়া যাবে না। ফজরের সুন্নাত মুআক্কাদাহ্‌। আবার ফরযের পর পড়াও যায় না। তাই যদি জামাআত পাওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তাহলে পড়ে নেবে।

কিন্তু পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে ফজরের সুন্নাত ছেড়ে দেবে। কারণ জামাআত ওয়াজিব। ওয়াজিব সুন্নাতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলার ব্যাপারে আপত্তি ও জবাব সমূহ

এখন পর্যন্ত এ মাসআলার ব্যাপারে যে সব আপত্তি আমরা জানতে পেরেছি তার জবাব সতর্কতা ও নিষ্ঠার সাথে পেশ করছি। যদি আগামীতে অন্য কোন আপত্তি আমাদের সামনে আসে, তাহলে ইনশাআল্লাহ তার জবাবও পরবর্তী সংস্করণে উপস্থাপন করবো।

আপত্তি নং ১ : তাহাবী ও অন্যান্যরা হযরত আবূ হুরায়রা (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا صَلٰوةَ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ-

'তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন- হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, যখন নামাযের তাকবীর বলা হয়, তখন ফরয নামায ছাড়া অন্য কোন নামায নেই।'

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ফজরের জামাআতের তাকবীর হওয়ার পর দু'রাকআত সুন্নাত পড়া এ হাদীসে শরীফের সুস্পষ্ট বিরোধীতা। কেননা তাকবীর হওয়ার পর শুধুমাত্র ফরয নামাযই পড়া যাবে।

জবাব : এর কয়েকটি জবাব রয়েছে। এক, এ হাদীসটি আপনাদেরও বিরোধী। কেননা আপনারাও বলেন যে, 'ফজরের তাকবীর হওয়ার পর নিজ ঘরে অথবা মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন জায়গায় দু'রাকআত সুন্নাত পড়ে নেবে। যদিও সে স্থানটি মসজিদের সাথে একেবারে সংযুক্তও হয়, অর্থাৎ যেখানে ইমামের ক্বিরাআতের আওয়াজ পৌঁছে এবং সেখান থেকে জামাআত দেখা যায়। এখন আপনারা যে জবাব দেবে, সেটাই আমাদের জবাব।

দুই, কেউ যদি জামাআত শুরু হওয়ার পূর্বে ফজরের সুন্নাত অথবা অন্য কোন ফরয নামায শুরু করে আর ঐ নামায চলাকালীন যদি ফজরের জামাআত শুরু হয়ে যায়, তখন আপনারাও এমতাবস্থায় ঐ নামায ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব বলেন না। বরং জায়িয বলে থাকেন। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি তার নামায শেষ করে জামাআতে শামিল হবে। অথচ উক্ত হাদীস শরীফে বিস্তারিত কিছুই উল্লেখ নেই। তাই এ হাদীসটি মুজমাল' তথা সংক্ষিপ্ত; যার উপর কোনরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ব্যতীত আমল করা সম্ভব নয়।

তিন, এ হাদীসটি 'মারফূ' সহীহ নয়। এটা ঠিক যে, এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রাদ্বি.) এর নিজ অভিমত। যেমন এ ক্ষেত্রে ইমাম তাহাবী প্রচুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষন পূর্বক বর্ণনা করেছেন। আর আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে প্রমাণ করেছি যে, ফক্বীহ সাহাবীগণ ফজরের জামাআত চলাকালীন ফজরের সুন্নাত পড়ে জামাআতে শামিল হতেন। সুতরাং তাঁদের আমল ও অভিমত হযরত আবূ হুরায়রা (রাদ্বি.) এর অভিমতের উপর প্রাধান্য পাবে।

চার, এ হাদীসটির উপর সকলেই আমল করতে পারবেননা। যেমন ছাহিবে তারতীব যার উপর নামায তারতীবের সাথে আদায় করা ফরয, যদি তার ইশার

নামায কাযা হয়ে যায়, আর ফজরের জামাআত আরম্ভ হয়ে যায়, তখন সে আগে ইশার কাযা আদায় করবে,এরপর জামাআতে শরীক হবে। না হয় তারতীবের বিরোধী হবে।

পাঁচ, যদি এ হাদীসটি 'মারফূ' হয়, তবু এর অর্থ এটাই হবে যে, ফজরের জামাআতের তাকবীর হওয়ার পর জামাআতের স্থানে অর্থাৎ কাতারের সাথে মিলে ফজরের সুন্নাত পড়বেনা বরং মসজিদের এক প্রান্তে জামাআত থেকে দূরে দাড়িয়ে পড়বে। যাতে জামাআতের অসম্মান না হয়। হানাফীরা এটাই বলে যে, জামাআতের সাথে মিলে কখনো ফজরের সুন্নাত পড়বে না।

ছয়, বায়হাকী শরীফে উক্ত হাদীসটি এ ভাবেই বর্ণিত হয়েছে-

إِذَا أُقِيْمَتُ الصَّلٰوةُ فَلَا صَلٰوةُ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةُ إِلَّارَكْعَتِى الْفَجْرِ-
(از حاشية طحاوى)

'যখন নামাজের তাকবীর বলা হয় তখন ফরয এবং ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়া বৈধ নয়।'

এ সূরতে আপনাদের আপত্তি মূলোৎপাটিত হয়ে গেল। বায়হাকীর এ বর্ণনা যদি দূর্বলও হয়, তবুও সাহাবায়ে কেরামের আমলের দ্বারা শক্তিশালী হয়ে যায়। সাহাবীদের আমল আমরা প্রথম পরিচ্ছেদেই উল্লেখ করেছি। বিস্তারিত সেখানে দেখুন।

সাত, আপনাদের উপস্থাপিত হাদীসের অর্থ এ যে, নামাযের তাকবীরের পর কোন নফল পড়া বৈধ নয়। অর্থাৎ এটা বৈধ নয় যে, জামাআত চলছে আর অন্য লোক একই স্থানে নফল নামায পড়বে। ফজরের সুন্নাত নফল নয় বরং সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। এ বিশ্লেষন এ জন্য করা হচ্ছে, যাতে হাদীস সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব না থাকে।

আপত্তি নং ২ : তাহাবী হযরত মালিক ইবনে বুহাইনা থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ أُقِيْمَتَ صَلٰوةُ الْفَجْرِ فَاتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رَجُلٍ يُصَلِّىْ رَكْعَتَىَ الْفَجْرِ فَقَامَ عَلَيْهِ وَلَاثَ بِهِ النَّاسَ فَقَالَ اَتُصَلِّيْهَا اَرْبَعًا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ

'একদিন ফজর নামাযের তাকবীর বলা হলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তির পাশে এলেন, যে ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত পড়ছিলো। তিনি তার কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরাও ঐ ব্যক্তিকে ঘিরে ধরলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন, 'তুমি কি ফজরের ফরয চার রাকআত পড়ছো?' একথাটি তিনি তিনবার বললেন।'

এ হাদীস শরীফে ফজরের সুন্নাত সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখিত হয়েছে। যাতে কোন প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের অবকাশ নেই। বুঝা গেল ফজরের জামাআতের সময় ফজরের সুন্নাত পড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

জবাব : (হাদীসে উল্লেখিত) ঐ ব্যক্তিটি ছিলেন 'মালিক ইবনে বুহাইনা'র পুত্র 'আবদুল্লাহ।' তিনি এমন স্থানে ফজরের সুন্নাত পড়ছিলেন যেখানে জামাআত চলছিল। অর্থাৎ কাতারের সাথে মিলে। এটা স্থানগত কারণে 'মাকরূহ' তথা অপছন্দনীয়। হুযূর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্সালাম এ জন্যই ভর্ৎসনা করেছেন। যেমন তাহাবী শরীফেই এ হাদীসেরই একটু আগে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ আছে।

عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّبِعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَهُوَ مُنْتَصِبُ ثَمَّهَ بَيْنَ يَدَىْ نِدَاءِ الصُّبْحِ فَقَالَ لَاتَجْعَلُوْا هٰذِهِ الصَّلٰوةَ كَصَلٰوةِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا وَاجْعَلُوْا بَيْنَهُمَا فَصْلًا-

'মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত- একদিন দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবদুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহাইনার পাশ দিয়ে গমন করলেন। তখন তিনি (আবদুল্লাহ) এমন স্থানে নামাযে দাঁড়ানো ছিলেন যেখান থেকে ফজরের জামাআত একেবারেই সন্নিকটে। তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করলেন, ফজরের সুন্নাতকে যোহরের আগের ও পরের সুন্নাতের মতো পড়ো না। ফজরের সুন্নাত ও ফরযের মাঝখানে ব্যবধান রাখো।

এ হাদীসটি আপনাদের উল্লেখিত হাদীসগুলোকে একেবারে সুস্পষ্ট করে

www.AmarIslam.com

দিয়েছে। অর্থাৎ যদি ফজরের সুন্নাত জামাআত থেকে দূরে দাঁড়িয়ে পড়া হয়, তাহলে কোন রূপ মাকরূহ তথা ত্রুটি ছাড়াই জায়েয। জামাআতের সাথে মিলে পড়া নিষেধ। এটাই আমরা বলছি। এ জন্যই আপনাদের আপত্তির গোড়াই গলদ।

আপত্তি নং ৩ : ফজরের জামাআতের সময় যেহেতু ইমামের তিলাওয়াতের আওয়াজ ঐ ব্যক্তির কানেও পৌছে, তাই ঐ সময় ফজরের সুন্নাত পড়া উচিত নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'যখন কুরআন পাঠ করা হয়,তখন তা মনোযোগ সহকারে শোন এবং চুপ থাকো।' এ জন্য জামাআতের সময় ফজরের সুন্নাত পড়া কুরআনে করীমেরও বিরোধী।

জবাব : এর কয়েকটি জবাব রয়েছে। **এক,** আমরা খুবই আশ্চর্যান্বিত! কারণ এখানে তো আপনারা ফজরের সুন্নাতের ব্যাপারে এ জন্যই নিষেধ করছেন যে, কুরআন তিলাওয়াতের সময় চুপ থাকা ফরয। অথচ আপনারাই ইমামের পিছনে মুকতাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ফরয বলে থাকেন। ইমামের পিছনে 'কিরাআতের সময় আপনাদের এ আয়াতটি কি মনে থাকে না?

দুই, এ আপত্তিটি আপনাদের উপরও পড়ে। আপনারা বলেন যে, মসজিদের বাইরে ফজরের সুন্নাত পড়তে পারবে। যদিও ঐ স্থানটি মসজিদের সাথে একেবারে সংযুক্তও হয়। অর্থাৎ যেখানে কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের আওয়াজ পৌছে।

তিন, কুরআনে পাক শ্রবণ করা, এবং তিলাওয়াতের সময় চুপ থাকা 'ফরযে কিফায়াহ', 'ফরযে আইন' নয়। মুকতাদীদের শ্রবণ ও চুপ থাকাই যথেষ্ট। যদি 'ফরযে আইন' হতো,তাহলে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হতো। এক ব্যক্তির তিলাওয়াতের সময় যতদূর পর্যন্ত তার তিলাওয়াতের আওয়াজ পৌছে, ততদূর পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া, কথা-বার্তা বলা এবং পার্থিব কার্জ কর্ম বন্ধ হয়ে যেতো। এখন বিজ্ঞানের প্রতাপ চলছে, রেডিওতে কুরআন তিলাওয়াত হয়, যার ধ্বনি সমগ্র পৃথিবীতে পৌছে যায়। যদি শ্রবন করা, চুপ থাকা ফরযে আইন হয়, তাহলে মহা মুসিবত। যাই হোক, এ আপত্তিটি নিতান্তই হাস্যস্পদ।

আপত্তি নং ৪ : ফজরের জামাআতের সময় ফজরের সুন্নাত পড়া জামাআতের বিরোধীতা প্রকাশ পায়। যেমন, লোকেরা যখন দাঁড়িয়ে থাকবে,তখন এ ব্যক্তি

(সুন্নাত আদায়কারী) থাকবে রুকূ অথবা সিজদায়, লোকেরা যখন সিজদায় থাকবে সে আত্তাহিয়্যাতে। আর জামাআতের বিরোধীতা করা অত্যন্ত মন্দ কাজ।

জবাব : এ বিরোধীতা তখনই হবে,যখন জামাআতের সাথে মিশে ফজরের সুন্নাত পড়া হবে। এটাকে আমরা ও সম্পূর্ণ মাকরূহ বলি। যদি জামাআত থেকে দূরে মসজিদের এক প্রান্তে অথবা পৃথক কামরায় পড়ে,তাহলে কোন ধরনের বৈরীতা হয় না। বরং জরুরী সময়ে এ বৈরীতাও বৈধ হয়ে যায়। দেখুন- যে মুকতাদীর অযু ভেঙ্গে গেছে,সে অযু করে ফিরে আসতে যদি ইতোমধ্যে দু'য়েক রাকআত হয়ে যায়, তাহলে স্বীয় স্থানে গিয়ে সে প্রথমে নিজের ছুটে যাওয়া রাকআত গুলো আদায় করবে। এরপর জামাআতের সাথে শরীক হবে। (মাঝখানে ছুটে যাওয়া) ঐ রাকআত গুলো আদায় করাতে বাহ্যত জামাআতের বিরোধীতা প্রকাশ পেলেও প্রয়োজন সাপেক্ষে বৈধ। ফজরের সুন্নাতও প্রয়োজনীয়। যদি জামাআত থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আদায় করা হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

www.AmarIslam.com

চতুর্দশ অধ্যায়

কয়েক ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া নিষেধ

প্রত্যেক মুসলমানের উপর সকল নামায ওয়াক্ত অনুযায়ী আদায় করা আবশ্যক। সে মুক্বীম (স্থায়ী বাসিন্দা) বা মুসাফির, অসুস্থ কিংবা সুস্থ হোক। কিন্তু লা-মাযহাবী ওহাবীরা সফরের অবস্থায় যোহর ও আছর এবং মাগরিব ও ইশা একই সময়ে মিলিয়ে পড়ে। অর্থাৎ আছরের সময় যোহর ও আছর এবং ইশার সময় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করে।

তাদের এ আমল কুরআন শরীফ ও সহীহ হাদীস সমূহের সম্পূর্ণ বিপরীত।

আমরা এ অধ্যায়কে ও দুটো পরিচ্ছেদে ভাগ করছি। প্রথম পরিচ্ছেদ হানাফী মাযহাবের দলীলাদি; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লা-মাযহাবী ওহাবীদের আপত্তি সমূহের জবাব দিয়েছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রত্যেক নামায তার ওয়াক্ত অনুযায়ী আদায় করা ফরয। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ওযর (অপারগতা) ছাড়া কোন নামায ওয়াক্তের পরে পড়া শক্ত গুনাহ এবং নিষিদ্ধ। প্রমানাদি নিম্নরূপ)

(১) রব তাআলা নামাযের সময় সম্পর্কে ইরশাদ করেন-

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا

"মুসলমানদের উপর ওয়াক্ত অনুযায়ী নামায ফরয।"

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, যেমনিভাবে নামায ফরয, ঠিক তেমনি প্রত্যেক নামায ওয়াক্ত অনুযায়ী পড়াও ফরয। নামায পরিত্যাগকারী যে রূপ গুনাহগার, তেমনিভাবেই কোন ওযর (অপারগতা) ছাড়া ভিন্ন সময়ে নামায আদায়কারীও অপরাধী। এ আয়াতে মুক্বীম (স্থায়ী) ও মুসাফিরের ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। প্রত্যেক মুমিনের জন্যই এ হুকুমটি প্রযোজ্য।

(২) রব তাআলা ইরশাদ করেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ

'অনিষ্ট ঐ সব নামাযীর জন্য, যারা স্বীয় নামাযে অলসতা করে।'

এ আয়াতে করীমায় অলসতার সাথে নামায আদায়কারীদের ব্যাপারে ভর্ৎসনা রয়েছে। কোন ওজর ব্যতীত ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পর নামায পড়া অলসতার অর্ন্তভূক্ত। বরং সেটা সব চেয়ে বড় অলসতা।

(৩) রব তাআলা ইরশাদ করেন-

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ-

'নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ করো।'

কুরআন করীম কোথাও নামায পড়ার নির্দেশ দেয়নি। সবখানে নামায প্রতিষ্ঠা করার হুকুম দিয়েছে। নামায কায়েম করা মানে নামায নিয়মিত পড়া, সঠিক ভাবে পড়া, সঠিক সময়ে পড়া। নির্দিষ্ট ওয়াক্তের পরে নামায পড়া নামায কায়েমের বিরোধী।

(৪) রব তাআলা মুত্তাকীদের পরিচয় এ ভাবেই দিচ্ছেন-

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ-

'কুরআন ঐ সব মুত্তাকীর জন্য পথ প্রদর্শক, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করে এবং আমার দেয়া সম্পদ থেকে ব্যয় করে।' বুঝা গেল যে, মুত্তাকী ও পরহেযগার হলো ঐ ঈমানদার ব্যক্তি যে নামায কায়েম করে। অর্থাৎ প্রত্যেক নামায নির্দিষ্ট সময়ে পড়ে এবং নিয়মিত পড়ে, চাই মুক্বীম (স্থায়ী) হোক কিংবা মুসাফির। সফরে যোহর অথবা আছরের সময় নষ্ট করে নামায পড়া এ আয়াত সমূহের সুস্পষ্ট বিরোধীতা প্রকাশ পায়।

(৫-৬) ইমাম মুসলিম ও বুখারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الصَّلٰوةُ لِوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ

اَىُّ قَالَ اَلْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِيْ-

'তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সবচেয়ে উত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন, 'নির্দিষ্ট সময়ে নামায পড়া'। আমি বললাম, এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, 'পিতা-মাতার সেবা'। আমি বললাম- এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।' হযরত আবূ হুরায়রা (রাদ্বি.) বলেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এ কথাগুলো বললেন। যদি আমি আরো প্রশ্ন করতাম, তাহলে তিনি আরো অধিক বলতেন।'

(৭-১০) আহমদ, আবূ দাঊদ, মালিক ও নাসাঈ প্রমুখ হযরত উবাদা ইবনে ছামিত (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ اَحْسَنَ وُضُوْءَ هُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدًا اَنْ يَغْفِرَ لَهُ الخ-

"তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, রব তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে মুসলমান সুন্দর ভাবে অযু করে, ঐ নামায গুলো নির্ধারিত সময়ে আদায় করে, নামাযের প্রতিটি রুকূ ভালো ভাবে সম্পন্ন করে এবং বিনয় ও একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

(১১) তিরমীযী হযরত আলী মুরতাদ্বা (রাদ্বি.)) থেকে বর্ণনা করেন-

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاعَلِيُّ ثَلٰثٌ لَاتُؤَخِّرْهَا الصَّلٰوةُ اِذَا اَتَتْ وَالْجَنَازَةُ اِذَا حَضَرَتْ وَالْاَيِّمُ اِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا-

"নিশ্চয়ই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন- তিনটি বিষয়ে কখনো বিলম্ব করো না ---যখন (১) নামাযের সময় হয়, (২)

জানাযা উপস্থিত হয়, (৩) মেয়ের উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায়।

(১২-১৪) আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাঊদ হযরত উম্মে ফারদাহ থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلٰوةُ لِاَوَّلِ وَقْتِهَا-

"তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট জানতে চাওয়া হলো, সর্বোত্তম আমল কোন্ টি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'ওয়াক্তের শুরুতে নামায পড়া'।

(১৫) ইমাম মুসলিম হযরত আনাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰى اِذَا اصْفَرَّتْ وَكَانَتْ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لَايَذْكُرُ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا-

"তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন- মুনাফিকের নামায হলো - তারা সূর্য হলদে রং ধারণ করার অপেক্ষায় বসে থাকে। আর যখন সূর্য শয়তানের উভয় শিংয়ের মাঝখানে পৌঁছে যায়, তখন চারটা ঠোকর মারে, যেটাতে তারা খুব অল্পই আল্লাহর যিকর করে।'

এ ধরনের অসংখ্য হাদীস রয়েছে, যে গুলোতে নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করার তাগিদ এবং দেরী করে কিংবা মাকরূহ সময়ে নামায আদায় করার ব্যাপারে কঠোর নিন্দা রয়েছে, এটাকে মুনাফিকের আমল বলা হয়েছে। এখানে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করা হলো। আফসোস ঐ সব ওহাবী গায়রে মুকাল্লিদের জন্য, যারা ঘর থেকে দু মাইল দূরে গিয়ে সফরের অজুহাতে ওয়াক্ত নষ্ট করে নামায পড়ে থাকে। না কোন অপারগতা রয়েছে, না ওজর। নফসে আম্মারার (কুপ্রবৃত্তি) প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। সময় মতো আহার করলো; পার্থিব সমস্ত কাজ কর্মও করলো খুব ভালো ভাবেই, কিন্তু নামাযের ক্ষেত্রে করলো তার বিপরীত, যা ইসলামের প্রধান ফরয এবং সর্বোচ্চ রুকন। মুসলমানদের উচিত এ সব ওহাবীদের থেকে দূরে থাকা আর সফর ও স্থায়ী থাকা অবস্থায় নির্ধারিত সময়ে নামায পড়া।

বিবেকও বলে যে, ভ্রমণের সময় প্রত্যেক নামায নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা;

যোহরকে আছরের সময় এবং মাগরিবকে ইশার সময় না পড়া। কেননা শরীয়ত পাঁচ ওয়াক্ত, জুমুআ, দুই ঈদ, তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত ইত্যাদি প্রত্যেক নামাযের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্ধারিত করেছে। অর্থাৎ সে সব নামাযের কোনটিকেই অন্য নামাযের সময় আদায় করা যাবে না। মুসাফির ব্যক্তি সফরের সময় ফজর, আছর ও ইশার নামায নির্ধারিত সময়েই পড়ে থাকে। অনুরূপ ভাবেই যদি মুসাফির তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত ও জুমুআর নামায আদায় করে, তাহলে ঐ নামাযগুলোর নির্ধারিত সময়েই আদায় করবে। এমন করবে না যে, তাহাজ্জুদ নামায সূর্যোদয়ের পর, জুমুআর নামায আছরের সময়, ফজরের নামায সূর্যোদয়ের পর কিংবা ইশার নামায সুবহে সাদিক হওয়ার পর পড়বে। তাহলে যোহর ও মাগরিব কি দোষ করলো যে, মুসাফির যোহরকে আছরের সময় এবং মাগরিব ইশার সময় পড়বে? অথচ ভ্রমণেও ঐ দু'নামাযের সময় ওটাই, যা স্থায়ীভাবে অবস্থানের ক্ষেত্রে নির্ধারিত।

দুই, ওহাবী সাহেবরা বলুন, যদি সে সফরে যোহরকে আছরের সময় এবং মাগরিবকে ইশার সময় আদায় করে, তাহলে এ যোহর ও মাগরিব আদায় হবে, না ক্বাযা?

যদি ক্বাযা হয়, তাহলে জেনে শুনে নামায ক্বাযা করা শক্ত গুনাহ। আর যদি আদায় হয়, তাহলে হযরত জিব্রীল আমীন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খিদমতে প্রত্যেক নামাযের জন্য নির্ধারিত সময় পেশ করলেন কেন? তখন তো এটা বলেননি যে, মুসাফিরের জন্য যোহরের সময় সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং মাগরিবের সময় সুবহে সাদিক পর্যন্ত থাকবে। বরং প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই যোহরের সময় আছরের পূর্বে এবং মাগরিবের সময় ইশার পূর্বে শেষ হওয়ার বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এরপরও তোমরা ঐ দু নামাযের সময়ে এ ধরনের বৈপরীত্য কোত্থেকে বের করলে? মুসলমানদের নামায নষ্ট করলে কেন?

যাহোক, পাঁচটি নামাযের সময় মুসাফির ও মুক্বীম (স্থায়ী বাসিন্দা) সকলের জন্য একই। প্রত্যেক মুসলমানের উপর সকল নামায নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ফরয।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলার ব্যাপারে আপত্তি ও জবাবসমূহ

এ মাসআলার ব্যাপারে লা-মাযহাবী ওহাবীরা আজ পর্যন্ত যে সমস্ত

অভিযোগ করেছে, আমরা তার সবই উল্লেখ পূর্বক সে গুলোর জবাবও পেশ করছি। আগামীতে যদি অন্য কোন আপত্তি আমরা জানতে পারি, তাহলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে এর জবাবও পেশ করা হবে।

আপত্তি নং ১ : ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اِذَا كَانَ عَلٰى ظَهْرِ سَيْرٍ وَّيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ-

"তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরের সময় যোহর ও আছরের নামায একত্রে পড়তেন এবং মাগরিব ও ইশার নামাযও একত্রিত করতেন।"

এ হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমীযী, ইমাম মালিক, (মুয়াত্তায়) ইমাম মুহাম্মদ (মুয়াত্তার) : তাহাবী সহ অনেক মুহাদ্দিস বিভিন্ন রাবী (বর্ণনাকারী) থেকে কিছুটা পার্থক্য সহকারে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসখানাই ওহাবীদের চূড়ান্ত দলীল, যেটাকে তারা খুবই মজবুত দলীল মনে করে।

জবাব : এর কয়েকটি জবাব রয়েছে। মনোযোগ সহকারে দেখুন-

এক, স্বয়ং আবূ দাউদ ও তাহাবী প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকেই এটাও বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন সফরও আশংকা ছাড়াই মদীনা মুনাওয়ারাতেও যোহরও আছর তদ্রুপ মাগরিব ও ইশা একত্রিত করতেন। উদাহরণ স্বরূপ আবূ দাউদ শরীফের শব্দাবলী নিম্নরূপ-

قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِيْنَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَّلَا مَطَرٍ-

"হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন ধরনের বৃষ্টি ও ভয় ছাড়াই মদীনা মুনাওয়ারায় যোহর ও আছর এবং মাগরিব ও ইশার নামায একত্রিত করতেন।"

বরং খোদ আবূ দাউদ ও তাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকেই বর্ণনা করেন যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনা মুনাওয়ারায়

সাত এমনকি আট নামাযকে মিলিয়ে পড়তেন। যেমন- আবূ দাউদ শরীফের শব্দাবলী নিম্নরূপ-

قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ ثَمَانِيًا وَّسَبْعًا، اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ-

"হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনা মুনাওয়ারায় আমাদেরকে সাত আট নামাযকে একসাথে পড়িয়েছেন। যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা।"

তাহলে হে ওহাবীরা! তোমরা শুধুমাত্র সফরের ক্ষেত্রে কেবল যোহর ও আছর কিংবা মাগরিব ও ইশার নামাযের ব্যাপারে কেন গলাবাজি করো? তোমাদের উচিত রাফিযীদের মতো সাত-সাত, আট-আট নামাযকে এক নিঃশ্বাসে পড়ে আরাম করা, সফরে থাক, কিংবা ঘরে। তোমরা কিছু হাদীসকে মানছো আবার কিছু হাদীস অস্বীকার করছো?

দুই, তোমাদের পেশকৃত বুখারী শরীফের বর্ণনার মধ্যে এটা উল্লেখিত রয়েছে যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহর ও আছর একত্রিত করেছেন। কিন্তু সেখানে এটা স্পষ্ট নয় যে, কি ভাবে একত্রিত করেছেন। অর্থাৎ তিনি কি আছরকে যোহরের সময় পড়েছেন, না যোহরকে আছরের সময়। তদ্রুপ তিনি ইশার সময় মাগরিব পড়েছেন, না মাগরিবের সময় ইশা। তাই এ হাদীসটি মুজমাল তথা সংক্ষেপিত। আর মুজমাল হাদীস ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া আমলযোগ্য নয়।

তিন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরের সময় ঐ নামাযগুলোকে এক সাথে পড়ার কারণ ছিল ভ্রমনের অপারগতা তথা বিভিন্ন অসুবিধা। অধিক প্রয়োজনের সময় অনেক নিষিদ্ধ কাজ বৈধ হয়ে যায়। আর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দু'নামাযকে একত্রিতকরণটাও ছিল বাহ্যিক দৃষ্টিতে, বাস্তবে নয়। অর্থাৎ হুযূর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম যোহরকে আছরের সময় পড়েননি। বরং সফর করতে করতে যোহরের শেষ সময়ে নামাযের জন্য দাঁড়ালেন এবং যোহর নামায আদায় করলেন। এরপর যখন আছরের সময় হলো তখন প্রথম সময়েই আছরের নামায আদায় করলেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হলো হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'নামাযকে একই সময়ে আদায় করেছেন, আথচ প্রত্যেক নামায নির্দিষ্ট সময়েই আদায়

www.AmarIslam.com

হয়েছে। অর্থাৎ যোহর ও মাগরিব শেষ সময়ে আদায় করেছেন আর আছর ও ইশা প্রথম সময়ে আদায় করেছেন।

এ ক্ষেত্রে এ হাদীসটি না কুরআনের বিরোধী হলো, না ঐ সব হাদীসের, যা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। নামাযকে এ ভাবে একত্রিত করা সম্পূর্ণ বৈধ। এটাই আমাদের মাযহাব।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) এর ঐ হাদীস, যা তাহাবী ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে- হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনা মুনাওয়ারায় কোন ধরনের ভয় কিংবা বর্ষণ ছাড়া সাত আট নামাযকে মিলিয়ে পড়তেন- ওখানে সাত আট নামায উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ হলো সাত আট রাকআত। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে (যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি) মাগরিব ও ইশা একত্রিত করেছেন। তখন উভয় নামাযের ফরযগুলো মিলে মোট সাত রাকআত হয়ে গেল। তিন রাকআত মাগরিবের চার রাকআত ইশার। আর যোহর ও আছর একত্রিত করলে আট রাকআত হয়ে যায়। চার রাকআত যোহরের। চার রাকআত আছরের।

যেহেতু এ একত্রিতকরণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে ছিলো, বাস্তবে নয়; তাই তা সফরেও বৈধ ছিলো এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্যও। জায়েয বলার জন্য, হাদীস বুঝার জন্য শরয়ী জ্ঞান এবং হাদীসের মালিক মাহবূব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে গোলামীর বন্ধন থাকতে হবে- যা থেকে ওহাবীরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

উক্ত অর্থের প্রমাণ

কয়েক নামাযকে একত্রিত করার অর্থ আমরা যেটা বর্ণনা করেছি তার প্রমাণ অনেক হাদীসের দ্বারা সাব্যস্ত হয়। যার মধ্য থেকে কিছু হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে। শুনুন এবং শিক্ষা লাভ করুন।

হাদীস ১ : তাবরানী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাদ্বি.)থেকে বর্ণনা করেন-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُؤَخِّرُ هٰذِهٖ فِيْ اٰخِرِ وَقْتِهَا وَيُعَجِّلُ هٰذِهٖ فِيْ اَوَّلِ وَقْتِهَا-

www.AmarIslam.com

"নিশ্চয়ই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মাগরিব ও ইশা এ ভাবে মিলাতেন যে, মাগরিব শেষ সময়ে এবং ইশা প্রথম সময়ে আদায় করতেন।"

হাদীস নং ২ : বুখারী শরীফে হযরত সালিম থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যার কয়েকটি শব্দ নিম্নরূপ-

وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَيُقِيْمُ الْمُغْرِبَ فَيُصَلِّيْهَا ثَلٰثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّهَا يَلْبِثُ حَتّٰى يُقِيْمُ الْعِشَاءَفَيُصَلِّيْهَا رَكْعَتَيْنِ-

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) ও হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মতো আমল করতেন। অর্থাৎ তিনি সফরের সময়ের স্বল্পতার দরূণ মাগরিবের তাকবীর বলে তিন রাকআত আদায় করতেন। এরপর কিছুক্ষণ বসতেন। অতঃপর ইশার তাকবীর বলে চার রাকআত ইশার ফরয আদায় করতেন।

হাদীস নং ৩ : নাসাঈ হযরত নাফে থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ اِبْنِ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ سَارَبْنَا حَتّٰى اَمْسَيْنَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ نَسِيَ الصَّلٰوةَ فَقُلْنَا لَهُ الصَّلٰوةُ فَسَكَتَ وَسَارَ حَتّٰى كَادَا الشَّفَقَ أَنْ يَغِيْبَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلّٰى وَغَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ هٰكَذَا كُنَّا نَصْنَعُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ-

"তিনি বলেন, আমরা হযরত ইবনে উমর (রাদ্বি.) এর সাথে মক্কা মুআয্যামাহ থেকে অগ্রসর হলাম। যখন সন্ধ্যা হলো তখনও তিনি থামলেন না। আমরা মনে করলাম তিনি নামাযের কথা ভুলে গিয়েছেন। আমরা তাঁকে নামাযের কথা বললাম। তিনি কিছুই বললেন না এবং চলতেই থাকলেন। এ দিকে শাফাক্ব (পশ্চিম দিকের সান্ধ্য লালিমা) বিলুপ্ত হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসলেই তিনি (বাহন থেকে) নামলেন এবং মাগরিবের নামায পড়লেন এরপরই শাফাক অদৃশ্য হয়ে গেল। অতঃপর তিনি ইশার নামায পড়লেন। এরপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, আমরা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে থাকাবস্থায় ও এরূপই করতাম, যখন সফরের তাড়া থাকতো।"

এ ধরনের অসংখ্য হাদীস রয়েছে, যে গুলোতে সুস্পষ্ট ভাবে ইরশাদ হয়েছে যে, সফরে আছর ও যোহর কিংবা মাগরিব ও ইশা কেবল দৃশ্যত মিলিয়ে পড়া যাবে। অর্থাৎ মাগরিব তার শেষ সময়ে পড়া হবে- ইশা প্রথম সময়ে। যোহরকে আছরের সময়, মাগরিব ইশার সময় পড়া যাবে না।

উক্ত হাদীসগুলো বিস্তারিত জানতে তাহাবী শরীফ ও সহীহ বিহারী শরীফ অধ্যয়ন করুন।

আমরা শুধু তিনটি হাদীসকেই যথেষ্ট মনে করেছি। তাই হানাফীদের প্রমাণ পেশকরণ সম্পূর্ণ সঠিক। এর সমর্থন কুরআন করীমে যেমন রয়েছে, তেমনি অন্যান্য হাদীসেও। অপর দিকে ওহাবীদের নির্দেশিত পন্থা একেবারেই বাতিল। কারণ তা কুরআন করীম ও হাদীস সমূহের সম্পূর্ণ বিরোধী।

হে ওহাবীরা! যদি তোমরা ঐ হাদীসগুলোর কারণে সফরে (নামায) বাস্তবিকভাবে একত্রিতকরণকে সমর্থন করো,তাহলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের হাদীসের অনুসরণে স্থায়ী ভাবে অবস্থানের বেলায় সাত বরং আট নামাযকে এক নিঃশ্বাসে পড়ে নাও। এ হাদীসটি আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। যদি তোমরা ঐ (ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) এর) হাদীসে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মিলানোর অর্থ নাও, তাহলে এখানে কেন 'বাস্তবে একত্রিতকরণের' অর্থ নিচ্ছো? কিছু হাদীসের উপর ঈমান আনছো আর অন্য গুলো অস্বীকার করছো?

আপত্তি নং ২ : বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত হাদীসের কয়েকটি শব্দ এরূপ-

قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اِرْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلٰى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا-

"তিনি বলেন, যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পূর্বে সফরে বেরুতেন তখন যোহরকে 'আছরের সময় পর্যন্ত' বিলম্বিত করতেন। অতঃপর বাহন থেকে নেমে উভয় নামায (যোহর ও আছর) এক সাথে পড়তেন।"

এ হাদীসে পরিষ্কার ভাবে জানা গেল যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহর আছরের সময় পড়তেন। যা إِلَى الْعَصْرِ "আছর পর্যন্ত" দ্বারা সুস্পষ্ট হয়েছে।

জবাব : তোমরা এ হাদীসের ভুল অনুবাদ করেছো। الى দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আছরের সময়ের পূর্বেই বাহন থেকে অবতরণ করতেন। এখানে غايت তথা প্রান্ত সীমা (আছরের সময়) مغيا তথা বিলম্বিত করার সময়ের বহির্ভূত, অর্ন্তভূক্ত নয়। আছর পর্যন্ত বিলম্বিত করার অর্থ হলো আছরের সময়ের কাছাকাছি পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন। যা ১ নং আপত্তির জবাবে প্রদত্ত হাদীস সমূহ দ্বারা প্রতিভাত হয়েছে। এ জন্য এ হাদীসের অর্থ দৃশ্যত: মিলানো' বাস্তবে নয়।

আপত্তি নং ৩ : তাহাবী হযরত নাফে থেকে বর্ণনা করেন। যার কয়েকটি শব্দ নিম্নরূপ-

حَتّٰى اِذَا كَانَ عِنْدَ غَيْبُوْبَةِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰكَذَا اِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ-

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) চলতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত শাফাক্ব (পশ্চিম দিকের সান্ধ্য লালিমা) অদৃশ্য হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসলো। তখন তিনি বাহন থেকে অবতরণ করলেন। অতঃপর মাগরিব ও ইশা একত্রিত করলেন। এবং বললেন, আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এরূপ করতে দেখেছি- যখন সফরের তাড়া থাকতো।"

এ হাদীস শরীফে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.)সান্ধ্য লালিমা অদৃশ্য হওয়ার সময় অবতরণ করেছেন। সুতরাং অবশ্যই তিনি মাগরিব ইশার ওয়াক্তে আদায় করেছেন।

জবাব : এ আপত্তিও তোমাদের ভুল বোঝার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। এ হাদীসের অর্থ এটা কি ভাবে হয় যে, তিনি সান্ধ্য লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পর অবতরণ করেছেন? এটাতো স্পষ্ট যে, যখন সান্ধ্য লালিমা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল অর্থাৎ অদৃশ্য হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছিলো তখন তিনি অবতরণ করেছেন। মাগরিবের নামায পড়ার সাথে সাথে শাফাক দূর হয়ে গেল এবং ইশার ওয়াক্ত এসে গেল। আর তিনি ইশা পড়ে নিলেন। আমরা প্রথম আপত্তির জবাবে সেই হযরত ইবনে উমর (রাদ্বি.) এরই আমল শরীফ উল্লেখ করেছি, যাতে সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মাগরিব শেষ ওয়াক্তে এবং ইশা প্রথম ওয়াক্তে পড়েছেন। ঐ হাদীসটি তোমাদের এ হাদীসের তাফসীর তথা ব্যাখ্যা।

www.AmarIslam.com

আপত্তি নং ৪ : যদি প্রত্যেক নামায নির্দিষ্ট সময়েই পড়তে হয় এবং সফর ও অন্যান্য ওজরের ক্ষেত্রেও এক নামাযকে অন্য নামাযের ওয়াক্তে পড়া গুনাহ হয়, তাহলে হাজ্বীরা আরাফাতে জিলহজ্বের নয় তারিখে যোহরও আছর একসাথে যোহরের সময় কেন পড়ে? আবার ১০ ই জিলহজ্ব রাতে মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে ইশার ওয়াক্তে কেন পড়ে? হানাফীরাও ওখানে নামায একত্রিতকরণকে বৈধ বলে থাকে। যখন হজ্বের ক্ষেত্রে যোহর ও আছর নামায এবং মাগরিব ও ইশা বাস্তবিক ভাবে একই ওয়াক্তে একত্রিত হলো, তাহলে সফরেও পড়লে অসুবিধা কোথায়? হে হানাফীরা! তোমরা কুরআনী আয়াত ও এ হাদীসগুলো হজ্বের বেলায় ভুলে যাও কেন? (এটা ওহাবীদের সর্বশেষ চূড়ান্ত অভিযোগ।)

জবাব : জনাব আরাফাতে আছর যেমনি যোহরের ওয়াক্তে আদায় করা হয় না,তেমনি মুযদালিফায়ও মাগরিবকে ইশার ওয়াক্তে পড়া হয় না। বরং তথায় হাজ্বীদের জন্য আছরের ওয়াক্ত পরিবর্তিত হয়ে যোহর এবং মাগরিবের ওয়াক্ত পরিবর্তিত হয়ে ইশা হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে মাগরিবের ওয়াক্ত শাফাক (সান্ধ্য লালিমা) দূর হওয়ার পর আরম্ভ হয় এবং আছরের সময় যোহর পড়ার সাথে সাথেই শুরু হয়ে যায়। যেমন বিতরের ওয়াক্ত ইশার ফরয পড়ার সাথে সাথেই শুরু হয়। সুতরাং ওখানে নামায নির্দিষ্ট সময় থেকে সরে যায়নি। বরং নামাযের ওয়াক্তসমূহ পরিবর্তিত হয়েছে। নামাযগুলো নির্দিষ্ট সময়েই হয়েছে। আর তোমরা সফরে নামায সমূহকে নির্দিষ্ট সময় থেকে সরিয়ে দিচ্ছো। সময় পরিবর্তিত হওয়া এবং নামায পরিবর্তিত হওয়ার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান।

এর বিশদ প্রমাণ হলো, যদি ইমাম আরাফাতে যোহর এবং আছর সব সময়ের জন্য নির্ধারিত ওয়াক্তে পড়ে, তাহলে বড় গুনাহগার হবে। কারণ তা আছর কাযা করার মতই হবে। আর যদি ঐ দিন মাগরিবের নামায প্রচলিত ওয়াক্তে এবং ইশা নির্দিষ্ট সময়ে পড়ে তাহেল মাগরিবের নামায হবেই না। এবং এরূপ করলে বড় গুনাহগার হবে। কারণ সে মাগরিবের নামায ওয়াক্তের পূর্বে পড়েছে। বুঝা গেলো যে, আজ (আরাফাতে) ঐ নামাযগুলো ওয়াক্তই পরিবর্তিত করা হয়েছে। কিন্তু যদি মুসাফির যোহর ও আছর একত্রিত না করে, বরং যোহর তার নির্দিষ্ট ওয়াক্তে এবং আছর তার নির্দিষ্ট ওয়াক্তে পড়ে, তেমনিভাবে মাগরিব এবং ইশাও নির্ধারিত সময়ে আদায় করে,তখন তোমরাও তাদেরকে গুনাহগার মনে করো না- কোন মাকরূহ তথা অপছন্দনীয় হওয়া ছাড়াই বৈধ বলো। বুঝা

www.AmarIslam.com

গেল, তোমাদের মতেও সফরের ক্ষেত্রে নামাযের ওয়াক্ত পরিবর্তিত হয় না। বরং নামায ভিন্ন সময়ে আদায় করা হয়।

তাই হাজীদের আরাফাহ ও মুযদালিফার নামাযগুলো না কুরআনী আয়াত সমূহের বিরোধী, না হাদীসগুলোর বিপরীত। সেখানে প্রত্যেক নামায নির্দিষ্ট সময়েই আদায় হয়। আর মুসাফির বাস্তবিক ভাবে নামাযগুলো মিলিয়ে পড়া কুরআন করীম ও হাদীস সমূহের বিরোধী।

হজ্বের মধ্যে নামাযের ওয়াক্ত সমূহের পরিবর্তন মাশহুর হাদীস বরং 'হাদীসে মুতাওয়াতির মা'নবী' দ্বারা সাব্যস্ত। এক্ষেত্রে এমন ভাবে আমল করা ওয়াজিব, যেমন কুরআনের আয়াতগুলোর উপর আমল করা আবশ্যক।

আমরা এখানে নামায একত্রিত করার মাসআলা সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোকপাত করেছি। এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেখতে আমার প্রণীত সহীহ বুখারী শরীফের হাশিয়া 'নাঈমুল বারী'তে এ অধ্যায়টি অধ্যয়ন করুন। ইনশাআল্লাহ তাতে পর্যবেক্ষক মহল উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে বুঝতে পারবেন যে, হানাফী মাযহাব আল্লাহর রহমতে খুবই মজবুত, দলীল ভিত্তিক, অত্যন্ত শক্তিশালী এবং কুরআন মাজীদ ও হাদীস সমর্থিত।

ওহাবীরা অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত। তাদের মাযহাবের ভিত্তিও সম্পূর্ণ ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ হানাফী মাযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

www.AmarIslam.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

সফরের দূরত্ব তিন দিনের রাস্তা

ইসলামী শরীয়ত মুসাফিরের জন্য সহজ করে চার রাকআত ফরয নামাযের ক্ষেত্রে চারের পরিবর্তে দু'রাকআত নির্ধারিত করেছে। কিন্তু মাযহাব বিরোধী ওহাবীরা শুধুমাত্র কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় নামায কম পড়ার জন্য সফরকে এমন ব্যাপক করে ফেলেছে যে, (আল্লাহর পানাহ) ঘর থেকে ক্ষেত দেখার জন্য গেলো আর মুসাফির বনে গেল। ভ্রমণ ও আমোদ-প্রমোদ করতে শহর থেকে এক আধ মাইল বাইরে গিয়েই মুসাফির হয়ে গেলো এবং নামায কমিয়ে দিলো।

শরীয়তে সফরের দূরত্ব হলো তিন দিনের রাস্তা। অর্থাৎ যখন কেউ নিজ বাসস্থান থেকে তিন দিনের দূরত্বে যাওয়ার ইচ্ছা করে বের হয়, তখন সে মুসাফির। তখন তার উপর কেবলমাত্র চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে ক্বাসর ওয়াজিব। অর্থাৎ চার রাকআতের পরিবর্তে দু'রাকআত পড়বে।

এ তিন দিনের স্বাভাবিক দূরত্ব নিরাপদ রাস্তাগুলোতে প্রায় ৫৭ (সাতান্ন) মাইল হয়। প্রতি মনযিল ১৯ মাইল হিসেবে তিন মনযিল মোট ৫৭ মাইল এবং টিলা ও পাহাড়ী রাস্তা এর চেয়ে কম হবে। মোট কথা তিন দিনের রাস্তাই ধর্তব্য।

হাজীদের জন্য জরুরী নির্দেশিকা

বর্তমানে হারামাইন তাইয়িবাইনে (মক্কা ও মদীনা শরীফ) নজদীদের শাসন চলছে। নজদী ইমাম হজ্বের সময় মক্কা মুয়ায্যামাহ থেকে মিনা ও আরাফাতে এসে কাস্র নামায আদায় করে থাকে। অথচ মক্কা মুয়ায্যামাহ থেকে মিনা'র দূরত্ব মাত্র তিন মাইল এবং আরাফাতের দূরত্ব নয় মাইল। হানাফী মাযহাবের মতে উক্ত ইমাম কাস্র করতে পারে না। এ জন্যই হানাফীরা এদের পিছে কখনোই নামায পড়েনা। নয়তো নামাযই হবে না।

এ ক্ষেত্রে শাফিঈ অথবা হাম্বলী মাযহাবের ইমামের ৮ই যিলহাজ্জাহ তারিখে মক্কা মুকাররামা থেকে ৫৭ মাইল দূরে চলে যাওয়া উচিত। এরপর ফিরে এসে মিনা ও আরাফাতে কাস্র পড়বে। যাতে হানাফীদের নামায গুলোও তাদের পিছে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শুদ্ধ হয়। এ ব্যাপারে হাজ্বীদের খুবই সর্তক থাকা উচিত। এ অধ্যায়কেও আমরা দুটো পরিচ্ছেদে ভাগ করছি। প্রথম পরিচ্ছেদে সফরের উক্ত দূরত্বের প্রমাণ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ মাসআলার ব্যাপারে আপত্তি সমূহের জবাব দেয়া হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সফরের দূরত্ব তিন দিন হওয়ার প্রমাণ

সফরের দূরত্ব ন্যুনতম তিন দিনের রাস্তা। এর চেয়ে কম দূরত্ব শরীয়তের দৃষ্টিতে সফর নয়। এর চেয়ে কম দূরত্বে সফরকারী ব্যক্তির উপর সফরের বিধানাবলী প্রযোজ্য নয়। এর দলীল সমূহ নিম্নরূপ -

(১) ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর র থেকে বর্ণনা করেন-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ إِلَّامَعَ ذِيْ رَحْمٍ–

"নিশ্চয়ই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, নারী স্বীয় নিকটাত্মীয় ছাড়া তিন দিনের দূরত্বে সফর করবে না।"

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো যে, নারীর জন্য একাকী সফর করা হারাম। রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সফর করতে পারবে। সফরের সীমা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিন দিন বলেছেন। সুতরাং বুঝা গেলো সফরের দূরত্ব তিন দিন।

(২) ইমাম মুসলিম হযরত আলী (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ–

"হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মোজার উপর মাস্‌হের সময়সীমা মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুকীমের (স্থায়ী বাসিন্দার) জন্য একদিন এক রাত নির্ধারণ করেছেন।"

হাদীস নং ৩-৯ : আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান, তাহাবী, আবূ দাঊদ তায়ালুসী, তাববাণী, তিরমিযী হযরত খুযায়মা ইবনে সাবিত আনসারী এবং

অন্যান্যদের থেকে বর্ণনা করেন-

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ–

"তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন- হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, মুক্বীমের জন্য মোজার উপর মাস্‌হের সময় সীমা একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত।"

হাদীস নং ১০-১২ : আছরাম স্বীয় সুনানে, ইবনে খুযায়মা দারু কুত্বনী হযরত আবূ বাকরাহ (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً اِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ اَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا وَقَالَ الْخَطَّابِىْ هُوَ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ– (مشكوة)

"তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন- হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসাফিরকে তিনদিন তিনরাত এবং মুক্বীমকে একদিন একরাত মাস্‌হ করার অনুমতি দিয়েছেন, যদি অযু করে মোজা পরিধান করে থাকে। খাত্তাবী বলেন, এ হাদীসটির ইসনাদ সহীহ।" (মিশকাত)

হাদীস ১৩-১৫ : তিরমিযী ও নাসাঈ হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্‌সাল থেকে রিওয়ায়াত করেন-

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا اِذَا كُنَّا سَفْرًا اَنْ لَانَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ– الخ (مشكوة)

"হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে হুকুম দিতেন যে, সফরে থাকা অবস্থায় আমরা যেন তিন দিন তিন রাত মোজা না খুলি।" (মিশকাত)

এ হাদীস শরীফগুলো থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক মুসাফিরের জন্য তিন দিন মোজার উপর মাস্‌হ করার অনুমতি রয়েছে। কোন মুসাফির এ বিধান থেকে পৃথক নয়। যদি তিন দিনের কম দূরত্বও সফর হয়, তাহলে এ (মোজার উপর মাস্‌হের) অনুমতির দ্বারা বহু মুসাফির উপকৃত হতে পারবে না।

উদাহরণ স্বরূপ, যদি ওহাবী নিজের ক্ষেত পরিদর্শনের জন্য এক মাইল

দূরে গিয়ে মুসাফির হয়ে যায় (সে যেন) তাহলে তিনদিন মাস্‌হ করে দেখায়। তদ্রুপ যে লোক এক দিন চলার পর ঘরে পৌছে যায়, সে এ (মাস্‌হের) অনুমতি দ্বারা কি ভাবে উপকৃত হবে?

এ জন্য তিন দিনের কমে সফর হতেই পারে না। তা না হলে মোজার উপর মাস্‌হের বিধান সম্পর্কিত এ হাদীস সমূহ সাধারণভাবে আমলযোগ্য থাকবে না। এ দলীল গভীর ভাবে চিন্তার বিষয়।

হাদীস নং ১৬ : ইমাম মুহাম্মদ 'আছার' এ হযরত আলী ইবনে রবীআহ ওয়ালাবী থেকে বর্ণনা করেন–

قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ إِلٰى كَمْ تُقْصَرُ الصَّلٰوةُ فَقَالَ أَتَعْرِفُ السُّوَيْدَاءَ قُلْتُ لَا وَلٰكِنِّىْ قَدْ سَمِعْتُ بِهَا قَالَ هِىَ ثَلَاثُ لِيَالٍ قَوْ اصِدَ فَإِذَا خَرَجْنَا إِلَيْهَا قَصَرْنَا الصَّلٰوةَ–

"তিনি বলেন, আমি সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) কে প্রশ্ন করেছি যে, কতটুকু দূরত্বে নামায কাস্‌র করা যাবে? তিনি বললেন, তুমি কি সুআইদা নামক স্থানটি চিন? আমি বল্‌লাম, না, তবে এর নাম শুনেছি। তিনি বললেন, এখান থেকে তিন রাতের দূরত্ব (মধ্যম গতিতে চললে)। আমরা সেখানে গেলে নামায কাস্‌র করতে পারবো।"

হাদীস নং ১৭ : দারু কুতনী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَاتَقْصُرُوْا الصَّلَاةَ فِىْ أَدْنٰى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلٰى عُسْفَانَ–

"নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, হে মক্কা বাসীগণ! তোমরা চার 'বারীদ'র কম সফরে নামায 'কাস্‌র' করবে না। এর দূরত্ব 'মক্কা মুয়ায্‌যামা' থেকে উস্‌ফান' পর্যন্ত।"

হাদীস নং ১৮ : "মুআত্তা ইমাম মালিক" এ হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত-

أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ فِىْ مِثْلِ مَابَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَفِىْ

مِثْلِ مَا بَيْنَ ... مَكَّةَ وَعُسْفَانَ وَفِىْ مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ قَالَ يَحْيٰى قَالَ مَالِكٌ وَذٰلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ–

"তিনি নামায 'কাস্‌র' করতেন মক্কা থেকে তায়িফ ও মক্কা থেকে জেদ্দার সমপরিমান দূরত্বে। ইয়াহয়া বলেন, ইমাম মালিক বলেছেন, এ দূরত্ব হচ্ছে চার 'বারীদ'।"

হাদীস নং ১৯ : ইমাম শাফিঈ (রহ.) সহীহ সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

أَنَّهُ سُئِلَ أَتَقْصُرُ الصَّلٰوةُ إِلٰى عَرَفَةَ قَالَ لَا وَلٰكِنْ إِلٰى عُسْفَانَ وَإِلٰى جِدَّةَ وَإِلَى الطَّائِفِ رَوَاهُ الْإِمَامُ الشَّافِعِىُّ وَقَالَ اِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ–

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, 'আরাফাহ' পর্যন্ত (৯ মাইল) গিয়ে নামায কাস্‌র করা যাবে কিনা? তিনি বললেন, না। তবে 'উসফান' অথবা 'জেদ্দা' পর্যন্ত সফর করলে কাস্‌র করা যাবে। এ হাদীসটি ইমাম শাফিঈ (রহ.) বর্ণনা করেছেন এবং এর ইসনাদ সহীহ বলেছেন।"

হাদীস নং ২০ : ইমাম মুহাম্মদ মুআত্তা শরীফে হযরত নাফে' থেকে বর্ণনা করেন-

أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ إِبْنِ عُمَرَ الْبَرِيْدَ فَلَا يَقْصِرُ الصَّلٰوةَ–

"তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদ্বি.) এর সাথে এক বারীদ সফর করতেন। তখন তিনি (ইবনে উমর) নামায কাস্‌র করতেন না।"

স্মতর্ব্য যে, চার বারীদ ইংরেজী মাইলের হিসাবে প্রায় ৫৭ মাইল। অর্থাৎ ৩৬ ক্রোশ ৩ মানযিল। এ কয়েকটি হাদীস উদাহরণ স্বরূপ পেশ করা হলো। নতুবা এ সম্পর্কিত অসংখ্য হাদীস বর্ণিত রয়েছে। যাদের ইচ্ছা হয় 'সহীহ বোখারী' শরীফ অধ্যয়ন করতে পারেন। এ সকল হাদীস থেকে জানা গেলো যে, সাধারণত শহর থেকে বের হওয়াই সফর নয় এবং এর উপর সফরের আহকাম প্রযোজ্য হবে না। সফরের জন্য চার বারীদ অর্থাৎ তিন মনযিল দূরত্ব প্রয়োজন। সাহাবায়ে কেরামের আমল এর উপরই ছিলো।

বিবেকের চাহিদাও এটা যে, সাধারণত শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়াই সফর নয়। কেননা শহরের আশে পাশের জমি কে শহরতলী বলা হয়। যেখান থেকে শহরের বাসিন্দারা প্রয়োজন মেটান। যেমন কবরস্থান, ঈদগাহ, পশুচারণ ভূমি, বা ঘোড়দৌড়ের ময়দান। এ সব জায়গায় পৌঁছাকে শহরের পৌঁছে যাওয়া মনে করা হয়। কোন ব্যক্তি এ সব স্থানে ভ্রমন অথবা বিনোদনের জন্য গিয়ে নিজেকে মুসাফির মনে করে না। এমনকি যদি এতটুকু দূরত্বকে সফর বলা হয়, তাহলে কোন মহিলা মুহরিম ছাড়া একাকিভাবে শহরের বাহিরে যেতে পারবে না। কেননা মহিলাদের জন্য মুহরিম ছাড়া সফর করা হারাম। আবার ইসলামী বিধান হচ্ছে, মুসাফির তিন দিন তিন রাত মোজার উপর মাস্হ করতে পারবে। শহরের বাহিরে বেরুলেই যদি মুসাফির হয়, তাহলে এ মাস্হের বিধান মুসাফিরদের জন্য সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য হবে না- যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তাই সফরের জন্য ন্যুনতম কোন সীমা নির্ধারিত করা উচিত, যাকে শরীয়তের বিচারেও সফর মানা যাবে,আবার যা দ্বারা ইসলামী বিধানও প্রত্যেক মুসলমানের উপর আরোপিত হবে। আর ঐ সীমা তিন দিনই।

আবার তিন দিনের দূরত্ব সফর হওয়াটা 'ইয়াকীনি, তথা অকাট্য হওয়া চাই। এর চেয়ে কম দূরত্ব সফর হওয়া 'মাশকূক' তথা সন্দেহযুক্ত। নামাযের চার রাকআত ইয়াকীন তথা দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাই সুদৃঢ় বিষয়কে সন্দেহযুক্ত বিষয়ের দ্বারা ত্যাগ করা যাবে না। ইয়াকীন তথা সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয়কে অপর ইয়াকীনই দূর করতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলার ব্যাপারে আপত্তি সমূহ ও তার জবাব

এ মাসআলার উপর ওহাবীদের পক্ষে শুধুমাত্র একটি হাদীস পাওয়া যায়। যা বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে বিভিন্ন রাবী থেকে বর্ণিত। যেমন, মুসলিমও বুখারী হযরত আনাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ-

" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহরের নামায মদীনা মুনাওয়ারায় চার রাকআত পড়েছেন এবং যুলহুলায়ফাতে আছরের নামায

দু'রাকআত আদায় করেছেন।"

দেখুন, যুলহুলাইফা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে শুধুমাত্র তিন মাইল দূরে, যাকে বর্তমানে 'বীরে আলী'বলা হয়। এটাই মদীনাবাসীদের জন্য হজ্বের মীক্বাত। যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনা থেকে বাহিরে তাশরীফ নিতেন তখন শুধুমাত্র তিন মাইল দূরত্বে পৌঁছে (নামায) কাস্‌র করতেন।

জবাব : এ হাদীসে পর্যটন ও বিনোদনের জন্য শুধুমাত্র যুলহুলাইফা পর্যন্ত যাওয়ার উল্লেখ নেই। বরং এখানে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিদায় হজ্বের ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সরকার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হজ্বের উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা হয়ে যুলহুলাইফা পৌঁছলে আসরের সময় হয়। তখন যেহেতু তিনি সামনে অগ্রসরমান ছিলেন, তাই এখানে কাস্‌র করলেন। এ জন্যই এখানে বলা হয়েছে صَلَّى الظُّهْرَ। অর্থাৎ, 'যোহরের নামায পড়েছেন'। এ ঘটনা একবারই হয়েছিলো। كَانَ يُصَلِّى (অর্থাৎ, 'নামায পড়তেন) বলেননি, যদ্বারা এটা বুঝা যেতো যে, তিনি সব সময় এরূপ করতেন। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় 'মুআত্তা ইমাম মালিক ও 'মুআত্তা ইমাম মুহাম্মদ' এ হযরত নাফে' থেকে বর্ণিত আছে–

أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْمُعْتَمِرًا قَصَرَ الصَّلَاةَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ-

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) যখন হজ্ব অথবা ওমরা করার জন্য মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের হতেন,তখন যুলহুলাইফা পৌঁছে কাস্‌র পড়তেন।"

হযরত ইবনে উমর (রাদ্বি.) এর এ আমল শরীফ তোমাদের উদ্ধৃত হাদীসগুলোর তাফসীর তথা ব্যাখ্যা। এর দ্বারা ফিকহের এ মাসআলাটি প্রতিভাত হলো যে, যে ব্যক্তি সফরের উদ্দেশ্যে নিজ মাতৃভূমি থেকে বের হয়,তখন সে লোকালয় থেকে বের হলেই নামায কাস্‌র পড়বে এবং ফিরার সময় লোকালয়ে প্রবেশ করলেই সে মুক্বীম হয়ে যাবে। এ হাদীসটি সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের অনুকূল।

আপত্তি নং ২ : মুসলিম ও বুখারী হযরত আবূ হুরায়রা (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন–

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ-

"নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা ও ক্বিয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী নারীর জন্য এক দিন ও এক রাতের দূরত্বে মুহরিম ছাড়া সফর করা বৈধ নয়।"

এ হাদীস দ্বারা প্রতিভাত হলো যে, এক দিন ও রাতের দূরত্ব অতিক্রম করা সফর। কারণ সেটাকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফর বলেছেন এবং এর উপর সফরের বিধি বিধান আরোপ করেছেন যে, নারীর জন্য মুহরিম ছাড়া এতটুকু দূরে সফর করা হারাম। বুঝা গেল যে, সফরের জন্য তিন দিনের দূরত্ব আবশ্যক নয় এক দিনেও সফর হয়।

জবাব : এ আপত্তির দুটো জবাব। এক, আপনাদের অভিমত এ হাদীস দ্বারা ও প্রমাণিত হয়নি। আপনাদের অভিমত হলো শহর থেকে ভ্রমণ ও বিনোদনের জন্য দুয়েক মাইল যাওয়াই সফর। আর এ হাদীসে এক দিন ও রাতের দূরত্বের শর্ত রয়েছে। তাই এ হাদীসটি আপনাদেরও বিরোধী। দুই, আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে একই বুখারী শরীফের তিন দিনের সমর্থনকারী রিওয়ায়াত পেশ করেছি।

আমরা দুটো রিওয়ায়াত পেয়েছি- তিন দিন ও এক দিনের। যদি এক দিনের হাদীস পূর্বের এবং তিন দিনের হাদীস পরের হয়, তাহলে এক দিনের হাদীস মানসূখ তথা রহিত। এবং যদি তিন দিনের হাদীস পূর্বের ও এক দিনের হাদীস পরের হয়, তাহলে তিন দিনের হাদীস এক দিনের হাদীসের দ্বারা রহিত হতে পারে না। কেননা তিন দিনের মধ্যে এক দিনও এসে যায়। আর যখন এক দিনের দূরত্বে নারীর একাকী সফর করা হারাম, তাহলে তিন দিনের সফর ও হারাম হবে। তাই তিন দিনের রিওয়ায়াত সর্বাবস্থায় আমলযোগ্য এবং এক দিনের হাদীসের উপর আমল সন্দেহযুক্ত। এ জন্য এক দিনের হাদীসটি আমলযোগ্য. তিন দিনের হাদীসটিই আমলযোগ্য । কারণ সন্দেহের দ্বারা নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হয় না। যাহোক সফরের সীমা তিন দিনের দূরত্বই হতে পারে।

আপত্তি নং ৩ : বর্তমানে মোটর গাড়ী ও ট্রেন ইত্যাদির মাধ্যমে তিন দিনের সফর এক ঘন্টায় অতিক্রান্ত হয়। তাহলে বলুন মোজার উপর মাস্হের

সীমা তিন দিন মুসাফির কি ভাবে পূর্ণ করবে? আপনাদের কথার ভিত্তিতেও এ হাদীসটি সাধারণ ভাবে আমলযোগ্য হলো না।

জবাব : এ আপত্তি সম্পূর্ণ নিরর্থক। একটা হলো কানূন তথা বিধানের নিজ স্ব ত্রুটি, যার কারনে কোন বিধান প্রত্যেক জায়গায় জারী হতে না পারা। এটা বিধানের দোষ। আবার আরেকটা হলো কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে বিধান জারী না হওয়া। এটা কানূন' তথা নিজস্ব ত্রটি নয়। শরীয়তে সফর পদব্রজে অথবা উটের চলার গতির উপর ধর্তব্য। যদি তা তিন দিনের হয় তাহলে সফর। এ ধরনের চলনগতিতে প্রত্যেক মুসাফিরের উপর এ মাস্হের বিধান জারী হওয়া চাই। যদি কোন ব্যক্তি এক ঘন্টার মধ্যে এতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে, তাহলে এটি একটি বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতা। যার কারণে এ কানূনের কষ্ট থেকে সে বেঁচে গেলো। তবে কানূন স্বীয় অবস্থানে সঠিক। আপনাদের কথার দ্বারা কানূনের মধ্যে ত্রুটি সাব্যস্ত হয় না। অতএব আপনাদের কথা বাতিল; আমাদের অভিমত সঠিক।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

সফরে সুন্নাত ও নফল পড়া

মুসাফিরের জন্য সফর অবস্থায় ফরয নামাযে কাস্‌র করার বিধান রয়েছে। অর্থাৎ চার রাকআত ফরযে দু'রাকআত পড়বে। ফরয ছাড়া সমস্ত নফল, সুন্নাত ও বিতর ঘরের মতোই পড়বে। ঐ নামাযগুলোর হুকুম ঘরের মধ্যে যেমন সফরেও তাই। এ গুলোতে না কাস্‌র আছে, না নিষেধাজ্ঞা। একেবারে মাফও নয়। কিন্তু লা মাযহাবী ওহাবীরা সফরে নফল নিজেরাও পড়েনা, অন্যদেরকেও পড়তে দেয় না। এদের অনেকে তো এ ব্যাপারে খুবই কঠোর।

এ জন্যই আমরা এ অধ্যায়কেও দুটো পরিচ্ছেদে ভাগ করছি। প্রথম পরিচ্ছেদে এ শরয়ী মাসআলার প্রমাণ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এর উপর ওহাবীদের আপত্তিগুলোর জবাব দিয়েছি। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সফরে সুন্নাত, বিতির, ও নফল পূর্ণ পড়া

মুসাফির শুধুমাত্র চার রাকআত ফরযে কাস্‌র করবে। বাকী নামায পরিপূর্ণ ভাবে পড়বে। এতে বাধা দেওয়া কিংবা নিষেধ করা অপরাধ। দলীলাদি নিম্নরূপ ঃ

(১) রব তাআলা ইরশাদ করছেন-

اَرَأَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى- عَبْدًا اِذَا صَلّٰى-

"আপনি কি ঐ অভিশপ্তকে দেখেছেন, যে মুমিন বান্দাকে বাধা দেয়- যখন সে নামায পড়ে?"

বুঝা গেলো, মুসলমানকে নামায থেকে বিরত রাখা কাফেরদের তরীকা এবং আল্লাহ তাআলার নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়। এ জন্যই ফক্বীহগণ বলেন, 'যদি কেউ মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়তে থাকে,তাহলে তাকে বাধা দিওনা। যাতে উক্ত আয়াতের আওতায় এসে না যাও। যখন সে নামায পড়া শেষ করবে, তখন মাত্তসআলা বলে দিবে।' (শামী ও অন্যান্য)

এ থেকে ওসব ওহাবীদের শিক্ষা নেয়া উচিত, যারা মুসলমান মুসাফি-রদেরকে সুন্নাত ও নফল থেকে অত্যন্ত কঠোর ভাবে বাধা দেয়। এমনকি লড়াই করতে ও মরতে প্রস্তুত হয়ে যায়। শেষ কথা হলো, তাতো নামায ছাড়া আর কিছু নয়। তবুও এর উপর এত আক্রমন কেন?

(২) আল্লাহ তাআলা মক্কার কাফিরদের অপরাধ এ ভাবেই বর্ণনা করছেন-

وَلَاتُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ – هَمَّازٍ مَّشَّاءٍۭ بِنَمِيْمٍ- مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ-

"তার আনুগত্য করো না, যে অধিক শপথকারী, লাঞ্ছিত চোগল খোর, ভালো কাজে বাধা দান কারী, সীমা লঙ্ঘনকারী বড়ই পাপী।"

বুঝা গেল যে, লোকদেরকে ভালো কাজে বাধা দেওয়া কাফিরদের রীতি। তাদের কথা মানা কখনোই উচিত নয়। মুসলমানদেরকে ভাল কাজ থেকে দূরে রাখা ওহাবীদের জীবনের খুবই প্রিয় দায়িত্ব। সিনেমা, জুয়া, মদের উপর কোন আক্রমন করেনা। চড়াও হয় সফরে সুন্নাত নফল নামাযের উপর। কোন মুসলমান তাদের কথা কখনোই মানবে না। এ আয়াতে করীমার উপর আমল করবে।

(৩) রব তাআলা মু'মিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে ইরশাদ করছেন-

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ-

"মু'মিন তারাই যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে রাজত্ব দিই,তাহলে তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে, ভালো কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে।"

যদি (খোদা না করুক) পৃথিবীতে ওহাবীদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে নুষকে সফরে সুন্নাত ও নফল নামায, আল্লাহর যিক্‌রের মজলিসগুলো, মীলাদ ীফ, খতম, ফাতিহা, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি থেকে বাধা দিবে। আর ন্ধময় কুপের পানিতে অযু করার, কাক ইত্যাদি খাওয়ার, শিশুদের প্রশ্রাব ও র্য পবিত্র মনে করার, যিনার মাধ্যমে জন্ম নেওয়া নিজ বীর্যের কন্যা সন্তানকে বিয়ে করার ইত্যাদির নির্দেশ দিবে, গ্রন্থের শেষে ওয়াহাবীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ মাসআলা গুলো বর্ণনা করা হবে।

হাদীস নং ১-২ : ইমাম তিরমিযী ও তাহাবী প্রমুখ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন (তবে দুজনের বর্ণনায় কিছুটা শাব্দিক ভিন্নতা রয়েছে)-

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِى الْحَضَرِ الظُّهْرَ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِى السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّى بَعْدَهَا شَيْئًا وَالْمَغْرِبَ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً ثَلٰثَ رَكْعَاتٍ وَلَا يَنْقُصُ فِى حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ وَهِىَ وِتْرُ النَّهَارِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ-

"তিনি বলেন, আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে নিজ বাসস্থান এবং সফরে নামায পড়েছি। অতঃপর আমি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে নিজ এলাকায় যোহর চার রাকআত এবং এরপর দু'রাকআত সুন্নাত পড়েছি। আর সফরে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে যোহর দু'রাকআত এরপর দু'রাকআত সুন্নাত পড়েছি। আর আসরের নামায পড়েছি দু'রাকআত। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসরের পরে আর কোন নামায পড়েননি এবং মাগরিবের নামায নিজ বাসস্থান ও সফরে একই রকম অর্থাৎ তিন রাকআত পড়েছি। এতে নামায তিনি নিজ বাসস্থান ও সফরে কোন অবস্থানেই কমাতেন না। কারণ মাগরিব হলো দিনের বিত্‌র। মাগরিবের ফরযের পর দু'রাকআত সুন্নাত পড়তেন।"

তাহাবী শরীফে এ শব্দগুলো অতিরিক্ত রয়েছে-

وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ-

"হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইশা দু'রাকআত পড়লেন। এরপর দ'রাকআত (সুন্নাত) পড়লেন।"

দেখুন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরে যোহরের ফরয দুই রাকআত এরপর সুন্নাত দুই রাকআত, মাগরিবের ফরয তিন এরপর সুন্নাত দুই, ইশার ফরয দুই, এরপর সুন্নাত দুই রাকআত পড়েছেন। যদি সফরের ক্ষেত্রে সুন্নাত কিংবা নফল পড়া নিষিদ্ধ হতো তাহলে সরকারে দু'আলম

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেন পড়তেন? আফসোস ওহাবীরা সন্নাতের উপরও আক্রমন চালাচ্ছে।

হাদীস নং ৩-৪ : আবূ দাউদ ও তিরমিযী হযরত বারা ইবনে আযিব (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَاَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ-

"তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আটারটি সফরের সঙ্গী ছিলাম। আমি কখনো হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর যোহরের পূর্বে দু'রাকআত নফল নামায ত্যাগ করতে দেখিনি।"

হাদীস নং ৫ : আবূ দাউদ হযরত আনাস (রাদ্বি.)থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَافَرُوْا رَادَ اَنْ يَتَطَوَّعَ اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِنَاقَتِهِ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى-

"তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সফর করতেন আর নফল নামায পড়ার ইচ্ছে করতেন তখন স্বীয় উটনীর মুখ কা'বার দিকে ফিরাতেন। এরপর তাকবীর বলে নফল পড়তেন।"

হাদীস নং ৬-৭ : মুসলিম ও বুখারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِى السَّفَرِ عَلٰى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُوْمِىْ اِيْمَاءً صَلٰوةَ اللَّيْلِ اِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوْتِرُ عَلٰى رَاحِلَتِهِ-

"তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরে স্বীয় উষ্ট্র বাহনের উপর নফল নামায পড়তেন। যে দিকেই ঐ বাহনের মুখ হতো, তিনি ইশারায় নামায পড়তেন। তাহাজ্জুদের নামাযও পড়তেন। কেবল ফরয ছাড়া তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিত্‌রও স্বীয় বাহনের উপর পড়তেন।"

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেলা যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরে রাস্তা অতিক্রম করার সময় তাহাজ্জুদও পড়তেন।

(ওহাবীরা) অবস্থানরত মুসাফিরকে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ থেকে বাধা দেয়।

হাদীস নং ৮ : মুয়াত্তা ইমাম মালিকে হযরত নাফে (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত-

قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَرٰى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللّٰهِ يَتَنَفَّلُ فِى السَّفَرِ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ-

"তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) নিজ পুত্র ওবায়দুল্লাকে সফরে নফল পড়তে দেখলেন। এরপরও তিনি নিষেধ করেন নি।"

হাদীস নং ৯ : তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ-

"তিনি বলেন, আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সফরে যোহর (ফরয) দু'রাকআত, এরপর দু'রাকআত সুন্নাত পড়েছি। এ হাদীস ইমাম তিরমিযী রিওয়ায়াত করে বলেন, এ হাদীসটি 'হাসান'।"

হাদীস নং ১০-১১ : মুসলিম ও আবূ দাউদ হযরত আবূ কাতাদাহ (রাদ্বি.) থেকে সফরে 'পবিত্র বাসর রাতে ফজরের নামায ক্বাযা হওয়া সম্পর্কিত খুবই দীর্ঘ 'হাদীস' রিওয়ায়াত করেছেন। যার কয়েকটি শব্দ নিম্নরূপ-

صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ كَمَا كَانَ يُصَلِّى-

"হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত ফরযের পূর্বে পড়লেন। এরপর ফজরের ফরয পড়লেন, যে ভাবে সব সময় পড়তেন।"

হাদীস নং ১২-১৫ : বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ হযরত ইবনে আবী লায়লা থেকে রিওয়ায়াত করেন-

قَالَ مَا اَخْبَرَنَا اَحَدٌ أَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحٰى غَيْرُ اُمِّ هَانِئٍ ذَكَرَتْ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اِغْتَسَلَ فِى بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانَ رَكْعَاتٍ-

www.AmarIslam.com

"তিনি বলেন, আমাকে হযরত উম্মে হানী ব্যতীত আর কেউ এ সংবাদ দেন নি যে, তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে 'চাশ্‌ত'র নামায পড়তে দেখেছেন। উম্মে হানী বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর (উম্মে হানীর) ঘরে গোসল করেছেন এবং আট রাকআত 'চাশতের' নামায পড়েছেন।"

দেখুন! মক্কা বিজয়ের দিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা মুআয্‌যামায় মুসাফির ছিলেন। তবুও হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ বোন উম্মে হানী বিন্‌তে আবি তালিবে'র ঘরে আট রাকআত চাশতের নামায পড়েছেন। অথচ চাশ্‌তের নামায হচ্ছে নফল।

হাদীস নং ১৭ : ইবনে মাজাহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন-

قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْحَضَرِ وَصَلٰوةَ السَّفَرِ فَكُنَّا نُصَلِّىْ فِى الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَكُنَّا نُصَلِّى فِى السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا-

"তিনি বলেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ বাসস্থানে এবং সফরে ফরয নামায আদায় করেছেন। আমরা নিজ বাসস্থানে ফরয নামাযের পূর্বে ও পরে নফল পড়তাম এবং সফরেও ফরযের পূর্বে ও পরে নফল পড়তাম।"

হাদীস নং ১৮ : বুখারী শরীফে হযরত জাবির (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত-

أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ-

"নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বাহনের উপর কিব্‌লাহ ভিন্ন অন্য দিকে ফিরে নফল নামায পড়তেন।"

এ বিশটি (কুরআনের আয়াত সহ) দলীল উদাহরণ স্বরূপ পেশ করা হলো। এর বেশী দেখতে চাইলে সহীহ বুখারী, মিশকাত শরীফ ইত্যাদি অধ্যয়ন করুন।

বিবেকের চাওয়াও এটা যে, সফরে সুন্নাত ও নফল মাফ না হওয়া ও কাস্‌র না করা। আর তা নিম্নবর্ণিত কয়েকটি কারণে-

এক, বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, মি'রাজের রজনীতে নামায দুই

www.AmarIslam.com

রাকআত করে ফরয করা হয়েছিলো। অতঃপর সফরে তো ঐ একই অবস্থা। স্থায়ী অবস্থান কালে কিছু নামাযে অতিরিক্ত করা হয়েছে। এবং এটি সুস্পষ্ট যে, মি'রাজে শুধুমাত্র ফরয নামায গুলোই আবশ্যক করা হয়েছিল। সুন্নাত, নফল ইত্যাদি নয়। তাই কাস্‌র কেবল ফরযেই হয়েছে; সুন্নাত ও নফলে নয়।

দুই, সফরকালীন ফরয নামাযের ব্যাপারে বেশ কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যেমন, বাহনের উপর,চলন্ত ট্রেনে, কিবলা ভিন্ন অন্য দিকে তা আদায় হবে না। সুন্নাতও নফলের বেলায় এ ধরনের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বাহনের উপর কিবলা ভিন্ন অন্য দিকেও আদায় হয়ে যায়। ফরযের জন্য মুসাফিরকে যাত্রা বন্ধ করে দিতে হয়। এতে সামান্য বিলম্ব হয়। এ জন্যই ঐ নামায অর্ধেক করে দেয়া হয়েছে। যেহেতু সুন্নাত ও নফলের জন্য যাত্রা বন্ধ করে দিতে হয় না,বাহনের উপর আদায় হয়ে যায়,তাই এতে কাস্‌রের যেমন প্রয়োজন নেই,তেমনি মাফ হওয়ার ও কোন প্রশ্নই আসে না। যখন সফরে ফরয কম হয়ে গেলো,তাই সুন্নাতও হ্রাস পাওয়া উচিত- এরকম মনে করা সম্পূর্ণ ভুল।

দেখুন! জুমুআ'র ফরয চার রাকআতের পরিবর্তে দু'রাকআত। কিন্তু সুন্নাত একটুও কমলো না। ফরয হচ্ছে স্বতন্ত্র নামায। সুন্নাত এবং নফল ফরয থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ সুন্নাত ও নফল ফরযের এমন অনুসরনীয় নয় যে, যদি ফরয পুরো পড়া হয় তখন সুন্নাত ও পুরো পড়া হবে। আর যদি ফরযে কাস্‌র হয় তাহলে সুন্নাতেও কাস্‌র কিংবা সম্পূর্ণ মাফ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলার ব্যাপারে আপত্তি ও জবাব সমূহ

লা মাযহাবী ওহাবীদের কাছে এ মাসআলার ক্ষেত্রে একেবারেই অল্প দলীল রয়েছে, যা তারা সবখানেই শব্দ পরিবর্তন করে বর্ণনা করে। নিম্নে তাদের প্রশ্ন গুলোর জবাব উপস্থাপন করছি-

আপত্তি নং ১ : মুসলিম ও বুখারী প্রমুখ হযরত হাফ্‌স ইবনে আসিম থেকে রিওয়ায়াত করেন-

قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِىْ طَرِيْقِ مَكَّةَ فَصَلّٰى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ رِحْلَةٌ وَجَلَسَ فَرَاىَ النَّاسَ قِيَامًا فَقَالَ مَايَصْنَعُ هُوَ لَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُوْنَ قَالَ لَوْكُنْتُ مُسَبِّحًا لَاَتْمَمْتُ

صَلٰوتِىْ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَايَزِيْدُ فِى السَّفَرِ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ وَاَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذٰلِكَ-

"তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে উমর (রাদ্বি.) এর সাথে মক্কা মুআযযামার রাস্তায় ছিলাম,তখন তিনি আমাদেরকে যোহরের নামায দু'রাকআত পড়িয়েছেন। এরপর তিনি তাঁর বিশ্রামাগারে এসে বসলেন। সেখানে তিনি কিছু লোককে দাঁড়ানো দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, কি করছে? আমি বললাম, তারা নফল পড়ছে। তিনি বললেন, যদি আমি নফল পড়তাম, তাহলে নামাযগুলো পুরোপুরি পড়তাম,আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সফর সঙ্গী ছিলাম। তখন তিনি দু রাকআতের বেশী পড়তেন না। আর আমি হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) কেও অনুরূপ করতে দেখেছি।"

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো যে, সফরে নফল ও সুন্নাত পড়া সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সুন্নাতে খোলাফা-ই রাশিদীনের পরিপন্থী। তাই মুসাফির দু'রাকআত ফরয পড়বে অন্য কোন নামায পড়বে না।

জবাব : এ আপত্তির কয়েকটি জবাব রয়েছে।

এক, এ হাদীসটি তোমাদেরও বিরোধী। কেননা এ হাদীস দ্বারা এটাও প্রমাণিত হলো যে, সফরে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং খোলাফা-ই-রাশিদীন কখনো ফরয দু'রাকআতের বেশী পড়েননি। আর তোমাদের কথা হচ্ছে, মুসাফির চাইলে কাস্‌রও পড়তে পারবে অথবা পুরোপুরিও পড়তে পারে। তোমরা এ হাদীসের বিরোধী পুরো পড়ার হুকুম কেন দিলে?

দুই, তোমাদের এ হাদীস দ্বারা নফল না পড়াটা প্রমাণিত। আর আমাদের পেশকৃত অনেক হাদীস দ্বারা 'নফল পড়ার বিধান প্রমাণিত হয়েছে। তাহলে তোমরা ঐ সব হাদীসের বিপরীতে শুধুমাত্র এ একটি হাদীসের উপর কেন আমল করছো? ঐ হাদীসগুলোর উপর আমল করো না কেন? তা তো শুধুমাত্র প্রবৃত্তির দাসত্বই বুঝায়,কারণ 'নফসে আম্মারার' উপর নামায অত্যন্ত ভারী।

তিন, স্বয়ং সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) এর ঐ সব হাদীস আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি, যেটাতে তিনি বলেছেন, আমি হুযূর পুরনূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সফরে সওয়ারী তথা বাহনের উপর নফল পড়তে দেখেছি। এরপরও ঐ প্রামাণ্য হাদীসগুলো তোমরা কবূল করছো না কেন? শুধুমাত্র এমন একটি হাদীসের উপরই কেন আমল করছো? নামায কম

পড়ার এতই স্বাদ!

চার, যখন কোন মাসাআলার ব্যাপারে দুটি দলীল দ্বান্দ্বিক হয়, তখন উভয়ের মধ্যে আমল সাব্যস্ত হওয়ার দলীলটিই প্রাধান্য পাবে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) এর দুটি রিওয়ায়াত রয়েছে- একটি নফল সাব্যস্তকারী অপরটি নফল না পড়ার। এমতাবস্থায় নফল সাব্যস্তকারী বর্ণনাটিই আমলযোগ্য হবে, এর বিপরীতটি নয়।

দেখুন! হযরত আয়িশা সিদ্দীক্বাহ (রাদ্বি.) বলছেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সশরীরে মি'রাজ হয়নি। অন্যান্য সাহাবীরা বল্ছেন মি'রাজ সশরীরেই হয়েছে। বর্তমান সারা বিশ্ব সশরীরে মি'রাজ হওয়ার সমর্থকারী। কারণ সাব্যস্তকারী হাদীস নেতিবাচক হাদীসের উপর অগ্রগন্য।

পাঁচ, যখন বিভিন্ন হাদীসে দ্বন্দ্ব পরিদৃষ্ট হয়,তখন ওগুলোর এমন অর্থ গ্রহণ করতে হবে যাতে পরস্পর দ্বন্দ্ব দূরীভূত হয়ে যায়। যেহেতু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) এর বর্ণনাগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, সেহেতু তোমাদের এ হাদীস শরীফের অর্থ হলো নফল নামায গুরুত্বের সাথে পড়া। এর জন্য যাত্রা বিরতি করে সওয়ারী থেকে অবতরণ করা, মাটির উপর দাঁড়িয়ে পড়া, চলন্ত বাহনের উপর নফল পড়া বৈধ মনে না করা- এসব কিছু হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও খোলাফা-ই-রাশিদীন (রাদ্বি.) কারো দ্বারাই প্রমাণিত নয়।

এ হাদীসেই রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন, তিনি কিছু লোককে তাবুতে দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়তে দেখে এটা বলেছেন। তখন ছিল সফর অবস্থায়, সফরও ছিল হজ্বের। এ দিকে রাস্তাও দীর্ঘ সেই সাথে আছে তাড়াতাড়ি পৌঁছার তাড়া। এমতাবস্থায় তাদের এ ভাবে নামায পড়া সফরের মধ্যে খুবই মুশকিল ছিল। তাই তিনি এরূপ বলেছেন। সুতরাং এ হাদীসটি না অন্য হাদীস সমূহের বিরোধী, না স্বয়ং ইবনে উমর (রাদ্বি.) এর অন্যান্য বর্ণনার পরিপন্থী। তাই বলছি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করো না, সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করো।

ছয়, তোমাদের এ হাদীসেও সফরে নফল পড়ার নিষেধাজ্ঞা নেই। হযরত ইবনে উমর (রাদ্বি.) কেবল মাত্র তুলনামূলক ভাবে এটা বলেছেন যে, যদি নফল এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ হতো তাহলে ফরয নামায কেন পুরোপরি পড়া হয় না?

আপত্তি নং ২ : যখন সফরে ফরয নামাযই চার রাকআতের পরিবর্তে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুরাকআত হয়ে গেলো, তাহলে সুন্নাত ও নফলের স্থান তো ফরযের নীচে। তাই সুন্নাত এবং নফল নামাযও চার রাকআতের পরিবর্তে দু'রাকআত অথবা সম্পূর্ণ মাফ হয়ে যাওয়াই উচিত।

জবাব : আলহাম্‌দুলিল্লাহ! এখন তোমরাও কিয়াসের পক্ষে চলে এসে'ছ। সুন্নাতকে ফরযের সাথে তুলনা করছো। তবে তোমরা যেমন, তোমাদের কিয়াস তথা অনুমানও তেমন। ভালো হতো মুজতাহিদ ইমামগণের তাকলীদ করলে, তাহলে তোমাদেরকে এ ধরনের অসার কিয়াস করতে হতো না। জনাব, ফরযের উপর সুন্নাত ও নফলের কিয়াস করা যায় না। ফরয নামাযে কেবলমাত্র দু'রাকআত পরিপূর্ণ পড়া হয়। কিন্তু সুন্নাত ও নফলে পুরো চার রাকআতই পরিপূর্ণ কিরাআত সহ আদায় করা হয়।

এখন বলো, সেখানে সুন্নাত ও নফল ফরযের মত কেন হলো না? তাই সে ক্ষেত্রেও কি এটা বলবে যে, যখন ফরযের দু'রাকআতে কিরাআত নেই, তাই সুন্নাত এবং নফলেরও দু'রাকআতে কিরাআত পড়া যাবে না।

জুমুআ'র নামাযে ফরয নামায চার রাকআতের পরিবর্তে দু'রাকআত হয়ে যায়। কিন্তু সুন্নাত হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে বেড়েই যায়। অর্থাৎ, জুমুআর ফরযের পরে চার রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ।

ওখানেও তোমাদের একই কিয়াস করা উচিত ছিলো, অর্থাৎ, যখন জুমুআর ফরয চারের পরিবর্তে দু'রাকআত হলো সুতরাং জুমুআর পরের সুন্নাতগুলোও চারের পরিবর্তে দু'রাকআত হওয়া উচিত। সুন্নাত ও নফলে কাস্‌র না হওয়ার কারণ আমরা প্রথম পরিচ্ছেদের যুক্তিভিত্তিক দলীলগুলোতে আলোকপাত করেছি। আর তা হলো, মুসাফিরকে সুন্নাত পড়ার জন্য যাত্রা বন্ধ করার প্রয়োজন হয় না, সওয়ারীর উপরই পড়তে পারে। তাই তাতে কাস্‌র করার প্রশ্নই আসে না।

জরুরী নির্দেশিকা : পূর্বে যেটা বলা হয়েছে যে, নফল ও সুন্নাত বাহনের উপর পড়া যায়, বাহনের মুখ যেদিকেই হোক। এ হুকুমটি মুসাফিরের জন্য রাস্তা অতিক্রম করার সময় প্রযোজ্য। অর্থাৎ যদি সে জংগলের মধ্যে থাকে। কিন্তু শহরে কিংবা অন্য কোথাও অবস্থানের ক্ষেত্রে এ হুকুম নয়। যদি মুসাফির কোন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় দু'চার দিনের জন্য অবস্থান করে, তাহলে সুন্নাত এবং নফল ও ফরযের মতো সকল শর্ত ও রুকন সহ আদায় করবে। লামাযহাবী

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

ওহাবীদের মতে মুসাফির রাস্তা অতিক্রম কালে হোক অথবা কোথাও অবস্থানের সময় হোক, সর্বাবস্থায় সুন্নাত ও নফল পড়বে না।

আপত্তি নং ৩ : হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন তথা সমগ্র জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ। যেহেতু রব তাআলা সফরে ফরয নামাযের ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দিয়েছেন, তাই হুযূর (সাল্লাল্লাহু আল-াইহি ওয়া সাল্লাম) ও স্বীয় সুন্নাতে হ্রাস করাই যুক্তিসংগত। সুন্নাত নামায পূর্বের মতোই বহাল থাকা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর 'রহমত' তথা অসীম দয়ার পরিপন্থী।

জবাব : জি হ্যাঁ! যেহেতু হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশ্বের জন্য রহমত, তাই তিনি স্বীয় সুন্নাতগুলো হ্রাস করেন নি। নামায হলো রহমত, বোঝা নয়। সম্ভবতঃ ওহাবীদের নফ্সের উপর নামায বোঝাই। তাই এ ধরনের প্রশ্নগুলো তাদের মাথায় আসছে। জনাব, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত 'ফরয' প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর প্রযোজ্য হয় এবং মৃত্যুর পূর্বে পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত কখনো কোন অবস্থাতেই মুমিন থেকে আলাদা হয় না। মু'মিন সুন্নাতে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোলেই জন্ম নেয়, সুন্নাতের ছায়ায় লালিত হয়, সুন্নাতের রজ্জু ধরেই মৃত্যুকে বরণ করে নেয় এবং ইনশাআল্লাহ সুন্নাতওয়ালা মাহবূবের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রহমতের ঝাণ্ডা নিয়েই কিয়ামতের ময়দানে উঠবে।

দেখুন, খত্না, আক্বীকাহ, শিশুদের দু'বছর পর্যন্ত দুধ পান করানো সব তো সুন্নাতই। আর মৃত্যুর সময় ওযূ, কা'বা মুখী হওয়া, মায়্যিত পুরুষ হলে তিন কাপড় আর মহিলা হলে পাঁচ কাপড় দ্বারা কাফন পরানো সব কিছুইতো সুন্নাত। এ জন্যই আমাদের নাম আহলে ফরয কিংবা আহলে ওয়াজিব নয় বরং 'আহ্লে সুন্নাত।'

আমাদের হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত হলো রহমত; বোঝা নয়। রহমত কম না হওয়াই উত্তম এবং সকলের কাম্য। আল্লাহ তাআলা সকল কর্তৃত্বের অধিপতি। যখনই চান যেটুকু চান রহমত দান করেন। তাঁর সকল রহমত সমান নয়। কখনো বেশী আবার কখনো কম হয়ে থাকে। তাই ফরয নামায মুক্বীমের জন্য পুরেপুরি ও মুসাফিরের জন্য অর্ধেক।

সপ্তদশ অধ্যায়

সফরে কাস্‌র ওয়াজিব

শরীআতের মাসআলা হলো, মুসাফিরের উপর চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামাযে 'কাস্‌র' ফরয। মুসাফির উক্ত নামায সম্পূর্ণ পড়তে পারবে না। যদি ভুলে দু'রাকআতের পরিবর্তে চার রাকআত পড়ে নেয় তার হুকুম হবে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে ফজরের ফরয চার রাকআত পড়েছে। অর্থাৎ যদি সে প্রথম তাশাহ্হুদ পাঠ করে তৃতীয় রাকআতে দাঁড়িয়ে যায়, তা'হলে সে সাহু সিজদা দিবে। নচেৎ নামায পূনরায় আদায় করবে। কিন্তু যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে দু'রাকআতের স্থলে চার রাকআত পড়ে তাহলে নামায আদায় হবে না।

আর লা-মাযহাবী ওহাবীদের কথা হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে মুসাফিরের স্বাধীনতা রয়েছে সে চাইলে 'কাস্‌র' পড়বে অথবা সম্পূর্ণ পড়বে। মুসাফির কোনটার জন্য বাধ্য নয়।

এ জন্য আমরা এ অধ্যায়কেও দুটো পরিচ্ছেদে বিভক্ত করছি। প্রথম পরিচ্ছেদে আমাদের দলীল সমূহ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ মাসআলার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্ন ও তার জবাব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কবূল করুন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সফরে 'কাস্‌র' আবশ্যক

সফরে কাস্‌র আবশ্যক হওয়ার পক্ষে 'হানাফীদের নিকট অনেকগুলো দলীল রয়েছে। কিছু দলীল এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছে-

হাদীস নং ১-৪ : বুখারী, মুসলিম, মুআত্তা ইমাম মুহাম্মদ ও মুআত্তা ইমাম মালিকে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাদ্বি.) থেকে কিছুটা শাব্দিক ভিন্নতার সাথে বর্ণিত (নিম্নোক্ত শব্দাবলী বুখারী ও মুসলিমের) –

قَالَتْ فُرِضَت الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُرِضَتْ اَرْبَعًا وَتُرِكَتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيْضَةِ الْاُوْلٰى-

"হযরত আয়িশা (রাদ্বি.) বলেন, প্রথমে নামায দুই রাকআত করে ফরয

হয়েছিল। এরপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরত করলেন তখন নামায চার রাকআত হিসাবে ফরয করা হলো এবং সফরের নামায পূর্বের মতই (দু'রাকআত) বহাল থাকলো।"

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো যে, হিজরতের পূর্বে প্রত্যেক নামায দু'রাকআতই ছিলো। হিজরতের পরে কিছু নামাযকে চার রাকআত করা হয়েছে। কিন্তু সফরের নামায হিজরতের পূর্বের মতই বহাল থাকলো। যদি তখন কেউ চার রাকআত পড়ে নিত,তাহলে তার নামায হতো না। তদ্রূপ বর্তমানেও যে মুসাফির সফরে চার রাকআত ফরয পড়বে,তার নামায শুদ্ধ হবে না। فرض ও فريضة শব্দ দুটি গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করুন।

মুআত্তা ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম মালিকের রিওয়ায়াতের শব্দাবলী এরূপ–

فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَاُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِى صَلٰوةِ الْحَضَرِ–

"শুরুতে সফর ও স্থায়ী অবস্থান কালে উভয় অবস্থাতেই নামায দুই রাকআত করে ফরয হয়েছিল পরবর্তী সময়ে সফরের নামায অপরিবর্তিত রইলো এবং 'স্থায়ী অবস্থানের' নামাযে বৃদ্ধি করা হলো।"

হাদীস নং ৫-৭ : মুসলিম, নাসাঈ, তাবরানী প্রমুখ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন–

قَالَ فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلٰوةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً"

"তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবীর ভাষায় নিজ বাসস্থানে চার রাকআত, সফরে দু'রাকআত এবং ভয়ের সময় এক রাকআত (অর্থাৎ জামাআতের সাথে এক রাকআত) নামায ফরয করেছেন।"

এতে সুস্পষ্ট ভাবে জানা গেলো যে, সফরে নিজ এলাকার ফজরের নামাযের মত সফরে দু'রাকআতই ফরয।

হাদীস নং ৮-১৩ : মুসলিম, বুখারী, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ হযরত আনাস (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন –

قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ–

"হযরত আনাস (রাদ্বি.) বলেন, আমরা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কা মুআয্যামার দিকে গিয়েছি।

www.AmarIslam.com

তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক ফরয নামায দু'রাকআত করে পড়তেন।"

হাদীস নং ১৪-১৬ : বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন –

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنٰى رَكْعَتَيْنِ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ اِمَارَتِهٖ ثُمَّ اَتَمَّهَا–

"তিনি বলেন, আমি মিনায় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম), আবূ বকর ও উমর (রাদিয়াল্লাহ আনহুমার) পিছে প্রত্যেক (ফরয) নামায দুই রাকআত করে পড়েছি। হযরত উসমান (রাদ্বি.) এর খিলাফাতের প্রাথমিক সময়ে ও অনুরূপ পড়েছি। পরবর্তী সময়ে হযরত উসমান (রাদ্বি.) সম্পূর্ণ পড়া শুরু করেছেন।"

হাদীস নং ১৭ : তাবরানী হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন-

قَالَ اِفْتَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ كَمَا اِفْتَرَضَ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا–

"তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরে দু'রাকআতই ফরয করেছেন, যেমন নিজ বাসস্থানে চার রাকআত ফরয করেছেন।"

হাদীস নং ১৮ : নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান, হযরত উমর (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন–

قَالَ صَلٰوةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةَ الضُّحٰى رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وصَلٰوةُ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–

"তিনি বলেন, সফরের নামায দু'রাকআত, চাশতের নামায দু'রাকআত, ঈদুল ফিত্‌রের নামায দু'রাকআত, জুমুআর নামায দু'রাকআত। এ দু'রাকআত হলো- পরিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ নয়। আর তা হুযূর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাতৃ ভাষাতেই।"

এ থেকে সুস্পষ্ট ভাবে জানা গেল যে, সফরের নামায দু'রাকআত পড়া এমনই জরুরী যেমন জুমুআ ও দু'ঈদের নামায দু'রাকআত পড়া আবশ্যক।

www.AmarIslam.com

হাদীস নং ২১ : ইমাম মুসলিম হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বি.) থেকে কিছুটা দীর্ঘ একটি উদ্ধৃত করেছেন,যার শেষের পবিত্র শব্দাবলী এরূপ–

فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهِ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ–

"আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে কাস্‌র নামায প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এটি একটি 'সাদক্বাহ' যা আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন। তোমরা এ 'সাদক্বাহ' গ্রহণ করো।"

এ হাদীসে فَاقْبَلُوْا শব্দটি 'আমর' আর 'আম্‌র' আসে আবশ্যকতা বুঝানোর জন্য। বুঝা গেলো, যে ব্যক্তি সফরে চার রাকআত (ফরয) পড়ে,সে আল্লাহ তাআলার 'সাদক্বাহ' থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আল্লাহ্‌ তাআলার 'সাদক্বাহ' কবূল করা এবং সফরে কাস্‌র করা ফরয।

হাদীস নং ২২ : তাবরানী 'মু'জামে সাগীর' গ্রন্থে সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন–

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ السُّبُلُ فَوَاللّٰهِ لَوَدِدْتُّ اَنْ اَحْظٰى مِنْ اَرْبَعِ رَكْعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ–

"ইবনে মাসঊদ (রাদ্বি.) বলেন, আমি সফরে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছে দু'রাকআত নামায পড়েছি এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও উমর ফারুক (রাদ্বি.) এর পিছেও দু'রাকআত পড়েছি। পরবর্তীতে বিভিন্ন পন্থা তোমাদেরকে পৃথক করে দিয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম! আমার আশা হলো চার রাকআতের পরিবর্তে কবূলকৃত দু'রাকআত পাওয়া।"

আমরা উদাহরণ স্বরূপ মাত্র বাইশটি হাদীস পেশ করেছি। নচেৎ এ সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। উক্ত রিওয়ায়াতগুলো থেকে বুঝা যায় সফরে কাসরই ফরয। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং খোলাফা-ই-রাশিদীন 'কাস্‌র'ই পড়েছেন, সাহাবায়ে কিরাম চার রাকাত পড়তে নিষেধ করেছেন কিংবা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

বিবেকের চাওয়াও এটা যে, সফরে 'কাস্‌র' ফরয। মুসাফিরকে 'কাস্‌র' ও সম্পূর্ণকরণ' উভয়ের স্বাধীনতা দেয়া শরয়ী জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ সফরে

www.AmarIslam.com

প্রত্যেক চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে প্রথম দু'রাকআত সকলের ঐক্যমতে ফরয। এখন শেষ দু'রাকআত সম্পর্কে প্রশ্ন হলো তাও মুসাফিরের উপর ফরয কি না? যদি ফরয হয় তাহলে তা না পড়ার সুযোগ কি ভাবে থাকবে? ফরযের ক্ষেত্রে কোন স্বাধীনতা নেই। ফরয ও ইচ্ছাধীনতা এক'ত্রিত হতে পারে না।

আর যদি ফরয না হয়ে নফল হয়,তাহলে একই তাকবীরে তাহরীমায় ফরয ও নফল নামায আদায় শরীআতের নিয়মবিরুদ্ধ, যার উদাহরণ কোথাও পাওয়া যাবে না। ফরয ও নফলের তাকবীরে তাহরীমা ভিন্ন ভিন্ন।একটি তাকবীরে তাহরীমায় এক ধরণের নামাযই হতে পারে, দু'রকম নয়।

যে ভাবেই হোক, দু'রাকআত কিংবা চার রাকআত পড়ার স্বাধীনতা শরয়ী জ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, মোট কথা, যে ভাবে নিজ বাসস্থানে চার রাকআতই ফরয হ্রাস-বৃদ্ধি'র স্বাধীনতা নেই,তদ্রুপ সফরে কেবল মাত্র দু'রাকআতই পড়া আবশ্যক কোন রূপ এখতিয়ার ছাড়াই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলা সম্পর্কিত আপত্তি ও জবাব সমূহ

এ মাসআলা সম্পর্কে আমরা লা মাযহাবী ওহাবীদের পক্ষে কিছু এমন আপত্তি জবাব সহ উল্লেখ করছি, যা তাদেরও জানা নেই। আল্লাহ তাআলা কবূল করুন।

আপত্তি নং ১ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ إن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا–

"এবং যখন তোমরা যমীনে সফর করবে তখন কিছু নামায কাস্‌র করাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, যদি তোমাদের আশংকা হয় যে কাফিররা তোমাদেরকে কষ্ট দিবে।"

এ আয়াতে করীমা থেকে জানা গেল যে, সফরে কাস্‌র ফরয নয়, তবে এর অনুমতি রয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌র ইরশাদ হচ্ছে কাস্‌রে তোমাদের জন্য গুনাহ নেই। তাই 'কাসর' পড়লে যেমন গুনাহ নেই তেমনি না পড়লেও গুনাহ নেই।

জবাব : এ আপত্তির কয়েকটি জবাব রয়েছে। এক, এ আয়াত বাহ্যিক অর্থে তোমাদেরও বিরোধী। কেননা এখানে কাসরের জন্য কাফিরদের পক্ষ থেকে ভয়ের শর্ত রয়েছে। অর্থাৎ যদি তোমরা কাফিরদের আক্রমণের আশংকা করো, তাহলে কাস্‌রে গুনাহ নেই। আর তোমরা বলছো নি[illegible]

www.AmarIslam.com

অনুমতি আছে। এখন তোমরা যে জবাব দিবে,তাই আমাদের জবাব।

দুই, এই لَاجُنَاحَ (কোন গুনাহ নেই) শব্দটি হাজীদের সাফা মারওয়ার 'সাঈ'র ব্যাপারেও ইরশাদ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন–

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا–

"যে হজ্বে বায়তুল্লাহ অথবা উমরাহ করে সে 'সাফা' ও 'মারওয়া'য় 'সাঈ' (প্রদক্ষিন) করলে কোন গুনাহ নেই।"

অথচ সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করা হজ্বে ওয়াজিব এবং 'উমরাহ'য় ফরয। তেমনি ভাবেই সফরে 'কাস্‌র' ফরয। لَاجُنَاحَ শব্দটি ফরয হওয়ার বিরোধী নয়।

তিন, যদি সফরে 'কাস্‌র' কেবলমাত্র মুবাহ হতো,তাহলে কুরআন করীম এরূপ বলতো যে, তোমাদের জন্য কাস্‌র না করাতে কোন গুনাহ নেই। কেননা 'মুবাহ'র পরিচিতি হলো,যা করলে ও না করলে কোন গুনাহ নেই। নচেৎ ফরয কাজ করার মধ্যে কোন গুনাহ হয় না বরং না করার মধ্যেই গুনাহ হয়। তাই করলে গুনাহ না হওয়া,'মুবাহ' হওয়ার দলীল নয়। ফরয- ওয়াজিবও অনুরূপ।

চার, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে সাহাবায়ে কিরাম ধারনা করলেন চার রাকআতের পরিবর্তে দু'রাকআত পড়লে গুনাহ হবে। কারণ এ নামায অসম্পূর্ণ। তাদেরকে বুঝানোর জন্যই এরূপ ইরশাদ হয়েছে। তাই আয়াত একেবারেই সুস্পষ্ট। এতে তোমাদের পক্ষে কিছুই নেই।

আপত্তি নং ২ : 'শরহে সুন্নাহ্'য় হযরত আয়িশা সিদ্দীকাহ (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত-

قَالَتْ كُلُّ ذَالِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرَ الصَّلٰوةَ وَاَتَمَّ

"হযরত আয়িশাহ (রদ্বি.) বলেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সব রকম আমল করেছেন। কাস্‌র ও পড়েছে আবার পুরো নামায ও পড়েছেন।"

এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, সফরে কাস্‌র এবং পরিপূর্ণ পড়া উভয়টিই সুন্নাত। শুধুমাত্র কাস্‌র পড়া ফরয নয়।

জবাব : এ আপত্তির কয়েকটি জবাব রয়েছে। এক, এ হাদীসের সনদে ইবরাহীম ইবনে ইয়াহয়া আছেন, যিনি সকল মুহাদ্দিসের মতে 'যঈফ' তথা দূর্বল। তাই এ হাদীসটি মোটেও আমলযোগ্য নয়। 'মিশকাত' শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মিরকাতে' এ হাদীসের ব্যাখ্যা অবলোকন করুন।

দুই, এ হাদীসটি ঐ সব হাদীসের বিরোধী, যা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ পরম সম্মানিত সাহাবায়ে কিরাম বলেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা সফরে দু'রাকআত পড়েছেন।

তিন, এ হাদীসটি খোদ উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা সিদ্দীকা (রাদ্বি.) এর ঐ রিওয়ায়াতের বিরোধী, যা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদ বর্ণনা করেছি। তিনি বলেন, প্রথমে নামায দুই রাকআত করে ফরয হয়েছে। পরবর্তীতে সফরের ক্ষেত্রে দুই রাকআত ফরযই বহাল থাকে এবং স্থায়ী বসবাসকারীর জন্য কিছু নামায বৃদ্ধি করা হয়। সফরে দু'রাকআতই ফরয হওয়া আবার কখনো হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চার রাকআতই পড়ে নেওয়া- এ ধরনের বৈপরিত্য কি ভাবে সম্ভব? তাই এ হাদসিটির তা'বীল তথা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আবশ্যক।

চার, এ হাদীসে 'সফর' শব্দটি নেই। অর্থাৎ তিনি (আয়িশা (রাদ্বি.) এটা বলেনি যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরে 'কাস্‌র' ও 'পরিপূর্ণ' পড়েছেন। তাই হাদীসের অর্থ হলো, হুযূর আনওয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলামের প্রাথমিক সময়গুলোকে কাস্‌র তথা প্রত্যেক নামায দুই রাকআত করে পড়েছেন। পরবর্তীতে যখন নামাযের রাকআত বাড়িয়ে দেয়া হলো অর্থাৎ কিছু চার রাকআত আর কিছু তিন রাকআত করা হলো তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিপূর্ণ পড়েছেন। অর্থাৎ দু'রাকআতের বেশী পড়েছেন। এ অর্থে হাদীসটি যেমন সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট হয়ে গেলো, তেমনি পূর্বের হাদীসগুলোর সাথে বিরোধও থাকলো না।

পাঁচ, যদি এখানে সফর অবস্থায় 'কাস্‌র' ও 'পরিপূর্ণ' উভয়ই উদ্দেশ্য হয়, তখনও এর অর্থ হবে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরকালীন 'কাস্‌র' পড়েছেন এবং যখন কোথাও পনের দিন অবস্থানের নিয়্যত করেছেন তখন 'পরিপূর্ণ' পড়েছেন। এ অর্থে হাদীসটি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট।

মজার ব্যাপার লা-মাযহাবী ওহাবীরা যে কোন ব্যাপারে হানাফীদের কাছ থেকে মুসলিম ও বুখারীর হাদীস দেখতে চায়। কিন্তু খোদ তাদের সপক্ষে কোন হাদীস পেশ করতে হলে তখন বুখারী মুসলিমের হোক বা না হোক সহীহ কিংবা যঈফ সব রকম হাদীস বর্ণনা করতে তাদের লজ্জা হয় না।

এ হাদীস অত্যন্ত 'যঈফ' (তথা দূর্বল) হওয়ার কারণে 'সিহাহ্ সিত্তাহ্'য় রিওয়ায়াত করা হয় নি। ইমাম তিরমিযীও এ হাদীসকে উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। বরং তিনি এটা বলতে বাধ্য হলেন যে কাসর তো হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সম্মানিত খোলাফা-ই-রাশিদীনের আমল দ্বারা সাব্যস্ত। কিন্তু পরিপূর্ণ পড়াটা শুধুমাত্র আয়িশা সিদ্দীকাহ (রাদ্বি.) এর নিজস্ব আমল। যেমন ইমাম তিরমিযী কাস্‌র নামাযের অধ্যায়ে ইরশাদ করেন–

وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَقْصِرُ فِى السَّفَرِ وَاَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهٖ وَالْعَمَلُ

www.AmarIslam.com

عَلَىٰ
هٰذَا عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ–

"নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সহীহ হাদীস এ ভাবেই বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা সফরে কাস্‌র করতেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, উমর ফারূক, উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)ও তার খিলাফাতের প্রথম দিকে কাস্‌র পড়তেন। এর উপরই অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্য আলিমগণের আমল।"

সফরে নামায পরিপূর্ণ পড়া সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী খুবই যঈফ (দূর্বল) পন্থায় বলেন–

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلٰوةَ فِى السَّفَرِ–

"হ্যাঁ! আয়িশা সিদ্দীকাহ (রাদ্বি.) থেকে বর্নিত রয়েছে যে, তিনি সফরে পরিপূর্ণ পড়তেন।"

যদি হযরত আয়িশা সিদ্দীকাহ (রাদ্বি.)এর উক্ত 'মারফূ' হাদীস গ্রহণযোগ্য হতো,যা তোমরা পেশ করেছো, তাহলে ইমাম তিরমিযী মারফূ হাদীস বাদ দিয়ে কেবলমাত্র আয়িশা সিদ্দীকাহর (রাদ্বি.) আমল শরীফ উল্লেখ করতেন না।

বাস্তব কথা হলো তাই, যা তিনি পূর্বে বলেছেন–

وَالْعَمَلُ عَلٰى مَا رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابِهِ–

"আমল হবে সেটার উপর, যা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত হয়েছে (অর্থাৎ 'কাস্‌র')

ইমাম তিরমিযীর এ ঘোষণা থেকে বুঝা গেলো যে, হযরত আয়িশা সিদ্দীক্বাহ (রাদ্বি.) কাস্‌র ও পরিপূর্ণ দুটোরই স্বাধীনতা দিতেন না। বরং তিনি সর্বদা সফরে পরিপূর্ণ পড়তেন। আর আলিমগণ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আমল শরীফের উভয় ভিত্তি করেই সব সময় কাস্‌র পড়েছেন।

আপত্তি নং ৩ : নাসাঈ, দারু কতুনী এবং বায়হাকী হযরত আয়িশা সিদ্দীকাহ (রদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন-

قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ عُمْرَةِ رَمْضَانَ فَطَرَوَ صُمْتُ وَقَصَرَ وَاَتْمَمْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَصَرْتَ وَاَتْمَمْتُ وَاَفْطَرْتَ وَصُمْتُ قَالَ اَحْ...

عَابَ عَلَىَّ–

"হযরত আয়িশা (রদ্বি.) বলেন, আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে রামাদ্বান মাসে উমরাহ্‌র জন্য গিয়েছি। তখন তিনি রোযা রাখেনি কিন্তু আমি রোযা রেখেছি। তিনি নামায কাস্‌র পড়েছেন আর আমি পরিপূর্ণ পড়েছি। অতঃপর আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি কাস্‌র করলেন,আমি পরিপূর্ণ পড়লাম, আপনি রোযা রাখেন নি,অথচ আমি রোযা রাখলাম। (এটা কেমন হলো?) হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'হে আয়িশা! তুমি ভালোই করেছো' এবং তিনি আমাকে দোষী করেন নি।"

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো যে, সফরে কাস্‌রও বৈধ,পরিপূর্ণ পড়াও বৈধ।

জবাব : এ হাদীস কেবল 'যঈফই (দূর্বল) নয়, বরং সম্পূর্ণ ভুলও বানোয়াট। কেননা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাদ্বান মাসে কোন উমরাহ করেন নি। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মোট চার বার উমরাহ্ করেছেন। এর সবই যিলক্বাদ মাসেই করেছেন। অবশ্য বিদায় হজ্বের উমারাহ্‌র ইহরাম যিলক্বাদ মাসেই করা হয়েছিল। আর 'উমরাহ্‌র' কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছিল যিলহাজ্ব মাসেই। বিশেষতঃ হযরত আয়িশা সিদ্দীকাহ (রদ্বি.) এর রামাদ্বান মাসের উমরাহ্'য় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গী হওয়া এমনই আজব ও জটিল মাসআলা, যা ওহাবীরাই সমাধান করতে পারবে। ওহাবীরা, প্রথমে নিজেদের অভিমতকে বিবেকের নিক্তিতে তোল, এরপরই বলো।

আপত্তি নং ৪ : মুসলিম ও বুখারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন–

قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنٰى رَكْعَتَيْنِ وَاَبُوْبَكْرٍ وَبَعْدَهُ عُمَرَ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ اِنَّ عُثْمَانَ صَلّٰى بَعْدُ اَرْبَعًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا صَلّٰى مَعَ الْاِمَامِ صَلّٰى اَرْبَعًا وَاِذَا صَلّٰى وَحْدَهُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ–

"তিনি বলেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিনায় দু রাকআত পড়েছেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রদ্বি.) তাঁর পরে হযরত উমর ফারূক (রদ্বি.) এবং উসমান গনী (রদ্বি.) তাঁর খিলাফাতের প্রথম দিকে দু'রাকআতই পড়েছেন। পরবর্তীতে উসমান (রাঃ) মিনায় চার রাকআত পড়েন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রদ্বি.) যখন ইমামের সাথে পড়তেন তখন চার

রাকআতই পড়তেন আর যখন একাকী পড়তেন তখন দু রাকআত পড়তেন।"

যদি সফরে কাস্‌র ফরয হতো এবং পরিপূর্ণ পড়া জায়েয না হতো তাহলে উসমান গনী (রদ্বি.) 'মিনা'য় পরিপূর্ণ কেন পড়তেন?

জবাব : এর কয়েকটি জবাব রয়েছে।

এক, এ হাদীসটি তোমাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। তোমরা তো মুসাফিরকে কাস্‌র অথবা পরিপূর্ণ যে কোন একটি পড়ার এখতিয়ার (স্বাধীনতা) দিয়েছ। অথচ এ হাদীস থেকে জানা গেলো যে, হুযূর আনওয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সিদ্দীকে আকবর, ও ফারুকে আযম (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) সর্বদা কাস্‌র পড়েছেন। হযরত উসমান গনী (রদ্বি.) যখন স্বীয় খিলাফাতের শুরুতে কাস্‌র পড়েছেন তখন পরিপূর্ণ পড়েননি। পরবর্তীতে যখন পরিপূর্ণ পড়তে শুরু করলেন তখন আর কখনো কাস্‌র পড়েননি। এদের কেউই এখতিয়ার দেননি। তোমরা এ এখতিয়ার কোত্থেকে পেলে?

দুই, হযরত উসমান গনী (রদ্বি.) শুধুমাত্র মিনা শরীফে পরিপূর্ণ পড়েছেন সাধারণ সফরগুলোতে নয়। বুঝা গেলো হযরত উসমান গনী (রদ্বি.)ও সফরে পরিপূর্ণ পড়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। কোন বিশেষ কারণে মিনা শরীফে পরিপূর্ণ পড়েছেন।

তিন, হযরত উসমান গনী (রদ্বি.) যে মিনায় পরিপূর্ণ পড়েছেন তা এ জন্য নয় যে, তিনি কাস্‌র ও পরিপূর্ণ উভয়টি পড়া জায়িয মনে করতেন। বরং তা ভিন্ন কারণেই করেছেন। এর কারণ কি ছিল এ সম্পর্কে দুটি রিওয়ায়াত পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বর্ণনা করেন, যখন হযরত উসমান গনী (রদ্বি.) মিনায় চার রাকআত পড়লে লোকেরা এ ব্যাপারে আপত্তি করলো, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি কোন শহরে ঘরের মালিক হয়, তখন সে সেখানে মুক্বীমের নামায পড়বে। (অর্থাৎ কাস্‌র পড়বেনা)। যেমন, মুসনাদে ইমাম আহমদে বর্ণিত হাদীসের শেষের শব্দাবলী এরূপ-

أَنَّهُ صَلَّى بِمِنٰى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّىْ تَأَهَّلْتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ وَإِنِّىْ سَمِعْتُ — (الخ)

(مرقاة- فتح قدير)

"হযরত উসমান (রদ্বি.) মিনায় চার রাকআত পড়েন। তখন সকলে এ ব্যাপারে আপত্তি করলে তিনি বললেন, আমি মক্কা মুআয্‌যামায় আসার পর থেকে এখানকার বাসিন্দা হয়ে গিয়েছি .....।" (মিরকাত ও ফাতহুল কাদীর) এ রিওয়ায়াত থেকে তিনটি মাসআলা জানা গেলো।

এক, হযরত উসমান গনী (রাদ্বি.) শুধুমাত্র মিনায় চার রাকআত পড়েছেন, প্রত্যেক সফরে নয়।

দুই, সমস্ত সাহাবী তাঁর একাজের ব্যাপারে আপত্তি করেছেন। যা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, সমস্ত সাহাবী সব সময় সফরে কাস্‌রই পড়তেন। কখনোই পরিপূর্ণ পড়তেন না। নচেৎ তাঁরা হযরত উসমান (রাদ্বি.) এর ব্যাপারে আপত্তি করতেন না॥

তিন, হযরত উসমান (রাদ্বি.) মক্কা মুআয্‌যামায় জমি ক্রয় করেছেন, সেখানে বাসস্থান তৈরী করেছেন এবং নিজের একজন স্ত্রীকে রেখেছেন এই জন্যই মক্কা মুআয্‌যামা তার এক ধরনের আবাসভূমি হয়ে যায়। আর কেউ নিজের বাসস্থানে এক দিনের জন্য গেলেও মুকীম হয়ে যাবে; কাস্‌র পড়বেনা, সে নামায পরিপূর্ণই পড়বে। তাই হযরত উসমান গনী (রাদ্বি.) এর এ আমল ওহাবীদের এখতিয়ার সম্পর্কিত মাসআলা থেকে অনেক দূরে।

দ্বিতীয় রিওয়ায়াত হলো হযরত উসমান (রাদ্বি.) এর খিলাফাতের সময়কার নও মুসলিমগণ হজ্বে হযরত উসমান (রাদ্বি.) কে দু'রাকআত পড়তে দেখে মনে করলেন, ইসলামে সকল নামায দু'রাকআত করেই ফরয। যখন হযরত উসমান (রাদ্বি.) তাঁদের ভুল ধারনা সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন তাদের এ ভুল ধারনাকে দূর করার জন্য শুধুমাত্র মিনায় পরিপূর্ণ পড়েছেন। অর্থাৎ তিনি চার রাকআত পড়েছেন। যেমন, আবদুর রায্‌যাক ও দারু কুতনী ইবনে জুরিহ থেকে রিওয়ায়াত করেন-

بَلَغَنِىْ أَنَّهُ أَوْفٰى أَرْبَعًا بِمِنٰى فَقَطْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَاهُ فِىْ مَسْجِدِ خَيْفٍ بِمِنٰى يَاأَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَازِلْتُ أُصَلِّيْهَا رَكْعَتَيْنِ مُنْذُ رَأَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ صَلَّيْتَهَا رَكْعَتَيْنِ فَخَشِىَ عُثْمَانُ أَنْ يَظُنَّ جُهَّالُ النَّاسِ الصَّلٰوةَ رَكْعَتَيْنِ وَإِنَّمَا هُوَ كَانَ أَوْفَاهَا بِمِنٰى-

"আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছলো যে, হযরত উসমান (রাদ্বি.)শুধুমাত্র মিনাতেই চার রাকআত পড়েছেন। কারণ একজন বেদুঈন মসজিদে খাইফে তাঁকে বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি গত বছর আপনাকে দু'রাকআত পড়তে দেখে এখন নিয়মিত দু'রাকআতই পড়ছি। তখন হযরত উসমান (রাদ্বি.) আশংকা করলেন যে, মূর্খ লোকেরা প্রত্যেক নামাযকেই দু'রাকআত মনে করবে। এরপর তিনি মিনায় পুরো চার রাকআত পড়লেন।"

ইমাম আহমদ ও আবদুর রায্‌যাকের এ দু'রিওয়ায়াতের মধ্যে এ ভাবেই সামঞ্জস্যতা বিধান করা যায় যে, যখন হযরত উসমান গনী (রাদ্বি.) লোকদের এ

ভুল ধারনা সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন মক্কা মুআয্‌যামায়ও একটি ঘর তৈরী করলেন- যাতে এখানে এসে মুক্বীম হিসাবে পরিপূর্ণ নামায পড়তে পারেন।

তাই হযরত উসমান গনী (রাদ্বি.) এর এ আমল শরীফ থেকে লা মাযহাবী ওহাবীরা কোন ধরনের দলীল গ্রহণ করতে পারে না।

আপত্তি নং ৫ : শরীআত মুসাফিরকে রোযা রাখা না রাখার ব্যাপারে এখতিয়ার দিয়েছে। অর্থাৎ মুসাফিরের উপর সফরকালীন রোযা রাখা যেমন ফরয নয়, তেমনি কাযা করাও ফরয নয়। অনুরূপভাবে সফরে নামাযে ব্যাপারেও এখতিয়ার থাকা উচিত। অর্থাৎ সে চাইলে কাসর করবে অথবা পুরোপুরি পড়বে। তার জন্য কাসর আবশ্যক করে দেয়া রোযার এখতিয়ারের পরিপন্থী।

জবাব : শুকরিয়ার বিষয় হলো যে, তোমরাও কিয়াসের পক্ষপাতী হয়ে গেলে। আর নামাযের কাস্‌রকে রোযার কাযার উপর কিয়াস করতে শুরু করলে। হানাফী মুকাল্লিদ কিয়াস করলে তখন তোমাদের দৃষ্টিতে মুশরিক হয়ে যায়। আর তোমরা কিয়াস করলে সেটা খাঁটি তাওহীদই থেকে যায়। আফসোস!

জনাব, রোযা সফরে সম্পূর্ণ মাফ নয়। বরং মুসাফিরকে রোযা কাযা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যদি সফরে রোযা রাখে,তাহলে পরিপূর্ণ রাখবে। আর কাযা করলে সম্পূর্ণ কাযা করবে। কিন্তু ফরয নামায সফরে অর্ধেক মাফ হয়ে গেছে। অর্থাৎ চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে কেবলমাত্র দু'রাকআতই বাকী আছে। বাকী দু'রাকআত সফরে কিংবা নিজ বাসস্থানে পৌছার পর কোন অবস্থাতেই পড়বে না। মাফ হয়ে যাওয়া আর বিলম্বে পড়ার অনুমতি ভিন্ন বিষয়। তাই নামাযের কাস্‌রকে রোযার বিলম্বকরণের উপর কিয়াস করা যায় না। মুসাফিরের জন্য রোযা মাফ নয়। নচেৎ তার কাযা ওয়াজিব হতো না। তার উপর রোযা ফরয।

কিন্তু এ দু'রাকআত তার জন্য সম্পূর্ণ মাফ। এ জন্যই তার কাযা নেই। তাই এ দু'রাকআত তার জন্য নফল। আর নফল নামায ফরযের তাকবীরে তাহরীমায় আদায় হওয়া শরীআতের নিয়মের বিরোধী।

মাসআলা : মুসাফিরের উপর ফরয হলো, সফর অবস্থায় বাকী থাকা রোযা গুলো নিজ বাসস্থানে পৌছেই আদায় করতে শুরু করবে। যদি সফরে আটটি রোযা কাযা হয়। এরপর বাসস্থানে পৌছে রোযা না রেখেই চার দিন পর মারা যায় তাহলে কিয়ামতে ঐ চারটি রোযার জন্য শাস্তি দেয়া হবে। বাকী চারটির জন্য কোন শাস্তি হবে না। কারণ সে ওগুলো আদায় করার সময়ই পায়নি। অসুস্থ ও ঋতুবর্তী মহিলার হুকুমও এটাই। অর্থাৎ সুস্থ হওয়ার পর পরই রোযা পূর্ণ করতে শুরু করবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ফজরের নামায ফর্সা (ভোর) হওয়ার পর পড়ুন

হানাফীদের মতে ফজরের নামায ফর্সা (ভোর) হওয়ার পর পড়াই উত্তম। সূর্যোদয়ের আধ ঘন্টা আগে জামাআতের জন্য দাঁড়াবে। কিন্তু লা-মাযহাবী ওহাবীদের মতে ফজরের নামায প্রথম সময়ে অর্থাৎ অন্ধকারেই পড়া উচিত। এ জন্য আমরা এ অধ্যায়কে দুটো পরিচ্ছেদে বিভক্ত করছি। প্রথম পরিচ্ছেদে এর প্রমান, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে সওয়াল ও জবাব সমূহ দেয়া হয়েছে।

জরুরী নির্দেশিকা : স্মতর্ব্য যে, হানাফী মাযহাবে দুই নামায অর্থাৎ মাগরিব ও শীতকালীন যোহর নামায ব্যতীত সকল নামায কিছুটা বিলম্ব করে পড়াই উত্তম। মাগরিবের নামাযে তাড়াতাড়ি করাই মুস্তাহাব। তেমনিভাবে শীতকালে যোহরের নামাযও ওয়াক্ত হওয়ার পরপরই পড়া মুস্তাহাব। আমাদের এ কিতাবের কলেবর বৃদ্ধির আশংকা না থাকলে আমরা প্রত্যেক নামাযই ওয়াক্ত হওয়ার পর কিছুটা বিলম্ব করার সপক্ষে অনেকগুলো দলীল উপস্থিত করতাম। শুধুমাত্র ফজরের নামাযের বিলম্বকরণ সম্পর্কে পরিপূর্ণ আলোচনা করছি। যাতে পাঠকগণ বুঝতে পারেন যে, হানাফী মাযহাব কেমন মজবুত ও দলীল ভিত্তিক।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফজরের নামায ফর্সা করে পড়া ছাওয়াব

সব সময় সকল ঋতুতেই ফজরের নামায ভাল ভাবে আলোকিত হওয়ার পর পড়াই মুস্তাহাব। তবে যিলহজ্বের দশ তারিখে হাজ্বীগণ মুয্‌দালিফায় ফজরের নামায অন্ধকারেই পড়বে।

ফজরের নামায ফর্সা হওয়ার পর পড়ার সপক্ষে অনেক হাদীস রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কিছু হাদীস নিম্নে পেশ করা হচ্ছে-

হাদীস নং ১-৮ : তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, ইবনে হাব্বান, আবূ দাঊদ তায়ালুসী ও তাবরানী কিছুটা ভিন্নতা সহকারে হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন–

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ وَقَالَ التِّرْمِذِىْ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ–

"তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ

করেছেন- তোমরা ভোর ফর্সা হওয়ার পর ফজরের নামায আদায় কর। কারণ এর ছাওয়াব অধিক। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি 'সহীহ'।"

স্মতর্ব্য যে, এ হাদীসে ফর্সা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ভাল ভাবে আলোকিত করা। অর্থাৎ যখন ভোরের প্রভা ছড়িয়ে পড়বে। এ নির্দেশের অর্থ এটা নয় যে, নিশ্চিতরূপে ফজর হওয়ার পরই নামায পড়ো। কেননা এটা ছাড়া তো নামাযই হবে না। যেরূপ আলোকিত হওয়ার দ্বারা ছাওয়াব বৃদ্ধি পায়, তা হচ্ছে ঐ আলো যা আমরা বলেছি।

হাদীস নং ৯-১০ : বুখারী ও মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন-

قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى صَلٰوةً بِغَيْرِ وَقْتِهَا اِلَّا بِجَمْعٍ فَاِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَيُصَلِّيْ صَلٰوةَ الصُّبْحِ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ وَقْتِهَا-

"আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কখনো এক ওয়াক্তের নামায অন্য ওয়াক্তে পড়তে দেখিনি। তবে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুয্দালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রিত করেছেন এবং এরপর ফজর নামায সাধারণ ওয়াক্তের পূর্বেই আদায় করেছেন।"

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো যে, হুযূর আনওয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা ফজরের নামায ফর্সা হওয়ার পর পড়তেন। কিন্তু মুযদালিফায় ১০ ই জিলহজ্বে অন্ধকারে অর্থাৎ প্রচলিত ওয়াক্তের পূর্বে পড়েছেন। যদি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদাই প্রথম ওয়াক্তে পড়তেন, তাহলে মুয্দালিফায় প্রথম ওয়াক্তে পড়ার অর্থ কি? কেননা, এর পূর্বেতো ফজরের ওয়াক্তই হয় না।

স্মর্তব্য যে, মুয্দালিফায় কোন নামায ওয়াক্তের পূর্বে আদায় করা হয় না। হ্যাঁ মাগরিবের নামায ইশার ওয়াক্তে পড়া হয়। আর ফজরের নামায নির্ধারিত সময়েই আদায় করা হয়। এর উপরই সকল উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত। এ হাদীসের অর্থ এটা নয় যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের নামায ওয়াক্ত হওয়ার আগে অর্থাৎ রাত্রিতে পড়েছেন। বরং দৈনন্দিন প্রচলিত সময়ের পূর্বে পড়েছেন। এ অর্থে হাদীসটি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট।

হাদীস নং ১১-১৪ : আবূ দাঊদ তায়ালুসী, ইবনে আবি শায়বা, ইসহাক ইবনে রাহভিয়াহ ও তাবরানী 'মু'জাম' গ্রন্থে হযরত রাফি' বিন খাদীজ থেকে

রিওয়ায়াত করেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ يَا بِلَالُ نَوِّرْ بِصَلٰوةِ الصُّبْحِ حَتّٰى يَبْصُرَ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ مِنَ الْاِسْفَارِ-

"তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত বিলালকে (রাদ্বি.) কে হুকুম দিলেন, হে বিলাল! ফজরের নামায আলোকিত করে পড়, যাতে লোকেরা তাদের নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার জায়গা দেখতে পায়।"

এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো যে, হুযূর আনওয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের নামায এমন সময়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, যখন তীরন্দাজ তার নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার জায়গা দেখতে পায়। আর এটা তখনই হয়, যখন ভোরের আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

হাদীস নং ১৫ : দায়লামী হযরত আনাস (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَوَّرَ بِالْفَجْرِ نَوَّرَ اللّٰهُ فِيْ قَبْرِهِ وَقَلْبِهِ وَقَبِلَ صَلٰوتَهُ-

"তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায আলোকিত হওয়ার পর পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার কবর ও অন্তর আলোকময় করবেন। অন্য রিওয়ায়াতে এসেছে যে, তাঁর নামায আলোকিত করবেন।"

হাদীস নং ১৬-১৭ : তাবরানী 'আওসাত' গ্রন্থ এবং বায্যার হযরত আবূ হুরায়রা (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ اُمَّتِيْ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا اَسْفَرُوْا بِصَلٰوةِ الْفَجْرِ-

"তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমার উম্মত দ্বীনে ফিতরাত (স্বভাবগত ধর্ম) এর উপর থাকবে, যতদিন পর্যন্ত তারা ফজরের নামায ভোর ফর্সা হওয়ার পর পড়বে।"

হাদীস নং ১৮ – ২৩ : তাহাবী, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্ প্রমুখ কিছুটা শাব্দিক ভিন্নতা সহকারে হযরত ইয়াসার ইবনে সালামাহ থেকে রিওয়ায়াত করেন-

قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِيْ عَلٰى اَبِيْ بَرْزَةَ يَسْئَلُهُ اَبِيْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلٰوةِ

الصُّبْحِ وَالرَّجُلُ يَعْرِفُ وَجْهَ جَلِيْسِهٖ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيْهَا بِالسِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ–

"তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে সাহাবী হযরত আবূ বারযাহ্'র নিকট গিয়েছি। আমার পিতা তাঁকে হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের নামায এমন সময়ে শেষ করতেন,যখন সকলে তাদের সঙ্গীর চেহারা চিনতে পারতেন। অথচ হুযূর আনওয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযে ষাট থেকে একশ আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন।"

হাদীস নং ২৪ : তাহাবী হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ থেকে রিওয়ায়াত করেন–

قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ إِبْنِ مَسْعُوْدٍ فَكَانَ يُسْفِرُ بِصَلٰوةِ الصُّبْحِ–

"তিনি বলেন, আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) এর সাথে ফজরের নামায পড়তাম। তিনি ফর্সা হওয়ার পর ফজরের নামায পড়তেন।"

হাদীস নং ২৫ : বায়হাকী 'সুনানে কুরবা'য় আবূ উসমান নাহদী থেকে রিওয়ায়াত করেন –

قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَمَا سَلَّمَ حَتّٰى ظَنَّ الرِّجَالُ ذَوُالْعُقُوْلِ أَنَّ الشَّمْسَ طَلَعَتْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالُوْا يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَادَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ قَالَ فَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ قَالَ قَالُوْا لَوْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِيْنَ–

"তিনি বলেন, আমি হযরত উমর (রাদ্বি.) এর পিছনে ফজরের নামায পড়েছি। তিনি নামায এতই দীর্ঘ করলেন যে, অনেক বিজ্ঞ লোক মনে করলেন যে, সূর্য উদিত হয়ে গেছে। সালাম ফিরানোর পর সকলে বললো 'হে আমীরুল মু'মিনীন! সূর্যতো প্রায় উঠেই যাচ্ছে"। এরপর তিনি কিছু কথা বললেন,যা আমি বুঝতে পারিনি। আমি লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত উমর (রাদ্বি.) কি বলেছেন? সকলে বললো, তিনি বলেছেন, যদি সূর্য উদিত হতো,তাহলে তোমরা আমাকে অসতর্ক পেতে না।"

হাদীস নং ২৬ : বায়হাকী 'সুনানে কুবরা' গ্রন্থে হযরত আনাস (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন–

قَالَ صَلّٰى بِنَا أَبُوْبَكْرٍ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ اٰلَ عِمْرَانَ فَقَالُوْا كَادَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ قَالَ لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِيْنَ–

"তিনি বলেন, আমাদেরকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাদ্বি.) ফজরের নামায পড়িয়েছেন। তিনি তাতে 'সূরা আলে ইমরান' পাঠ করলেন। লোকেরা বললো, 'সূর্য তো উদিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তিনি বললেন, 'সূর্য যদি উদিত হতো, তাহলে তোমরা আমাকে অসতর্ক পেতে না।"

হাদীস নং ২৭ – ২৮ : ইমাম তাহাবী ও মুল্লা খসরু মুহাদ্দিস স্বীয় সনদে ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাদ্বি.) থেকে, তিনি হাম্মাদ থেকে তিনি ইবরাহীম নাখঈ থেকে রিওয়ায়াত করেন–

قَالَ مَا اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى شَيْءٍ كَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى التَّنْوِيْرِ فِى الْفَجْرِ وَالتَّعْجِيْلِ فِى الْمَغْرِبِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ لَايَصِحُّ أَنْ يَّجْتَمِعُوْا عَلٰى خِلَافِ مَاكَانَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–

"তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীগণ কোন মাসআলার ব্যাপারে এতবেশী ঐক্যমত্য পোষন করেননি, যেমন করেছেন 'ফজরের নামায আলোকিত অবস্থায় ও 'মাগরিবের নামায খুব তাড়াতাড়ি পড়ার ব্যাপারে। তাহাবী বলেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিআল্লাহু আনহুম) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আমলের পরিপন্থী কোন বিষয়ের উপর ঐক্যমত্য পোষণ করা অসম্ভব।

এ হাদীস সমূহ দ্বারা বুঝা গেলো যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাদ্বি.) ও উমর ফারূক (রাদ্বি.) ফর্সা হলেই ফজরের নামায পড়তেন। এতে সবাই সূর্য উদিত হওয়ার আশংকা করতেন। সাহাবায়ে কেরামের সর্ব সম্মত আমল এর উপরই ছিলো যে ভোর আলোকিত হলেই ফজরের নামায পড়তে হবে।

হাদীস নং ২৯ : ইমাম তাহাবী হযরত আলী ইবনে রাবীআহ থেকে রিওয়ায়াত করেন–

قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ يَاقَنْبَرُ أَسْفِرْ أَسْفِرْ–

"তিনি বলেন, আমি হযরত আলী মুরতাদ্বা (রাদ্বি.)কে বলতে শুনেছি যে, হে কানবার! তুমি (ফজরের নামাযকে) আলোকিত কর, আলোকিত কর।"

বুঝা গেলো যে, হযরত আলী মুরতাদ্বা (রাদ্বি.) ভোর ফর্সা হলেই ফজরের

নামায পড়তেন। যা اَسْفِرْ (আলোকিত কর) শব্দটি দু'বার বলা থেকে প্রতীয়মান হয়।

আমরা এখানে এ ২৯ টি হাদীস উদাহরণ স্বরূপ পেশ করলাম। আরো বেশী জানতে চাইলে তাহাবী শরীফ ও সহীহ বিখারী শরীফ অধ্যয়ন করুন। যে ভাবেই হোক বুঝা গেল যে, ফজরের নামায আলোকিত অবস্থায় পড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের (রাদিআল্লাহু আনহুম) সুন্নাত। উপরন্তু এটাই হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামের সর্বজনগ্রাহ্য আমল।

বিবেকের চাওয়াও এটা যে, ফজরের নামায আলোকিত অবস্থায় পড়তে হবে কয়েকটি কারণে। এক, ফজরের শাব্দিক অর্থ উজ্জল্য ও আলো। তাই ফজরের নামায আলোকিত অবস্থায় পড়লে নামানুযায়ী হবে। অন্ধকারে পড়া নামের বিরোধী।

দুই, আলোকিত অবস্থায় নামায পড়লে জামাআত বড় হয়। কেননা অধিকাংশ মুসলমান ভোরে একটু দেরীতে ঘুম থেকে উঠে। আর তাড়াতাড়ি উঠলেও তখন অনেকেই ইস্তিনজা, গোসল, ওযু ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকে। কেউ কেউ সুন্নাত.আবার কেউ সুন্নাতের পর ইস্তিগফার, বিভিন্ন আমল, যিক্র আযকারে মশগুল থাকে। ওয়াক্তের শুরুতে ফজরের জামাআত করলে অনেক লোক জামাআত কিংবা তাকবীরে উলা থেকে বঞ্চিত হয়। আলোকিত অবস্থায় পড়লে সকল নামাযী ভালো ভাবে জামাআতের প্রথম তাকবীরে শরীক হতে পারবে। দেখুন! নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত মুআয (রাদ্বি.) কে দীর্ঘ কিরাআত থেকে এ জন্যই নিষেধ করেছেন যে, তা মুকতাদীদের জন্য কষ্টকর হয়। যে কারণে জামাআত ছোট হয় তা থেকে বিরত থাকা উত্তম। যা জামাআত বড় হতে সাহায্য করে তাই গ্রহণ করা উত্তম। আঁধার থাকতেই নামায পড়লে জামাআত ছোট হয়। অপরদিকে আলোকিত অবস্থায় পড়লে জামাআত বড় এবং মুসলমানদের জন্য সহজ হয়। তাই আলোকিত হওয়ার পর পড়াই উত্তম।

তিন, মুসলমানদের জন্য অন্ধকারে মসজিদে আসা কষ্টকর। অপরদিকে আলোকিত অবস্থায় মসজিদে গমন সহজ। যেমন হযরত উমর ফারূক (রাদ্বি.) কে যখন অন্ধকারে নামাযরত অবস্থায় শহীদ করা হলো, তখন সাহাবায়ে কেরাম ফজরের নামায আলোকিত অবস্থায় পড়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করলেন। দেখুন তাহাবী শরীফ, সহীহ বিখারী ও ইবনে মাজাহ ইত্যাদি।

চার, ফজরের নামায কয়েকটি বিষয়ে মাগরিবের নামাযের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মাগরিব হলো রাতের প্রথম নামায। ফজর দিনের প্রথম নামায।

মাগরিব কাজকর্ম বন্ধ হওয়ার সময়। ফজর কাজ কর্ম আরম্ভের সময়। মাগরিব ঘুমানের প্রস্তুতি পর্ব ও ফজর জাগ্রত হওয়ার সময়। সব সময় ফজর ও মাগরিবের সময় সমান সমান হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে কোন ঋতুতে যে পরিমাণ সময় মাগরিবের হবে, ঠিক ততটুকু হবে ফজরের। ফজরের নামায মাগরিবের নামাযের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলো তাই যে ভাবে মাগরিব আলোকিত থাকা অবস্থায় পড়া উত্তম,তেমনি ফজরের নামাযও আলোকিত অবস্থায় পড়া শ্রেয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলার ব্যাপারে আপত্তি ও জবাব সমূহ

ফজরের নামায বিলম্বে পড়ার ব্যাপারে আজ পর্যন্ত ওহাবী লা মাযহাবীদের পক্ষ থেকে যে সব আপত্তি আমরা জানতে পেরেছি তা বিস্তারিত ভাবে জবাবসহ আলোকপাত করছি। পরবর্তীতে আরো কোন আপত্তি জানতে পারলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে এর জবাব দেওয়া হবে।

আপত্তি নং ১ : তিরমিযী শরীফে হযরত আলী মুরতাদ্বা (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত–

أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَلِىُّ ثَلٰثٌ لَاتُؤَخِّرْهَا اَلصَّلٰوةُ اِذَا اَتَتْ وَالْجَنَازَةُ اِذَا حَضَرَتْ وَالْاَيِّمُ اِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًّا–

"নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, হে আলী! তিনটি ব্যাপারে দেরী করো না। (১) নামাযের যখন ওয়াক্ত হয়, (২) জানাযা যখন উপস্থিত হয়, এবং (৩) যুবতী মেয়েদের বিবাহ, যখন তার কুফূ তথা উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায়।"

এমনকি তিরমিযী শরীফে সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রদ্বি.) থেকে বর্ণিত–

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوَقْتُ الْاَوَّلُ مِنَ الصَّلٰوةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَالْوَقْتُ الْاٰخِرُ عَفْوُ اللّٰهِ–

"তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, নামাযের প্রথম ওয়াক্তে রয়েছে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি এবং নামাযের শেষ ওয়াক্ত আল্লাহ তাআলার ক্ষমা।"

এ হাদীস সমূহ থেকে প্রতিভাত হলো যে, প্রত্যেক নামায প্রথম ওয়াক্তে

পড়া উচিত। হানাফীরা ফজরের নামায দেরীতে পড়ার কারণে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত।

জবাব : এ আপত্তির কয়েকটি জবাব রয়েছে। এক, এ হাদীসখানা তোমাদেরও বিরোধী। কেননা তোমরাও ইশার নামায এবং গ্রীষ্মকালে যোহরের নামাযে বিলম্বকরণকে মুস্তাহাব ও উত্তম মনে করো। তাই তোমরাও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত। এখন তোমরা যে জবাব দিবে,সেটাই আমাদের জওয়াব।

দুই, উল্লেখিত হাদীস সমূহে প্রথম ওয়াক্ত দ্বারা মুস্তাহাব সময়ের প্রথম ওয়াক্ত উদ্দেশ্য; সাধারণ প্রথম ওয়াক্ত নয়। অর্থাৎ যখন নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত শুরু হয়, তখন দেরী করো না। ফজরের নামাযে আলোকিত হওয়াই প্রথম ওয়াক্ত। যেমন ইশার ক্ষেত্রে রাতের এক তৃতীয়াংশ হলো প্রথম ওয়াক্ত।

আপত্তি নং ২ : মুসলিম, বুখারী এবং সমস্ত মুহাদ্দিস বর্ণনা করেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা ফজরের নামায অন্ধকারে পড়তেন। তাই হানাফীদের দেরী করে ফজর পড়া সুন্নাতের পরিপন্থী।

জবাব : এ আপত্তিরও দুটো জওয়াব রয়েছে। এক, غلس শব্দের অর্থ আঁধার। চাই তা সময়ের কারণে আঁধার হোক কিংবা মসজিদের ভিতরের আঁধার। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের নামায আলোকিত অবস্থাতেই পড়তেন। কিন্তু মসজিদে আঁধার থাকতো। কেননা মসজিদে নববী শরীফ অভ্যন্তরে খুবই গভীর করে নির্মান করা হয়েছিল। ছাদে কোন বাতি, ভেন্টিলেটার ইত্যাদি ছিল না। বর্তমানেও যদি মসজিদে নববীতে আলোর ব্যবস্থা না থাকে,তা হলে ভিতরে খুবই অন্ধকার থাকবে। কেননা তা অত্যন্ত গভীর করেই নির্মিত হয়েছে। আঙ্গিনা তথা উঠানও অনেক দূরে।

এ অর্থ গ্রহণ করা হলে এ হাদীসটি প্রথম পরিচ্ছেদে আমাদের সপক্ষে পেশকৃত হাদীস সমূহের বিরোধী নয়।

দুই, যদি غلس শব্দের অর্থ ভোরের আঁধারই হয়, তাহলে এটা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আমল শরীফ। আর কাওল তথা নির্দেশ হচ্ছে তাই,যা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে বলেছি। অর্থাৎ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্ধকারে ফজর পড়েছেন। কিন্তু আমাদেরকে ফর্সা হওয়ার পর পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যখন হাদীসে কাওলী (নির্দেশসূচক) ও ফে'লীর (ব্যবহারিক) মধ্যে দ্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়, তখন হাদীসে কাওলীই (নির্দেশসূচক হাদীস) প্রাধান্য পায়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর) ফে'লী হাদীসের মধ্যে তাঁর অনুপম বিশেষত্বের সম্ভাবনা থাকে। দেখুন, সরকারে

দু'আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্বয়ং নয়জন বিবি বিবাহাধীন ছিলো। অথচ আমাদেরকে (অনুর্ধ্ব) চারজনকে বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছেন। আমরা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুকুমের উপর আমল করতে গিয়ে চারজন বিবি রাখতে পারি। কিন্তু তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশেষ কাজের উপর আমল করতে পারি না। এ কায়েদাটি স্মরণ রাখা উচিত যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাওল তথা মৌখিক নির্দেশ আমলের জন্য অগ্রগন্য।

তিন, আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি যে, সমস্ত সাহাবী (রাদ্বি.) আলোকিত অবস্থায় ফজর পড়তেন। অথচ তাঁরা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপরোক্ত আমল শরীফ দেখেছেন। প্রতীয়মান হলো যে, হাদীসে কাওলীকে প্রাধান্য দিয়ে এর উপর আমল করতেন। অপর হাদীসকে আমলযোগ্য মনে করতেন না।

চার, ফজরের নামায অন্ধকারে পড়া শরীঅতের কিয়াসের পরিপন্থী। ফর্সা অবস্থায় পড়া কিয়াস সম্মত। তাই আলোকিত অবস্থায় পড়ার সম্পর্কিত হাদীসগুলো প্রাধান্য পাবে। কেননা যখন কয়েকটি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়, তখন ঐ হাদীসটি প্রাধান্য পাবে, যা কিয়াস সম্মত তথা যুক্তিভিত্তিক।

দেখুন, একটি হাদীসে এসেছে- اَلْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ আগুনে রান্নাকৃত বস্তু খেলে অযু ওয়াজিব হয়। অন্য হাদীসে দেখা যায়, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (রান্নাকৃত) খাদ্য আহার করে নামায পড়ে ফেল্লেন; অযু করলেন না। প্রথম হাদীসটি কিয়াস বিরোধী আর দ্বিতীয়টি কিয়াস সম্মত। তাই দ্বিতীয় হাদীসকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। প্রথম হাদীসের তা'বীল তথা বিশ্লেষন করা হলো যে, ওখানে অযু অর্থ আহার করার পর হাত ধোয়া, কুলি করা।

তেমনিভাবে এখানেও তা'বীল করা হবে যে, غلس দ্বারা মসজিদের আভ্যন্তরীণ আঁধার বুঝানো হয়েছে, সময়ের কারণে আঁধার নয়। যাই হোক আলোকিত করণের হাদীসই অগ্রগন্য।

আমাদের ঘোষণা

কোন ওহাবী এমন একটি মারফূ' হাদীস পেশ করতে পারবেনা, যেটাতে ফজরের নামায অন্ধকারে পড়ার হুকুম দেয়া হয়েছে, যেমন আমরা ফজরের নামায আলোকিত অবস্থায় পড়ার হুকুম সম্বলিত অনেক হাদীস উপস্থাপন করেছি।

পাঁচ, অন্ধকারে পড়ার হাদীস সমূহ বৈধতা বর্ণনার জন্যই এসেছে। আর ফর্সা হওয়ার পর পড়ার হাদীসসমূহ মুস্তাহাব সাব্যস্তকরণের জন্য। উভয় প্রকারের হাদীস পরস্পর দ্বান্দ্বিক নয়। অর্থাৎ অন্ধকারে ফজর পড়া বৈধ। কেননা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর আমল করেছেন। আর আলোকিত অবস্থায় ফজর পড়া মুস্তাহাব। কেননা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশ দিয়েছেন।

আপত্তি নং ৩ : ইমাম মুসলিম ও বুখারী হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকাহ (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন–

قَالَتْ كَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفَ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَايُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلْسِ–

"তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ফজরের নামায শেষ করতেন, তখন মহিলারা চাদর জড়িয়ে মসজিদ থেকে ফিরে আসতেন। আঁধারের কারণে তাদেরকে চেনা যেতো না।"

বুঝা গেল যে, ফজরের নামায এমন তাড়াতাড়ি শুরু করা সুন্নাত যে, ষাট অথবা একশ আয়াত পড়ে নামায শেষ করার পরও যেন কোন নামাযীকে আধারের কারণে চেনা না যায়।হানাফীরা এমন আলোকিত অবস্থায় ফজর পড়ে যে, নামায শুরু করার সময়ই সবাইকে চেনা যায়। সুতরাং তাদের এ আমল সুন্নাতের পরিপন্থী।

জবাব : এর জবাব আপত্তি নং ২ এর জবাবে দেয়া হয়েছে।এটা অভ্যন্তরীন মসজিদের আঁধার ছিল, সময়ের কারণে নয়। অথবা সেই আমল শরীফের উপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশ অগ্রগন্য। এখানে একটি জওয়াব এটাও হতে পারে যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র যামানায় মহিলারা নামাযের জামাআতে উপস্থিত হওয়ার রেওয়াজ ছিল। তাদের সুবিধার্থে ফজরের নামায তাড়াতাড়ি পড়া হতো। যাতে মহিলারা পর্দা সহকারে ঘরে যেতে পারে। পরবর্তীতে ফারূকে আযম (রাদ্বি.) এর খেলাফতের সময়ে মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়। ফলে এ প্রয়োজনীয়তাও থাকলো না। মহিলাদেরকে জামাআতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের তাৎপর্য ও কারণ আমার রচিত 'ইসলামী যিন্দেগী' বইয়ে দেখুন।

আপত্তি নং ৪ : তিরমিযী শরীফে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত –

قَالَتْ مَا صَلَّي رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ

www.AmarIslam.com

لِوَقْتِهَا الْأٰخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتّٰى قَبْضَهُ اللّٰهُ–

"তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন নামায দু'বারও শেষ ওয়াক্তে পড়েন নি। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাঁকে ওফাত দেন।"

এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, সকল নামায বিশেষতঃ ফজরের নামায ওয়াক্তের শুরুতে পড়া হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্থায়ী সুন্নাত। এ হুকুম রহিত হয়নি। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া থেকে বিদায়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এর উপর আমল করেছেন। আফসোস! হানাফীরা এমন চিরন্তন সুন্নাত থেকে বঞ্চিত - যা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সব সময় করেছেন।

জবাব : এ আপত্তির কয়েকটি জবাব রয়েছে। এক, এ হাদীসটি 'সহীহ'ই নয় এবং এর সনদ মুত্তাসিলও নয়। কেননা এ হাদীসটি ইসহাক ইবনে উমর হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। অথচ হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রাদ্বি.) এর সাথে ইসহাক ইবনে উমরের কখনো সাক্ষাৎও হয়নি। তাই উভয়ের মাঝে একজন রাবী বাদ পড়েছেন। এ জন্য ইমাম তিরমিযী এ হাদীস সম্পর্কে বলেন, قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ "আবূ ঈসা তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি 'গরীব' পর্যায়ের এবং এ হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয়।" তিরমিযীর হাশিয়ায় উল্লেখ রয়েছে – لِاَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ مُلَاقَاةُ اِسْحَاق مَعَ عَائِشَةِ "কেননা, হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রাদ্বি.) এর সাথে ইসহাকের সাক্ষাত প্রমাণিত হয় নি।" তাই এ হাদীসটি আমলযোগ্য নয়। আফসোস! ওহাবীরা আমাদের কাছ থেকে একেবারে 'সহীহ' ও বিশুদ্ধ হাদীস তলব করে, অথচ তারা এমন যঈফ তথা দূর্বল ও আমলের অযোগ্য হাদীস সমূহ পেশ করতে একটুও দ্বিধা করে না।

দুই, এ হাদীসটি অনেক হাদীসের বিরোধী। কেননা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বহুবার বেশ কিছু নামায শেষ ওয়াক্তে পড়েছেন। যখন হযরত জিবরাঈল (আ.) নামাযের ওয়াক্ত সমূহ নির্ধারিত করার জন্য এসেছিলেন তখন তিনি দু'দিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নামায পড়িয়েছেন। প্রথম দিন সকল নামায ওয়াক্তের শুরুতে, দ্বিতীয় দিন শেষ ওয়াক্তে পড়েছেন। 'পবিত্র বাসর রাত্রিতে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের

www.AmarIslam.com

নামায কাযা পড়েছেন। 'খন্দকের' যুদ্ধে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছু নামায কাযা করে পড়েছেন। সাধারণতঃ সফরের সময় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহ্‌রের নামায ওয়াক্তের শেষে এবং 'আস্‌রের নামায প্রথম ওয়াক্তে পড়তেন। তদ্রুপ মাগরিব শেষ ওয়াক্ত, ইশা প্রথম ওয়াক্তে পড়তেন। একবার হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের নামাযের জন্য একেবারে এবং ওয়াক্তের শেষ পর্যায়ে তাশরীফ নেন। এবং খুবই তাড়াতাড়ি ফজরের নামায পড়লেন। এরপর বললেন, আজ রাত আমি স্বপ্নে দেখলাম, আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরতী হাত আমার পবিত্র বুকের উপর রাখলেন।" (মিশকাত শরীফ, বাবুল মাসাজিদ)

মোট কথা, হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেশ কয়েকবার বিভিন্ন নামায শেষ ওয়াক্তে পড়েছেন। আর পূর্বোল্লেখিত হাদীসে দেখা যাচ্ছে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন নামাযই শেষ ওয়াক্তে দ্বিতীয় বার পড়েন নি। সুতরাং এ রিওয়ায়াত আমল যোগ্য নয়।

তিন, এ হাদীসটি তোমাদেরও বিরোধী। (এ হাদীস পাওয়ায়) তোমরা 'ইশার নামায শেষ ওয়াক্তে অর্থাৎ রাতের এক তৃতীয়াংশ গত হওয়ার পর পড়াকে মুস্তাহাব কেন বলো? এবং গ্রীষ্মকালে যোহর শেষ ওয়াক্তে পড়াকে মুস্তাহাব কেন বলো? এখন যে জাবাব তোমরা দিবে,সেটাই আমাদের জবাব।

আপত্তি নং ৫ : তোমরা ফজরের নামায আলোকিত অবস্থায় পড়ার হুকুম সম্বলিত যে সব হাদীস উল্লেখ করেছো তাতে ফর্সা হওয়া দ্বারা 'সুবহে সাদিক'র ঐ আলোকরশ্মি উদ্দেশ্য, যদ্বারা ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে। তাই হাদীসের অর্থ হচ্ছে –

ফজরের নামায (ওয়াক্তের ব্যাপারে) সন্দেহ থাকা অবস্থায় পড়োনা। বরং ওয়াক্ত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর পড়ো। তথায় اَسْفَار দ্বারা ঐ 'আলো' উদ্দেশ্য নয়, যা হানাফীরা বুঝেছে। অর্থাৎ পুরোপুরি আলোকিত হওয়া। অনেক মুহাদ্দিস এ হাদীসের (আমাদের উল্লেখিত) এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

জবাব : কখনোই নয়। কেননা এতটুকু আলোকিত করে নামায পড়াতো ফরয। সন্দেহ থাকা অবস্থায় ফজরের নামায পড়া জায়েযই নয়। আর এখানে বলা হয়েছে যে, এরূপ আলোকিত অবস্থায় পড়লে ছাওয়াব বেশী। অর্থাৎ এটা মুস্তাহাব; ফরয নয়। তাই এ উজ্জ্বলতা দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ভোরের রশ্মিই, যেটাতে ফজরের নামায পড়া মুস্তাহাব। এবং আমরা যে অর্থ করেছি তাই সঠিক। হাদীস বুঝার জন্য 'বোধশক্তি' প্রয়োজন।

উনিশতম অধ্যায়

যোহর ঠান্ডা করে পড়ুন

যোহরের ওয়াক্ত সূর্য ঢলে পড়লে আরম্ভ হয় এবং তা প্রত্যেক বস্তুর ছায়া মধ্যাহ্নের ছায়া বাদ দিয়ে দ্বিগুন হলে শেষ হয়। যোহরের নামায শীতকালে তাড়াতাড়ি এবং গ্রীষ্মকালে একটু দেরী করে পড়তে হয়, যাতে দুপুরের গরমের তীক্ষ্ণতা দূরীভূত হয়ে কিছুটা ঠান্ডা হয়ে যায়। এটাই সুন্নাত। কিন্তু লা-মাযহাবী ওহাবীরা যোহরের নামায কাঠ ফাটা রোদে পড়ে নেয়। আর বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়ার পর আসর পড়ে নেয়। হানাফীদেরকে বিভিন্ন ভাবে ভর্ৎসনা করে যে, তোমাদের মাযহাব হাদীসের বিরোধী। তাই এ অধ্যায়কেও দুটো পরিচ্ছেদে ভাগ করা হচ্ছে। প্রথম পরিচ্ছেদে এর প্রমাণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ মাসআলার ব্যাপারে আপত্তি ও জবাব সমূহ দেয়া হয়েছে। হানাফীদেরকে নিজেদের দলীল সমূহ ও ওহাবীদের জবাব সমূহ স্মরণ রাখা দরকার।

প্রথম পরিচ্ছেদ

যোহর ঠান্ডা করে পড়ুন

শীতকালে দুপুর বেলা যেহেতু ঠান্ডা থাকে, তাই ঐ ঋতুতে সূর্য ঢলে পড়লেই যোহর পড়া সুন্নাত। কিন্তু গ্রীষ্মকালে দেরী করে পরিবেশ শীতল হলে পড়া সুন্নাত। অর্থাৎ যখন গরমের তীক্ষ্ণতা কমে যায়। দলীলসমূহ নিম্নরূপ :

হাদীস নং ১-৫ : বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবূ দাঊদ ও তিরমিযী হযরত আবূ হুরায়রা (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ وقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

"তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, যখন গরম তীব্র হয় তখন (যোহরের) নামায (কিছুটা) শীতল সময়ে আদায় করবে। তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।"

হাদীস নং ৬-১০ : আবূ দাঊদ তায়লুসী হযরত আবূ হুরায়রা ((রাদ্বি.) থেকে মুসলিম, বুখারী, নাসাঈ, বায়হাকী আবূ সাঈদ খুদরী (রাদ্বি.) থেকে কিছুটা

(শাব্দিক) ভিন্নতা সহকারে রিওয়ায়াত করেন–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ اَكَلَ بَعْضِىْ بَعْضًا فَاَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ– الخ–

"নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, গরমের তীব্রতা হয় জাহান্নামের নিঃশ্বাস থেকে। সুতরাং কিছুটা শীতল সময় যোহর আদায় করবে। দোযখ রব তায়ালার দরবারে অভিযোগ করলো, হে প্রভু! আমার এক অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলেছে। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে দু'বার নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি দিলেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে। অপর নিঃশ্বাসটি গরম কালে।"

হাদীস নং ১১ : নাসাঈ শরীফে হযরত আনাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত –

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ–

"তিনি বলেন, যখন প্রচন্ত গরম পড়তো তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহরের নামায শীতল সময় পড়তেন। আর শীতকালে তাড়াতাড়ি পড়তেন।"

উক্ত হাদীস সমূহ থেকে জানা গেল যে, গরমের সময় যোহর তাড়াতাড়ি পড়া সুন্নাত পরিপন্থী।

হাদীস নং ১২ – ১৯ : বুখারী, আবূ দাউদ, ইবনে আবী শায়বা, তিরমিযী, আবূ দাউদ তায়লুসী, তাহাবী, আবূ আওয়ালা ও বায়হাকী হযরত আবূ যার গিফারী (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন–

قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ اَبْرِدْ حَتّٰى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُوْلِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ–

"তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। তখন মুয়ায্যিন যোহরের আযান দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ঠান্ডা করো।' (অর্থাৎ গরমের তীব্রতা কমলে আযান দাও) আবার মুয়ায্যিন আযান দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলনে, 'ঠান্ডা করো'। অবশেষে এত দেরী করা হলো যে, আমরা বালির ঢিবিগুলোর ছায়া দেখতে পেলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'গরমের তীব্রতা হয় জাহান্নামের নিঃশ্বাস থেকে। প্রচন্ড গরম পড়লে (কিছুটা) শীতল করে নামায আদায় করবে। 'তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি 'হাসান'- সহীহ।"

হাদীস নং ২০ : তাহাবী শরীফে হযরত আবূ মাসঊদ (রাদ্বি.)থেকে বর্ণিত –

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَجِّلُهَا فِى الشِّتَاءِ وَيُؤَخِّرُهَا فِي الصَّيْفِ–

" হযরত আবূ মাসঊদ (রাদ্বি.) দেখেছেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহরের সালাত শীতকালে তাড়াতাড়ি পড়তেন এবং গ্রীষ্মকালে বিলম্ব করে পড়তেন"।

এ সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস উল্লেখ করা যায়। কিন্তু কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানে বিশটি হাদীসকেই যথেষ্ট মনে করছি। বিস্তারিত দেখতে চাইলে সহীহ বুখারী, তাহাবী ইত্যাদি অধ্যয়ন করুন।

স্মর্তব্য যে, জুমু'আর নামাযের ওয়াক্ত ও যোহরের মতই গ্রীষ্মকালে কিছুটা বিলম্বে করে ঠান্ডা সময়ে পড়তে হবে। কেউ কেউ প্রচন্ড গরমেও জুমুআর নামায একেবারে প্রথম সময়ে পড়ে নেয়। এটা সুন্নাতের পরিপন্থী। লা মাযহাবী ওহাবীরা তো সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বেই জুমু'আর নামায পড়তে দ্বিধা করে না।

বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত –

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ يُكَوِّرُ بِالصَّلٰوةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ يَعْنِى الْجُمُعَةَ–

"তিনি বলেন, যখন প্রচন্ড ঠান্ডা পড়তো তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায জলদি এবং প্রচন্ড গরমের সময় ঠান্ডা করে আদায় করতেন- জুমুআর নামায।"

মোট কথা, জুমাআর নামায যোহরের মত শীতকালে তাড়াতাড়ি এবং

গ্রীষ্মকালে কিছুটা দেরী করে গরমের তীব্রতা কমার পর আদায় করা উচিত।

বিবেকের চাওয়াও এটা যে, যোহরের নামায গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা সময়ে আদায় করা উচিত। কারণ তীব্র গরমের সময় যোহর পড়া মুসলমানদের জন্য কষ্টকর। এতে জামাআত ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে। কেননা গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন কর্মব্যস্ত সাধারন লোকেরা দুপুরে খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নেয়। এবং দুপুরের বিরতিটা ঘরেই কাটাতে চায়। আর যদি এ সময় যোহরের নামায পড়তে হয়, তাহলে সে কায়লূলার সুন্নাত (দুপুরে খাওয়ার পর কিছুক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম নেওয়াকে কায়লুলাহ বলে। এটা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত) থেকেও বঞ্চিত হবে, আবার ঐ সময় মসজিদে উপস্থিত হওয়া ও তার জন্য কঠিন হবে। এমতাবস্থায় শরীআত সহজ করে দিয়েছে (যোহরের নামায শীতল সময়ে আদায় করার নির্দেশ দিয়ে)।

ফলাফল : উপরোল্লেখিত হাদীস শরীফ সমূহ এবং যৌক্তিক দলীল দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, যোহরের নামাযের ওয়াক্ত কোন বস্তুর ছায়া দ্বিগুন হওয়া পর্যন্ত থাকে। আসরের ওয়াক্ত ছায়া দ্বিগুণ হলেই আরম্ভ হয়। এর কয়েকটি দলীল নিম্নরূপ :

প্রথম : পূর্বোল্লেখিত হাদীস সমূহ থেকে প্রতিভাত হলো, হুযূর আনওয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহর ঠান্ডা করে পড়তেন এবং সবাইকে নির্দেশ দিতেন। এটাও সুস্পষ্ট যে, সব জায়গাতেই বিশেষতঃ আরব দেশে বস্তুর ছায়া এক গুণ হওয়ার পর দুপুরের গরমের তীব্রতা কমে। এর পূর্বে প্রচন্ড গরম থাকে। আর যদি বস্তুর ছায়া এক গুণ হলেই যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়, তাহলে এ হাদীসগুলো মিথ্যা হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় : পূর্বোল্লেখিত হাদীস সমূহ দ্বারা প্রতিভাত হলো যে, হুযূর আনওয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন সময় যোহরের নামায পড়েছেন,যখন বালির টিবিগুলোর ছায়া দেখা গিয়েছে। বস্তুর ছায়া এক গুণ হলে টিবির ছায়া দেখা যায় না। কেননা প্রশস্ততার কারণে এর ছায়া 'এক মিছল' ছায়ার পড়েই প্রকাশ পায়। যদি 'এক মিছল' হলেই যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়, তাহলে এ হাদীসটি মিথ্যা হয়ে যাবে।

তৃতীয় : আসরের নামাযের ওয়াক্ত সব সময় যোহরের নামাযের ওয়াক্তের চেয়ে কম হওয়াই যুক্তিযুক্ত। যদি 'এক মিছল' হলে আসরের ওয়াক্ত হয়ে যায় তাহলে আসরের ওয়াক্ত যোহরের সমান বরং কখনো যোহরের চেয়ে বেড়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যাবে। এ রূপ হওয়াটা শরয়ী কানূনের পরিপন্থী। কেননা বুখারী শরীফে হযরত ইবন উমর (রাদ্বি.) থেকে একটি মারফূ' হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহুদী খৃস্টানদের মুকাবিলায় স্বীয় উম্মতের উপমা দিয়েছেন, এ ভাবে- কোন ব্যক্তি একজন শ্রমিক ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত রাখল এক 'কীরাত' এর বিনিময়ে, দ্বিতীয় শ্রমিককে দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত রাখলো এক 'কীরাত'র বিনিময়ে, তৃতীয় শ্রমিককে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত রাখলো দু'কীরাত'র বিনিময়ে। প্রথম শ্রমিক হলো ইহুদী, দ্বিতীয় শ্রমিক খ্রীস্টান এবং তৃতীয় শ্রমিক হলো মুসলমান। মুসলমানের কাজের সময় কম, কিন্তু পারিশ্রমিক দ্বিগুণ। হাদীসের শেষোক্ত শব্দাবলী নিম্নরূপ –

اَلَا فَاَنْتُمُ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ اِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ اَلَالَكُمُ الْاَجْرُ مَرَّتَيْنِ–

"সাবধান! তোমরাই সে সব লোক, যারা আসরের নামায থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করেছো। আর তোমাদের পারিশ্রমিক হলো দ্বিগুণ।"

যদি আসরের ওয়াক্ত 'এক মিছল' হওয়ার পর শুরু হতো, তাহলে যোহরের সমান বরং কখনো তা থেকে বেড়ে যেতো। এরূপ হলে মুসলমানদের ক্ষেত্রে এ উপমা (আসর থেকে মাগরিব) দেওয়া হতো না। তাই আসরের নামাযের ওয়াক্ত যোহরের চেয়ে কম হওয়া চাই,তা 'দু মিছল' ছায়া হলেই শুরু হয়।

যদি 'এক মিছল' হলে আসর শুরু হয়, তাহলে বুখারী শরীফের এ হাদীসটিও মিথ্যা হয়ে যাবে। এ জন্যই মেনে নিতে হয় যে, আসর 'দু-মিছল' ছায়া হলেই শুরু হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলার ব্যাপারে আপত্তি ও জবাব সমূহ

এ মাসআলার ব্যাপারে লা-মাযহাবী ওহাবীদের কিছু আপত্তির জওয়াব আমরা প্রথম অধ্যায়ে দিয়েছি। যেমন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, 'নামায প্রথম ওয়াক্তে পড়াই উত্তম।' কিংবা 'তিনটি কাজে কখনো বিলম্ব করো না (১) নামায, (২) জানাযা, (৩) মেয়েকে উপযুক্ত পাত্রের সাথে বিয়ে।'

এ ছাড়াও আরো কিছু আপত্তি রয়েছে। আমরা ঐ আপত্তি সমূহ জবাব সহ উপস্থাপন করছি:

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আপত্তি নং ১ : আবূ দাউদ ও তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। যাতে বলা হয়েছে যে, 'হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে দু'দিন নামায পড়িয়েছেন। প্রথম দিন সকল নামায প্রথম ওয়াক্তে পড়েছেন। দ্বিতীয় দিন সকল নামায শেষ ওয়াক্তে পড়েছেন'। এর কতেক শব্দ নিম্নরূপ-

وَصَلَّى بِى الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ–

"হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে প্রথম দিন আসরের নামায এমন সময় পরিয়েছেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া 'এক মিছল' তথা বস্তুর সমান হলো।"

এ হাদীস দ্বারা প্রতিভাত হলো যে, আসরের ওয়াক্ত 'এক মিছল' ছায়া হলেই শুরু হয় এবং যোহরের ওয়াক্ত এর পূর্বেই শেষ হয়ে যায়।

জবাব : এ আপত্তির কয়েকটি জবাব রয়েছে-

প্রথম ঃ হাদীসটি তোমাদেরও বিরোধী। কেননা, উক্ত হাদীসেই ঐ জায়গায় এটাও রয়েছে-

فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِى الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ–

"যখন দ্বিতীয় দিন হলো তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে যোহরের নামায এমন সময় পড়িয়েছেন,যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া বস্তুর সমান হয়েছিল।"

লক্ষ্যনীয় প্রথম দিন 'এক মিছল' ছায়াতে আসরের নামায পড়িয়েছেন এবং দ্বিতীয় দিন ঐ একই সময়ে যোহরের নামায পড়ালেন। অথচ যোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পরই আসরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। যদি এক 'মিছল ছায়া'য় আসরের ওয়াক্ত হয়ে যায়, তাহলে দ্বিতীয় দিন একই সময়ে যোহরের নামায কেন পড়ানো হলো?

দ্বিতীয় : এ হাদীসে একই জায়গায় এ শব্দগুলো রয়েছে-

وَصَلَّى بِى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ–

"দ্বিতীয় দিন আমাকে যখন আসরের নামায পড়ালেন,তখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া 'দুই মিছল' তথা দ্বিগুন হয়ে গেল।"

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আসরের নামাযের শেষ ওয়াক্ত 'দুই মিছল' ছায়া। অথচ শেষ ওয়াক্ত হলো সূর্যাস্ত।

তৃতীয় : ঐ হাদীসে প্রথম দিনের আসরের নামাযে শুধুমাত্র 'এক মিছল'

ছায়া দ্বিতীয় দিনের আসরের শেষ ওয়াক্ত বর্ণনায় 'দু মিছল' ছায়ার উল্লেখ রয়েছে। 'আসল ছায়া' যা দুপুরের সময় হয় তার উল্লেখ নেই। অথচ তোমরাও বলে থাকো যে, ছায়া 'এক মিছল' হোক বা 'দু মিছল' তা 'আসল ছায়া' বাদ দিয়েই ধর্তব্য। এখন তোমরা যে জবাব দেবে,সেটাই আমাদের জবাব।

চতুর্থ : এ হাদীসে তো এটা রয়েছে যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে 'এক মিছল' ছায়ার সময় আসরের নামায পড়ানো হয়েছে। এবং যে সকল হাদীস আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি তাতে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গ্রীষ্মকালে যোহরের নামায শীতল সময়ে এমনকি বালির স্তুপের ছায়া পড়ার পর আদায় করেছেন, যা 'এক মিছল' পরই দেখা যায়। ফলে হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী হয়ে গেল। এক্ষেত্রে আমাদের পেশকৃত হাদীসগুলোই প্রাধান্য পাবে।

কেননা সেগুলো শরয়ী কিয়াসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আর এ হাদীসটি আমলযোগ্য নয়। কারণ তা শরয়ী কিয়াসের বিরোধী। পরস্পর দ্বন্দ্বের সময় কিয়াসের দ্বারা হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা সাব্যস্ত হয়।

পঞ্চম : হযরত জিব্রাঈল (আ.) এর এ আমল পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। কেননা তা শবে মি'রাজের সকালেই হয়েছিল। যখন নামায সবেমাত্র ফরয হয়েছিল।

আর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যে আমল আমরা প্রমাণিত করেছি - অর্থাৎ শীতল সময় নামায পড়া তা পরের আমল। তাই তোমাদের উল্লেখিত হাদীসটি 'মানসূখ' তথা রহিত। আমাদের পেশকৃত হাদীসগুলো 'নাসিখ' তথা রহিতকারী। তাই এ হাদীসটি আমলযোগ্য নয়।

ষষ্ঠ : শরয়ী কায়দা হলো, সন্দেহমুক্ত 'ইয়াকীনি' বিষয় সন্দহযুক্ত বিষয় দ্বারা বিদূরিত হতে পারে না। ইয়াকীন তথা প্রত্যয় দ্বারা প্রমাণিত বিষয়কে প্রত্যয়ই খতম করতে পারে। এ কায়দার ভিত্তিতে হাজারো মাসআলা উদ্ভাবিত হয়েছে। সূর্য ঢলে পড়ার দ্বারাই যোহরের ওয়াক্ত দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং 'এক মিছল' ছায়াতে উক্ত ওয়াক্ত শেষ হওয়াটা সন্দেহযুক্ত। তাই এ সন্দেহের দ্বারা যোহরের ওয়াক্ত শেষ হবে না, আসরের ওয়াক্তও আরম্ভ হবে না। 'দু মিছলে যোহরের সময় শেষ হওয়া সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত। তাই এ হুকুমটাই আমলযোগ্য।

আপত্তি নং ২ : সাহাবায়ে কেরাম বলছেন যে, আমরা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে যোহরের নামায এমন জলদি পড়তাম যে, জমি বা বিছানা খুবই গরম থাকতো। আমরা এর উপর সিজদা করতে পারতাম

না বলে সিজদার স্থানে কাপড় অথবা ঠান্ডা বস্তু রাখতাম। এতে বুঝা গেলো যে, যোহরের নামায গ্রীষ্মকালেও প্রথম ওয়াক্তেই পড়া উচিত।

জবাব : এর কয়েকটি জবাব রয়েছে।

প্রথম : এ হাদীসটি ঐ সব হাদীসের বিরোধী যাতে গ্রীষ্মকালে যোহর বিলম্ব করার শীতল সময় আদায় করার নির্দেশ রয়েছে এবং ঐ হাদীসসমূহ শরয়ী কিয়াসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তা ই সে গুলোই আমলযোগ্য, আর এ হাদীসটি আমল অযোগ্য বা মানসূখ (রহিত)।

দ্বিতীয় : ভূমি গরম থাকাটা বিশেষতঃ আরব দেশ গুলোতে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত অর্থাৎ 'এক মিছল' ছায়ার পর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তাই এটা পূর্বেরই গরম। সে সময় কিছুটা শীতল হয়ে যায়। সুতরাং এ হাদীসটি পূর্বের ঐ হাদীসগুলোর সম্পূণ বিরোধী নয়; যেগুলোতে ঠান্ডা সময়ে নামায পড়ার হুকুম রয়েছে।

আপত্তি নং ৩ : সাহাবায়ে কিরাম বলেন যে, আমরা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে আসরের নামায এত তাড়াতাড়ি পড়তাম যে, আসরের নামাযের পর 'উট যবেহ করে টুকরো টুক্‌রো করতাম। এরপর ঐ গোস্ত ভুনে সূর্যাস্তের পূর্বেই খেয়ে নিতাম। এমন কি আমাদের কেউ কেউ আসরের নামাযের পর তিন মাইল পথ অতিক্রম করে ঘরে ফিরে যেতো এবং তখনও সূর্য ঝলমল করতো। যেমন মুসলিম শরীফে ও অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, আসরের নামায 'দু মিছলে'র পূর্বেই আদায় করা হতো। কেননা 'দু মিছল' এর পরে এত দীর্ঘ সময় থাকে না, যাতে উপরোক্ত কাজগুলো করা যায়।

জবাব : এ সকল হাদীস সঠিক। কিন্তু তোমাদের উল্লেখিত মন্তব্য ভুল। 'দু'মিছল' এর পরে আসর পড়ে তিন মাইল দূরত্ব খুব ভাল ভাবেই অতিক্রম করা যায়। আরবরা খুবই দ্রুত গতিতে হাঁটতে পারে। আমাদের এখানেও কিছু লোক দশ মিনিটে এক মাইল চলে যেতে পারে। এবং আধ ঘন্টায় তিন মাইল যেতে পারে, আসরের ওয়াক্ত কোন কোন ঋতুতে দু'ঘন্টার বেশী দীর্ঘ হয়। অনুরূপভাবে উট যবেহ করা, গোস্ত ভুনা করা ও সূর্যাস্তের পূর্বে খাওয়া সম্ভব। আরবের অধিবাসীরা যহেব করা, গোস্ত পরিস্কার করার কাজে খুবই চঞ্চল ও চটপটে। এটা পরীক্ষিত।

আপত্তি নং ৪ : মুসলিম ও বুখারী শরীফে হযরত সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ থেকে বর্ণিত -

قَالَ مَاكُنَّا نَقِيْلُ وَلَانَتَغَدّٰى اِلَّابَعْدَ الْجُمْعَةِ–

"আমরা (সাহাবীরা) জুমুআর পরেই সকালের নাস্তা ও কায়লূলাহ (খাওয়ার পর বিশ্রাম) করতাম।" এ থেকে প্রতিভাত হলো যে, জুমুআর নামায তীব্র গরমের সময়ও খুব তাড়াতাড়ি পড়া উচিত। যাতে দুপুরের বিশ্রাম এমনকি সকালের নাস্তাও নামাযের পর করা যায়। এরপরও তোমরা কি ভাবে বলো যে, গ্রীষ্মকালে জুমুআহ শীতল সময় আদায় করো।

জবাব : এর দুটি জবাব রয়েছে। **প্রথম :** এ হাদীসটি প্রকাশ্য অর্থে তোমাদেরও বিরোধী। কেননা এতে জুমুআর নামায নাস্তা ও কায়লূলাহ তথা দুপুরের বিশ্রামের পূর্বেই পড়া আবশ্যক হয়ে যায়। তাই ফজরের পর খুব তাড়াতাড়ি জুমুআহ্ পড়ে নেয়া উচিত। কেননা নাস্তাতো একেবারে প্রত্যুষেই করা হয়। তোমরাও এত তাড়াতাড়ি জুমুআহ পড়ার পক্ষে নও।

দ্বিতীয় : হাদীসের উদ্দেশ্য এটা যে, আমরা জুমুআর দিন জুমুআর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার ফলে নামাযের পূর্বে না আহার করতাম, না দুপুরের বিশ্রাম নিতাম। নামাযের পরই এ সব করতাম। অর্থাৎ নামাজের কারণে আহার ও বিশ্রাম পিছিয়ে দিতেন। আহার ও দুপুরের বিশ্রামের জন্য জুমুআ নির্ধারিত সময়ের আগে পড়তেন না।" যেমন তোমরা বুঝেছো।

তৃতীয় : এ হাদীসে শীতকালের জুমুআর বর্ণনা এসেছে। অর্থাৎ ঐ ঋতুতে দিন ছোট হয়ে থাকে। দুপুরে গরম থাকে না। এ জন্য সূর্য ঢলে পড়ার পরপরই জুমুআ পড়ে নিতেন। দুপুরের আহার ও বিশ্রাম জুমুআর পরেই করতেন। এখনও মদীনাবাসীরা এরূপ করে থাকে। বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত-

أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْجُمْعَةَ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ–

"হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্য ঢলে পড়ার পর জুমুআর নামায পড়তেন।" তাই উপরোল্লেখিত হাদীসের অর্থ এটা নয় যে, জুমুআর নামায সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বেই পড়া হতো। যেহেতু জুমুআর নামায যোহরের নামাযের স্থলাভিষিক্ত,তাই তা যোহরের সময়ই আদায় হবে। এবং গ্রীষ্মকালে শীতল সময়, শীতকালে সূর্য ঢলে পড়ার সাথে সাথেই পড়তে হবে- যোহরের মতই। তাই হাদীসগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

বিংশতম অধ্যায়

আযান এবং তাকবীর এর শব্দাবলী

শরীয়তে আযান একামতের শব্দাবলী এবং ঐগুলোর বিধান প্রায় একই রকম। যে শব্দগুলো আযানের জন্য, সেগুলো একামতের জন্যও ব্যবহৃত হয়। শুধু حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর পর দুই বার قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বৃদ্ধি করতে হয়। আযানের শব্দ সর্বমোট পনরটি। আর একামতের শব্দ সর্বমোট সতেরটি, যা সাধারণতঃ সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

কিন্তু মাজহাব বিরোধী ওহাবীদের আযান এবং একামতও সম্পূর্ণ আলাদা। তারা আযানের মধ্যে اَشْهَدُ দু'বার এর স্থলে চারবার বলে থাকে। প্রথম দু'বার নিচুস্বরে অবশিষ্ট দু'বার উচ্চস্বরে বলে থাকে। যাকে আরবী ভাষায় تَرْجِيْع (তারজী) বলা হয়। অর্থাৎ প্রথম দু'বার اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه নিচুস্বরে বলে থাকে। অবশিষ্ট দু'বার খুব উচ্চস্বরে বলে থাকে। তেমনি ভাবে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ এর বেলায়ও করে থাকে। এ হিসেবে তাদের মতে আযানের শব্দাবলী পনর এর স্থলে উনিশটি। আর একামতের শব্দগুলো একবার করে বলে থাকে। এ ভাবে যে, اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه একবার اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً رسول الله একবার حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ একবার আর حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ একবার। তাদের নিকট একামতের শব্দাবলী 'সতের' এর স্থলে 'তের'টি এবং দাবী করে বেড়ায় যে, ইসলামী আযান ও একামত আমরা যে ভাবে বলি সেটাই সঠিক।

আর তারা হযরত ইমাম আবু হানিফা রাদিআল্লাহু আনহুকে এ কারণে অভিসম্পাত ও অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করে থাকে।

প্রথম পরিচ্ছেদে প্রচলিত ইসলামী আযান এর প্রমাণ এবং ২য় পরিচ্ছেদে এর উপর অভিযোগ ও জবাব দেয়া গেল। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বর্তমান প্রচলিত আযান ও একামতের দলিল

আযান ও একামতের শব্দাবলী দু'বার করে বলাটাই সঠিক। আযান ও

একামতে কোনটাতেই تَرْجِيْع নেই। অর্থাৎ একবার করে কোন তকবীর বলা শরীয়ত সম্মত নয়।

শরীয়ত সম্মত নিয়ম উদ্ধৃত হলো ঃ সর্ব প্রথম اَللّٰهُ اَكْبَرُ চার বার, আর সর্বশেষ শব্দ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ একবার। অবশিষ্ট সকল শব্দ দু'বার করে বলতে হবে। নিম্নে এর দলীলাদি পেশ করা হলো।

হাদীস নং ১ -৬ : আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে খুযাইমা, ইবনে হাব্বান বায়হাকী ও দারু কুতনী সাইয়্যেদেনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন –

اَنَّهُ قَالَ كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْاِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرًا اَنَّهُ يَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ الخ

"তিনি বলেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর যুগে আযান এর শব্দাবলী দু'বার করে প্রচলিত ছিল। আর একামতে একবার করে বলা হতো। তা ছাড়া قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ ও বলা হতো।

এ হাদীস সম্পর্কে ইবনে জুযীর মত সমালোচকও বলেন, هٰذَا اِسْنَادُ صَحِيْحٌ سَعِيْدُ الْمَقْبَرِىُّ وَثَقَّهُ اِبْنُ حَبَّانَ وَغَيْرُهُ (البهارى) অর্থাৎ এ হাদীসের সনদ শুদ্ধ। ছাঈদুল মুকবরী নামক রাবী সম্পর্কে ইবনে হাব্বান মজবুত বলে আখ্যায়িত করেছেন। (বিহারী)

এ হাদীসের আলোকে আযানের মধ্যে যে تَرْجِيْع এর কথা নেই, তা পরিস্কার ভাবে বুঝা গেল। অন্যথায় আযানের শব্দাবলী দু'বার করে না হয়ে চার বার করেই হতো। একামতের মধ্যে একবার করে হওয়ার জবাব 'দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে' পেশ করা হবে।

হাদীস নং ৭ : তিবরানী মু'জাম আওসাত নামক কিতাবে রসূলে করীম এর মুয়াজ্জিন এর নাতী হযরত ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল ইবনে আবদুল মালেক ইবনে আবু মাহ্যুরা হতে বর্ণনা করেন :

قَالَ سَمِعْتُ جَدِّىْ عَبْدَ الْمَالِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ يَقُوْلُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ اَبَامَحْذُوْرَةَ يَقُوْلُ اَلْقٰى عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْاَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اِلٰى اٰخِرِهٖ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ تَرْجِيْعًا–

"তিনি বলেন, আমি আমার দাদাজান আবদুল মালেক ইবনে আবু মাহযুরাকে বলতে শুনেছি তিনি বলতেন, তিনি তাঁর পিতা আবু মাহযুরাকে বলতে শুনেছেন যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এক এক করে প্রতিটি শব্দ শিক্ষা দিয়েছেন اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ হতে শেষ পর্যন্ত। আর আযানে تَرْجِيْع এর কথা বলেননি।

এ হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, নবীজি আযানের মধ্যে ترجيع এর নির্দেশ দেননি। সুতরাং ترجيع সুন্নাতের পরিপন্থী।

হাদীস নং ৮–৯ : ইবনে আবু শায়বা তিরমিযী হযরত ইবনে আবু লায়লা তাবেয়ী হতে কিছু বিভিন্ন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدِ الْاَنْصَارِىْ مُؤَذِّنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ الْاَذَانَ وَالْاِقَامَةَ–

"হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুয়াজ্জিন আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আনছারী আযান এবং তাকবীর দু'বার করে বলতেন।"

এ হাদীসের দ্বারা দু'টি মাসআলা জানা যায়। একটি হলো, আযানের মধ্যে ترجيع নাই। দ্বিতীয়টি হচ্ছে- একামত অর্থাৎ তকবীরের শব্দাবলী দু'বার করেই বলতে হবে, একবার করে নয়।

হাদীস নং ১০ : বায়হাক্বী হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন–

اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ الْاَذَانُ مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْاِقَامَةُ مَثْنٰى مَثْنٰى وَمَرَّ بِرَجُلٍ يُقِيْمُ مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ اِجْعَلْهَا مَثْنٰى مَثْنٰى لَا اُمَّ لَكَ–

"তিনি বলেন, আযান ও দু'বার করে, তকবীর ও দু'বার করে। তিনি (আলী (রাদ্বি.) জনৈক ব্যক্তির নিকট দিয়ে গমন করেন যিনি একামতের তকবীর একবার করে বলতেছিলেন, তখন তিনি (ঐ ব্যক্তি) কে বললেন, একামতের তকবীর দু'বার করে বল।

হাদীস নং ১১ : আবু দাউদ শরীফ হযরত মাআয ইবনে জবল হতে একটি

দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন যায়েদ আনছারীর স্বপ্নের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি আযান সম্পর্কে সে স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে এসে আরয করলেন যে, আমি স্বপ্নে এক ফেরেশতা দেখলাম যিনি ক্বেবলার দিকে ফিরে اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ শেষ পর্যন্ত বললেন এবং কিছুক্ষন পর তকবীরও বললেন। এ হাদীসের সর্বশেষ শব্দাবলী এ রকম ছিল قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِّنْهَا بِلَالًا فَاَذَّنَ بِهَا রাবী বলেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এ আযান হযরত বেলালকে শিখিয়ে দাও। অতঃপর হযরত বেলাল ঐ শব্দাবলী দ্বারাই আযান দিলেন।

এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট হলো যে, স্বপ্নে দেখা ফেরেশতা আযান এর মধ্যে ترحيع এর তা'লীম দেননি, আর ইসলামের সর্ব প্রথম আযানেও ترجيع ছিল না। হযরত বেলাল হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপস্থিতিতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের শেখানো আযান দিয়েছিলেন। আর এটাও স্পষ্ট হলো যে, একামতও আযানের মতই দু'বার করে দিতে হয়। কিন্তু একামতে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ রয়েছে।

হাদীস নং ১২-১৩ : ইবনে আব শায়বা এবং বায়হাক্বী আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা হতে বর্ণনা করেন-

قَالَ حَدَّثَنَا اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ زَيْدِ الْاَنْصَارِىْ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَاَنَّ رَجُلًا قَامَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ اَخْضَرَانِ فَقَامَ عَلٰى حَائِطٍ فَاَذَّنَ مَثْنٰى مَثْنٰى وَاَقَامَ مَثْنٰى مَثْنٰى–

"তিনি বলেন, আমাকে নবীজির অনেক সাহাবায়ে কেরাম সংবাদ দিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ বিন যায়েদ আনছারী হুযূরের খেদমতে হাজির হলেন, এবং আরয করলেন যে, আমি স্বপ্ন যোগে এক ব্যক্তিকে দু'টি সবুজ কাপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। অতঃপর দেখলাম সে দেয়ালের উপর দাঁড়াল এবং আযানের শব্দাবলী দু'বার করে বললো, অনুরূপ একামতের তকবীরও দু'বার করে

বললো।"

লক্ষ্য করার বিষয় যে, আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামকে স্বপ্ন যোগে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে আযানের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ঐ স্বপ্নের আযানে ترجيع ছিল না আর একামতে না একবার করেছিল। বুঝা গেল, হানাফী মাজহাবের আযান ও একামতের তকবীর ওঠাই, যা আল্লাহ তা'য়ালা শিখায়েছেন।

হাদীস নং ১৪-১৬ : দারু কুতনী, আবদুর রাজ্জাক ও ত্বাহাবী শরীফ হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ হতে বর্ণনা করেন-

اَنَّ بِلَالًا كَانَ يُثَنِّى الْاَذَانَ وَيُثَنِّى الْاِقَامَةَ وَكَانَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيْرِ وَيَخْتِمُ بِالتَّكْبِيْرِ-

"অবশ্যই হযরত বেলাল আযান এর শব্দাবলী দু'বার করে বলতেন এবং একামতের তকবীর ও দু'বার করে বলতেন। উভয় আযান ও একামত তকবীর বলে শুরু করতেন এবং তাকবীর বলেই শেষ করতেন।"

হাদীস নং ১৭ : তিবরানী তাঁর কিতাব مسند الشامين তে হযরত জনাদাহ ইবনে আবু উমাইয়া হতে বর্ণনা করেন عَنْ بِلَالٍ اَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْاَذَانَ وَالْاِقَامَةَ سَوَاءً مَثْنٰى مَثْنٰى-

"তিনি হযরত বেলাল হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (বেলাল) আযান ও একামত উভয়ই দু'বার করে বলতেন।"

হাদীস নং ১৮ : দারু কুত্নী হযরত আবু হুজাইফা হতে রেওয়ায়েত করেন-

اِنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُقِيْمُ مَثْنٰى مَثْنٰى-

"হযরত বেলাল নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে আযান ও একামত (এর তাকবীর সমূহ) দু'বার করে বলতেন।"

হাদীস নং ১৯ : তাহাবী হযরত হাম্মদ ইবনে ইবরাহীম হতে বর্ণনা করেন, قَالَ كَانَ ثُوْبَانُ يُؤَذِّنُ مَثْنٰى مَثْنٰى

"হযরত সাওবান আযানের তাকবীর দু'বার করে বলতেন।"

হাদীস নং ২০ : তাহাবী হযরত উবায়দ সালেম ইবনে আকওয়া থেকে

রেওয়ায়েত করেন-

اَنَّ سَلَمَةَ ابْنَ الْاَكْوَعِ كَانَ يُثَنِّى الْاَذَانَ وَالْاِقَامَةَ

"হযরত সালমা ইবনে আকওয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু আযান ও একামত (এর শব্দাবলী) দু'বার করে বলতেন।"

আমরা এ বিশ খানা হাদীস নমুনা হিসেবে পেশ করলাম। এ সম্পর্কে অনেক অধিক হাদীস বর্ণিত আছে। যদি বিস্তারিত কেউ দেখতে চায়, তাহলে طحاوى شريف، صحيح البهارى ইত্যাদি কিতাব গুলো পড়তে পারেন। উপরোক্ত হাদীস সমূহ দ্বারা নিম্নের বিষয়গুলো স্পষ্ট ভাবে জানা যায়।

এক, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সা'লাবা রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর স্বপ্ন যা ইসলামী আযানের মূল ভিত্তি। এতে না ترجيع এর উল্লেখ আছে, না একামত (এর তকবীর) একবার করে বলার কথা উল্লেখ আছে। বরং ঐ আযান ও তাকবীর এর কথা উল্লেখ রয়েছে, যা সাধারণ ভাবে প্রচলিত আছে।

দুই, ফেরেশতাগণ যে আযান শিক্ষা দিয়েছেন, এর মধ্যে ترجيع ও নেই এবং قامت। এর শব্দাবলী একবার করে বলার কথা নেই। ওটাই হচ্ছে আমাদের সকলের আযান।

তিন, হুযূর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্সালাম এর মনোনীত প্রখ্যাত মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল, হযরত সাওবান ও অন্যান্য মুয়াজ্জিনগণ সব সময় ঐ আযান ও একামত বলতেন, যা সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে। অর্থাৎ তা হচ্ছে হানাফী মজহাব সম্মত আযান ও একামত।

চার, পরম শ্রদ্ধেয় সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীন যেমন- হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত সালমা ইবনে আকওয়া, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ, হযরত ইবরাহীম নাখয়ী, হযরত উবায়েদ, হযরত আবু হুজাইফা ও অন্যান্যগণ (রাদ্বিআল্লাহু আনহুম) এ আযানই বলতেন এবং অন্যকেও এ ভাবে আযান ও একামত বলতে নির্দেশ দিতেন, যা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। তাঁরা কেউ ترجيع অথবা একামত একবার করে বলার পক্ষে ছিলেন না।

পাঁচ, হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু যারা একবার করে একামতের তকবীর বলতেন, তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রদর্শন করতেন এবং তৎক্ষনাৎ দু'বার করে বলার নির্দেশ দিতেন। যদি ترجيع অথবা একামত এর শব্দাবলী একবার করে বলা সুন্নাত হতো, তা হলে এ হযরতগণ যারা রসূলে করীম এর মেজাজ সম্পর্কে অবহিত এবং সুন্নাতের একনিষ্ঠ অনুসারী এবং বেদআত থেকে দূরে

থাকতেন, তাঁরা কেন ওগুলো বর্জন করেছেন? আর অন্যকে কেনইবা বিরত রেখেছেন এবং কেনই বা তাদের সমালোচনা করেছেন?

বিবেকও চায় যে, আযানের شهادت শব্দাবলীতে ترجيع না হওয়া। কেননা আযানে মূল বিষয় হচ্ছে নামায এবং ইহকাল ও পরকালের সফলতা অর্জন করা। আযান নামাযের ও আহবানের জন্য নির্ধারিত। অবশিষ্ট তকবীরের শব্দাবলী শাহাদাত ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড বরকত অর্জন অথবা সূচনা অথবা নামাযের প্রতি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য। যখন নামায এবং ফালাহ বা সফলতা অর্জন কাজে পূনরাবৃত্তি ও ترجيع নেই যা হচ্ছে আযানের মূল বিষয়। তাহলে ঐ শব্দাবলীতে ও ترجيع না হওয়াই বাঞ্চনীয়, যা তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় মাত্র।

দ্বিতীয়ত : আযানের উদ্দেশ্য হলো, সকল মুসলমানকে নামাযের প্রতি আহবান করা। তাই আযান উচুঁ স্থানে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে দিতে হয়। কানে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করে আযান দিতে হয়, যেন কণ্ঠধ্বনি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এখন দু'শাহাদতের শব্দাবলী প্রথম নিম্নস্বরে বলা আযানের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুতরাং আযানের প্রতিটি শব্দ উচ্চ কণ্ঠেই বলতে হবে। লক্ষ্য করুন! আযান আরম্ভকালে তাকবীর الله اكبر চার বার বলা হয়। কিন্তু চার বারেই খুব উচ্চ কণ্ঠে বলতে হয়। আর শাহাদাত এর শব্দাবলীও যদি চার বার হতো, তাহলে প্রতিবারই উচ্চস্বরে দিতে হতো।

তৃতীয়ত : একামত, আযানের অনুরূপ। কোন কোন হাদীসে একামতকে আযান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, بَيْنَ الْاَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ অর্থাৎ প্রত্যেক দু'আজানের মাঝেই নামাযের অবস্থান। অর্থাৎ আযান ও একামতের মাঝে। তবে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান শুধু قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বলা। এটা একামতে আছে, আযানে নেই। তাই, একামতের শব্দাবলী ও আযানের মতই দু'বার করে বলাই উচিত।

চতুর্থত : আযানে কোন কোন শব্দ বার বার এসে থাকে। শুরুতে এবং শেষাংশেও। যেমন তাকবীর ও কলেমা। আবার কোন কোন শব্দ বার বার আসেনা। যেমন صلوة ও فلاح যে শব্দগুলো বার বার এসে থাকে, সেগুলো প্রথম বার দ্বিগুণ, দ্বিতীয়বার উহার অর্ধেক। 'আল্লাহু আকবর' প্রথম চারবার, শেষাংশে তাকবীর দু'বার রয়েছে। তাওহীদ শাহাদত প্রথম দু'বার করে আর শেষাংশে একবার করে বলতে হয়। তাহলে একামতেও এমনটি হওয়াই

বাঞ্চনীয়। অতএব, হানাফী মাজহাব অনুযায়ী যে আযান ও একামত সকল মুসলমানের মধ্যে প্রচলিত, তা সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও সুন্নত মোতাবেক। এ মাজহাবের অনর্থক সমালোচনা ও গালমন্দ করা চরম মূর্খতা ও অজ্ঞতা ছাড়া আর কি হতে পারে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলার উপর আপত্তি ও জবাব

হানাফী মাজহাব সম্মত আযান ও একামত সম্পর্কে এ যাবত মাজহাব বিরোধী ওহাবীরা যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করেছে, যা আমরা অবগত হয়েছি সবগুলো আপত্তি জবাব সহ পেশ করছি। যদি ভবিষ্যতে আরও নিত্যনতুন তাদের কোন আপত্তি আমাদের গোচরীভূত হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় এডিশনে ঐ গুলোর যথাযথ জবাবও পেশ করা হবে।

আপত্তি নং ১ : মুসলিম শরীফ হযরত আবু মাহ্যুরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে সম্পূর্ণ আযান এর হাদীস নকল করেছেন যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং নিজে তাঁকে আযান শিক্ষা দিয়েছেন। সে গুলোর কিছু শব্দ হচ্ছে–

ثُمَّ تَعُوْدُ فَتَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ- اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ- اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ- اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ-

অর্থাৎ দুই শাহাদতের পর পূনরায় বলো। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, স্বয়ং হুযূর পুরনূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত আবু মাহ্যূরাকে আযানের শাহাদাত শব্দগুলোতে ترجيع শিখায়েছেন। সুতরাং আযানে তারজী সুন্নত প্রমানিত হলো।

জবাব : এ আপত্তির কয়েকটি জবাব রয়েছে। এক, হযরত আবু মাহ্যুরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বর্ণনা সমূহ পরস্পর বিরোধী। এ হাদীসে তিনি ترجيع এর উল্লেখ করেছেন। আর তাঁরই যে বর্ণনা আমরা প্রথম অনুচ্ছেদে তিবরানী এর সূত্রে ইতিপূর্বে পেশ করেছি, উহাতে ترجيع এর কোন আলোচনাই নেই। তাহাবী শরীফ আবু মাহ্যুরাহ হতে যে হাদীস নকল করেছেন এতে আযানের শুরুতে চারবার এর স্থলে দু'বার করে তাকবীর বলার আলোচনা রয়েছে। অতএব, আবু মাহ্যুরাহ এর বর্ণনা পরস্পর বিরোধী হওয়ার কারণে বিধান

মোতাবেক আমল যোগ্য নয়। **দুই,** হযরত আবু মাহযুরাহ এর এ ترجيع (তারজী) বিশিষ্ট হাদীস পূর্বে উল্লেখিত সমস্ত মশহুর হাদীস সমূহের বিপরীত, যা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে পেশ করেছি, যার মধ্যে ترجيع এর কোন আলোচনাই নেই। এমতাবস্থায় মশহুর হাদীস সমূহই আমল যোগ্য। **তিন,** হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মনোনীত প্রখ্যাত মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল এবং হযরত সাওবান রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে ও পরে আযানের মধ্যে কখনও ترجيع করেন নি। অতএব, তাঁদের আমলই অত্যাধিক গ্রহনযোগ্য। **চার,** এ হাদীসে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম আবু মাহযুরাহ কে বর্জন করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরামের আমলে তারজী ছিলনা বরং তারজী এর বিপরীত ছিল। এ কারণে উহাই বেশী শক্তিশালী। পাঁচ, আবু মাহযুরা এর এ হাদীস শরয়ী কেয়াস এর পরিপন্থী। আর আমাদের উপস্থাপিত হাদীস সমূহ কেয়াস মোতাবেক বিধায় একান্ত আমলযোগ্য। আর আবু মাহযুরাহ এর এ হাদীস বিধান মোতাবেক আমলযোগ্য নয়। ছয়,এর জবাব هدايه এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ عنايه এ ভাবে দিয়েছে যে, সয়্যিদেনা আবু মাহযুরাহ ইসলাম গ্রহন করার পূর্বে তাওহীদ ও রেসালতের প্রতি তাঁর অত্যন্ত ঘৃণা ছিল। আর নবীজির বিরুদ্ধাচারণে সদা প্রস্তুত থাকতেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন আর নবীজি তাঁকেও আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তখন তিনি লজ্জাবশতঃ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এবং أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ নিচু স্বরে বললেন, উচ্চকণ্ঠে বলেননি। তাই হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পূনরায় উচ্চকণ্ঠে আযানের শব্দাবলী বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। তা'লীম দেয়ার জন্য এবং তাঁর লজ্জা শরম দূর করার জন্যই ঐ সময় দ্বিতীয় বার পূনরাবৃত্তির নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। অতএব, এ বিধানটি ছিল বিশেষ কারনবশতঃ। যেমন, বর্তমানেও যদি কোন ব্যক্তি নিম্নস্বরে আযান দেয় তাহলে পূনরায় উচ্চকণ্ঠে আযান দেয়ার জন্য বলা হয়ে থাকে। এ অবস্থায় আবু মাহযুরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর এ হাদীস আমাদের প্রথম পরিচ্ছেদে উপস্থাপিত হাদীস সমূহের খেলাফ নয়। সাত, فَتْحُ الْقَدِيْر গ্রন্থকার এ হাদীস এর জবাব এই ভাবে দিয়েছেন যে, হযরত আবু মাহযুরাহ উভয় শাহাদত বাক্য مد ছাড়া না টেনে পড়েছিলেন। এ জন্য পূনরায় টেনে পড়ানো হয়েছে। যে কোন অবস্থায় ترجيع (তারজী) একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ছিল। ইসলামী সুন্নত হিসেবে নয়।

আপত্তি নং ২ : আবু দাঊদ, নাসাঈ ও দারেমী হযরত আবু মাহযুরাহ হতে বর্ণনা করেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَّالْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً

"নিঃসন্দেহে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে আযান ঊনিশ শব্দ এবং একামতের তাকবীর সতের শব্দ শিক্ষা দিয়েছেন।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আযানে মোট ঊনিশ শব্দ রয়েছে। আর এ সংখ্যা ترجيع করার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। যদি আযানে ترجيع না করা হয় তাহলে সর্ব মোট পনের শব্দ হয়। অতএব আযানে ترجيع করা বাঞ্চনীয়।

জবাব : এ আপত্তির কয়েকটি জবাব রয়েছে। (১) এ হাদীস খানা আপনাদেরও প্রতিকূলে। কেননা যদি এ হাদীস দ্বারা আযানে ترجيع প্রমাণিত হয়, তাহলে এ হাদীস দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, একামতের শব্দাবলী দু'বার করে। যদি তোমাদের মতে শব্দাবলী একবার করে হতো তাহলে এটার শব্দ গুলো সতের এর পরিবর্তে 'তের' হতো। তাহলে কি তোমরা হাদীসের অর্ধেক অংশের প্রতি বিশ্বাস করতেছ আর অর্ধাংশকে অস্বীকার করছ। আযানে ترجيع সম্পর্ক সার্বিক জবাব ১ নং আপত্তির অধীনে দেয়া হয়েছে। আর তা হলো, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত আবূ মাহযুরাহ কে ترجيع এর ব্যাপারে একটি বিশেষ কারণে তা'লীম দিয়ে ছিলেন . ইত্যাদি।

আপত্তি নং ৩ : মুসলিম ও বুখারী হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন,

قَالَ ذَكَرُو النَّارَ وَالنَّاقُوْسَ فَذَكَرُو الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى فَاُمِرَ بِلَالٌ اَنْ شَيْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ

"তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম আযানের আহবানের নিমিত্ত্বে আগুন এবং শঙ্খ বাজানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তখন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ব্যাপারেও তারা আলোচনা করেছিলেন যে, তারাও এ গুলো দিয়ে তাদের ইবাদতের আহবান করে থাকে। তখন হযরত বেলালকে নির্দেশ দেয়া হলো যে, আযান এর শব্দ গুলো দু'বার করে আর একামতের শব্দগুলো একবার করে বলতে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, একামতের শব্দাবলী একবার করে বলতে হবে।

জবাব : এর কয়েকটি জবাব আছে, (১) এ হাদীস আপনাদের ও প্রতিকূলে, কেননা এর দ্বারা বুঝা যায় যে, একামতের সকল শব্দ একবার করেই হবে। অথচ আপনারা বলছেন, প্রথমত: একামতে তাকবীর চার বার হবে। قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ।দু'বার। সুতরাং যে জবাব আপনারা দিয়েছেন,তা আমাদেরও। যদি আপনারা বলেন যে, ২য় হাদীসে قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ। দু'বার বলার বিধান রয়েছে। তাহলে হানাফীগণ বলবেন, হাদীসসমূহে এটা ও আছে যে, একামতে সকল শব্দ দু'বার করে বলতে হবে। আর ঐ হাদীসসমূহ কেন গ্রহণযোগ্য হবে না?

(২) এ হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ এর স্বপ্নের কোন উল্লেখ নেই। বরং বলা হয়েছে যে, যখন ছাহাবাগণ আগুন অথবা শব্দ এর দ্বারা নামাযের ঘোষণা বিষয়ে পরামর্শ করেছিলেন এবং কোন কোন সাহাবা বলেছেন যে, এতে ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। ইসলামী ঘোষণা তাদের বিপরীত হওয়া বাঞ্চনীয়। তখন তৎক্ষনাৎ হযরত বেলালকে আযান ও একামত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তবে ঐ আযান ও একামত দ্বারা বর্তমানে প্রচলিত শরীয়ত সম্মত আযান নয়। বরং আভিধানিক আযান অর্থাৎ নামাযের আহবান জানানকেই বুঝানো হয়েছে। যা বিভিন্ন মহল্লায় ঘুরে ঘুরে করা হয়। আর একামত বলতে জামাতের সময় মসজিদের বিক্ষিপ্ত মুসল্লিগণকে একত্রিত করাকে বুঝানো হয়েছে এ মর্মে যে, এখন জামাত শুরু হচ্ছে আপনারা জামাতে অংশগ্রহণ করুন। যেহেতু এ ধরনের আহবান কেবলমাত্র একবারই যথেষ্ট ছিল বিধায় একবার এর কথা উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাদ্বি.) এর স্বপ্নের ঘটনা ঘটেছিল। যদ্বারা প্রচলিত আযান ও একামত প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং ইতিপূর্বেকার বিভিন্ন পর্যায়ের আহবান ছেড়ে দেয়া হয়েছে। (৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদকে স্বপ্নে ফেরেশতাগণ যে আযান ও একামত শেখায়েছেন উহাতে আযান ও একামতের শব্দগুলো দু'বার করে ছিল। আর ঐ স্বপ্নই হচ্ছে আযান ও একামতের মূল ভিত্তি। তাই ঐ রেওয়ায়েতটিই আমল যোগ্য। অন্যান্য রেওয়ায়েত সমূহ যা এ রেওয়ায়েতের বিপরীত সেগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষন অত্যাবশ্যক অথবা সে গুলো আমল যোগ্য নয়। উল্লেখ্য, এ স্বপ্ন শুধু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদই দেখেছেন, তা নয় বরং তিনি ছাড়া আরও সাতজন সাহাবা অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছেন। যদ্দারা এ হাদীস মুতাওয়াতির হাদীসের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। (৪) বিভিন্ন রেওয়ায়েত এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত বেলাল এবং হযরত ইবনে উম্মে মকতুম তাদের ইন্তিকাল পর্যন্ত আযানে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

تـرجيـع তারজী করেননি। দেখুন! মিশকাত এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মিরকাত'।

তাহলে এটা কি করে হতে পারে যে, হযরত বেলাল এর মত বিখ্যাত মুয়াজ্জিন এবং হযরত ইবনে উম্মে মকতুম যাদের সারা জীবনে আযানে تـرجيـع করেননি এবং একামতের তকবীরের শব্দগুলো একবার করে বলেননি। অথচ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদেরকে ঐ কাজগুলো করার নির্দেশ দিয়েছেন।

অতএব, تـرجـيـع ও অন্যান্য সবগুলো রেওয়ায়েতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক। (৫) এ সমস্ত রেওয়ায়েত শরীয়ত সম্মত قِيَاس এরও বিপরীত। আর আমাদের উপস্থাপিত সব গুলো রেওয়ায়েত কেয়াস এর সাথে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। তাই, এ রেওয়ায়েত গুলোই প্রাধান্য পাবে। যখন হাদীস সমূহে পরস্পর দন্ধ হয় তখন قِيَاس এর দ্বারাই প্রাধান্য দেয়া হয়।

লক্ষ্য করুন! হযরত আবু হোরায়রা (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, اَلْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ। অর্থাৎ আগুন দিয়ে রান্না করা বস্তু ব্যবহার করলে অজু করা ওয়াজেব।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গোশ্ত ভক্ষন করে অজু না করেই নামায আদায় করেছেন। এ হাদীস সমূহে পরস্পর দ্বন্দ্ব হওয়ায় قِيَاس এর মাধ্যমে এক হাদীসকে অন্য হাদীস এর উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এখন আর কেউ বলে না, খাদ্য ভক্ষণ করলে অজু নষ্ট হয়ে যায়। ইহাই সার্বজনীন বিধান।

www.AmarIslam.com

একবিংশ অধ্যায়

নফল নামায আদায়কারীর পেছনে ফরজ নামায আদায় করা

শরীয়তের মাসয়ালা এই যে, নফল নামায আদায়কারীর পেছনে ফরজ নামায আদায় করা যায় না। তবে, ফরজ নামায আদায়কারীর পেছনে নফল নামায আদায় করা বৈধ। ফরজ নামাযের ব্যাপারে ইমামও ফরজ নামায আদায়কারী হওয়া অত্যাবশ্যক। ইহাও অত্যাবশ্যক যে, ইমাম এবং মুক্তাদী উভয়ই একই নামায আদায়কারী হতে হবে। জোহরের নামায আদায়কারী আছরের নামায আদায়কারীর পেছনে পড়তে পারেনা। কিন্তু মাজহাব বিরোধী ওহাবীরা বলে যে, ফরজ নামায নফল আদয়কারীর পেছনে পড়া জায়েয।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : বালেগ কোন মুসলমানের নামায নাবালেগ ছেলের পেছনে বৈধ নয়। সেটা ফরজ হোক বা তারাবীহ বা নফল হোক। কেননা নাবালেগের উপর নামায ফরজ নয়, কেবল মাত্র নফল হয়ে থাকে। নাবালেগ নফল নামায পড়া আরম্ভ করলেও তা তার উপর নফলই থাকবে। নাবালেগ যদি নফল নামায আরম্ভ করে ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে সে নামায ক্বাজা করাও জরুরী নয়। কিন্তু বালেগের বেলায় তা ক্বাজা করা জরুরী।

এ জন্য নাবালেগের পেছনে কোন বালেগ ব্যক্তি কোন নামায পড়তে পারে না। কিন্তু মাজহাব বিরোধী ওহাবীদের মতে এ সমস্ত কিছু জায়েয। এ কারণে আমি এ অধ্যায়ের মধ্যে দু'টি পরিচ্ছেদ করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে এ মাসয়ালাটির পক্ষে প্রমান আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তি সমূহ জবাব সহ উল্লেখ করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নফল নমায আদায়কারীর পেছনে ফরজ আদায়কারীর নামাজ জায়েয নয়। ফরজ নামায নফল আদায়কারীর পেছনে আদায় হয় না। এ সম্পর্কে বহু হাদীস শরীফ এবং শরয়ী কেয়াসই জলন্ত সাক্ষী। তম্মধ্য হতে কয়েকটি পেশ করা হলো -

হাদীস নং- ১-৪ : তিরমিযী, আহমদ, আবু দাউদ, শাফেয়ী, মিশকাত 'আযান' অধ্যায়ে হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمِنٌ اَللّٰهُمَّ اَرْشِدِ الْاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ-

অর্থাৎ : তিনি বলেন, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ইমাম হচ্ছে জিম্মাদার আর মুয়াজ্জিন হচ্ছে আমানতদার। হে আল্লাহ! ইমামগণকে হেদায়েত করুন এবং মুয়াজ্জিনদেরকে ক্ষমা করুন।

এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, ইমাম সাহেব সকল মুক্তাদীর নামাযসমূহ নিজ জিম্মায় নিয়ে থাকেন। প্রকাশ থাকে যে, শ্রেষ্ঠতম বস্তু নিম্নতর বস্তুকে নিজ জিম্মায় নিতে পারে, ফরজ নফলকে নিজ জিম্মায় নিতে পারে, কেননা ফরজ নফল থেকে শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু নফল ফরজকে নিজ জিম্মায় নিতে পারেনা। কেননা নিম্নতর কোন বস্তু শ্রেষ্ঠতম বস্তুকে নিজ জিম্মায় রাখতে পারেনা। এ কারণে যে, তা ফরজ থেকে নিম্নতর ইবাদত। তেমনি ভাবে প্রত্যেক ফরজ নামায উহার সমতুল্য ফরজকে নিজ জিম্মায় নিতে পারে। অন্য ফরজকে নয়। অতএব, যদি ইমাম আছরের নামায আদায় করছেন, তাহলে তাঁর পেছনে জোহরের ক্বাজা পড়া যাবে না। সুতরাং আছরের নামায জোহরকে স্বীয় অধীনে রাখতে পারে না। কেননা উভয় নামায সম্পূর্ণ আলাদা।

হাদীস নং ৫ : ইমাম আহমদ হযরত সুলাইম সালমা থেকে রেওয়ায়েত করেন-

إِنَّهُ اَتَي النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ ابْنَ مُعَاذَ ابْنَ جَبَلٍ يَاتِيْنَا بَعْدَ مَا نَنَامُ وَ نَكُوْنُ فِيْ اَعْمَالِنَا بِالنَّهَارِ فَيُنَادِيْ بِالصَّلٰوةِ فَنَخْرُجُ اِلَيْهِ فَيُطَوِّلُ عَلَيْنَا فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا مُعَاذُ لَاتَكُنْ فَتَّانًا اِمَّا اَنْ تُصَلِّيَ مَعِيَ وَ اِمَّا اَنْ تُخَفِّفَ عَلَي قَوْمِكَ.

হযরত সুলাইম একদা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন ইয়া রছুলাল্লাহ্! হযরত মায়াজ ইবনে জবল আমরা শুয়ে যাওয়ার পর তিনি আমাদের কাছে এসে থাকেন। আমরাতো দিনের বেলায় নিজ কাজ-কারবার নিয়ে ব্যস্ত থাকি। অতঃপর তিনি নামাযের আযান দেন। আমরা বের হয়ে তাঁর কাছে এসে থাকি। তিনি নামায দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত পড়ান। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, হে মা'য়ায, তুমি ফেৎনা সৃষ্টিকারী হয়ো না। তুমি আমার সাথে

নামায পড়ে নেবে, নতুবা নিজ লোকদেরকে নিয়ে হালকা নামায পড়বে।

উল্লেখ্য যে, হযরত মায়ায ইবনে জবল এশা'র নামায হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পেছনে আদায় পূর্বক নিজের এলাকার লোকদের নিকট গিয়ে তাদেরকে নামায দীর্ঘক্ষণ পড়াতেন। যে সম্পর্কে নবীজির দরবারে অভিযোগ আকারে পেশ করা হয়েছিল। সেই ঘটনাটি এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

বুঝা গেল, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত মা'য়াযকে এভাবে নামায পড়ানোর অনুমতি দেননি। অর্থাৎ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পেছনে এশা'র নামায পড়ে পূনরায় নিজ এলাকার মানুষদেরকে এশার নামায পড়ানোর অনুমতি তিনি দেননি। কেননা নফল আদায়কারীর পেছনে ফরজ আদায় করা জায়েয নেই। বরং নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মা'য়াযকে বলেছেন যে, তুমি আমার পেছনে নামায আদায় করলে পূনরায় তোমার লোকদেরকে নামায পড়াবেনা। অথবা তুমি তোমার লোকদেরকে নামায পড়ালে আমার পেছনে নামায পড়বেনা।

হাদীস নং ৬ ঃ ইমাম আজম আবু হানীফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত হাম্মাদ হতে তিনি হযরত ইব্রাহীম নাখয়ী থেকে রেওয়ায়েত করেন,

قَالَ اِذَا دَخَلْتَ فِيْ صَلٰوةِ الْقَوْمِ وَاَنْتَ لَاتَنْوِيْ صَلٰوتَهُمْ لَاتُجْزِيْكَ وَاِنْ صَلَّى الْاِمَامُ صَلٰوتَهُ وَنَوَى الَّذِيْ خَلْفَهُ غَيْرَهَا اَجْزَاَتِ الْإِمَامَ وَلَمْ تُجْزِهِمْ - رَوَاهُ الْاِمَامُ مُحَمَّدٌ فِي الْاٰثَارِ-

তিনি বলেন, যখন তুমি লোক জনের নামাযের মধ্যে শামিল হবে আর তুমি তাদের নামাযের নিয়ত যদি না কর,তাহলে এ নামায তোমার জন্য যথেষ্ট হবে না। আর যদি ইমাম এক নামায পড়ে আর পেছনের মুক্তাদীগণ অন্য নামাযের নিয়ত করে থাকে, এমতাবস্থায় ইমামের নামায আদায় হবে। কিন্তু মুক্তাদীদের নামায হবে না।

এর দ্বারা প্রতীয়মাণ হলো যে, ওলামায়ে মিল্লাতের ও অভিমত হচ্ছে যে, নফল নামায আদায়কারীর পেছনে ফরজ নামায আদায় করা যাবে না। তেমনি ভাবে এক ফরজ নামায আদায়কারীর পেছনে অন্য ওয়াক্তের ফরজ নামায আদায় হতে পারেনা।

বিবেকও চায় যে, নফল আদায়কারীর পেছনে ফরজ আদায় না হওয়া।

www.AmarIslam.com

কেননা ইমাম হচ্ছেন পেশওয়া বা অনুকরনীয়। মুক্তাদী তাঁর অনুকরণকারী। ইমামের নামায হচ্ছে আসল বা মূল। মুক্তাদীর নামায তার প্রশাখা মাত্র। এ জন্যে ইমামের ভুলের কারণে মুক্তাদীর উপরও সহু সাজদা ওয়াজেব হয়ে যায়। কিন্তু মুক্তাদীর ভুলের কারনে, না ইমামের উপর সহু সাজদা ওয়াজিব, না স্বয়ং মুক্তাদীর উপর অর্থাৎ কারো উপর সাহু সাজদা ওয়াজেব হবে না, ইমামের ক্বেরাত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট। কিন্তু মুক্তাদীর ক্বেরাত ইমামের জন্য যথেষ্ট নয়। ইমাম অজু না করে যদি নামায পড়ান, তাহলে মুক্তাদীর নামাযও হবে না। কিন্তু মুক্তাদী অযূ ছাড়া নামায আদায় করলে ইমামের নামায হবে। ইমাম সাজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে মুক্তাদীর উপর তেলাওয়াতের সাজদা ওয়াজিব হবে; মুক্তাদী তেলাওয়াত শ্রবন করুক বা না করুক। কিন্তু মুক্তাদী ইমামের পেছনে সাজদাহ এর আয়াত তেলাওয়াত করলে কারোও উপরই তেলাওয়াতের সাজদাহ ওয়াজিব হবে না। যদি ইমাম মুকীম হন আর মুক্তাদী মুসাফির হয়, তাহলে মুক্তাদীকে সম্পূর্ণ নামাযই পড়তে হবে। কিন্তু ইমাম মুসাফির হলে আর মুক্তাদী যদি মুকীম হয়, তাহলে ইমাম পূরা নামায পড়বেনা বরং কছর পড়বে। এ ধরনের এমন অনেক মাসয়ালা আছে, যদ্বারা জানা যায় যে, মুক্তাদী এবং তার নামায অনুকরণকারী আর ইমাম এবং ইমামের নামায মূল এবং অনুকরনীয়। অনুকরণীয় অনুকরণকারীর বরাবর হবে অথবা উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন হবে। আর নফল নামাযের মর্যাদা ফরজ নামায থেকে কম। নফল নামায আদায়কারীর পেছনে ফরজ নামায আদায় না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। যাতে করে উঁচু মানসম্পন্ন ইবাদত নিম্ন মানসম্পন্ন ইবাদতের অনুকরণকারী হয়ে না যায়। এমনি ভাবে এক ফরজ অন্য এক ফরজের পেছনে হতে পারেনা। কেননা এক শ্রেনী অন্য একশ্রেনীর অনুকরণকারী হতে পারে না। যে ভাবে ঈদের নামায আদায়কারী ইমামের পেছনে ফজরের নামায আদায় হয়না। মাগরিবের ইমামের পেছনে বিতরের নামাযও আদায় শুদ্ধ হতে পারে না। তেমনি ভাবে জোহর আদায়কারীর পেছনে এশার কা'যা নামাযও আদায় হয়না। অতএব, হয়তো ইমাম ও মুক্তাদীর একই নামায হওয়া আবশ্যক অথবা মুক্তাদীর নামায ইমামের নামায হতে নিম্নমর্যাদার হতে হবে অর্থাৎ ইমাম ফরজ নামায আদায়কারী হতে হবে এবং মুক্তাদী নফল আদায়করী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসয়ালার বিপক্ষে আপত্তি ও জবাব

আমরা এ মাসয়ালার উপর মযহাব বিরোধী ওহাবীদের পক্ষ হতে বিভিন্ন

www.AmarIslam.com

যে, হযরত মা'য়ায এর এ ইজতিহাদ সুন্নতে নববীর পরিপন্থী হওয়ায় আমল যোগ্য নয়।

আপত্তি নং ৩ : বায়হাক্বী ও বুখারী হযরত জাবের হতে হযরত মা'য়ায এর এ ঘটনা রেওয়ায়েত করেনে-

قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى قَوْمِهٖ فَيُصَلِّى بِهِمُ الْعِشَاءَ وَهِىَ لَهٗ نَافِلَةٌ–

অর্থাৎ : তিনি বলেন, হযরত মু'য়ায হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে এশার নামায পড়ে নিতেন,অতঃপর নিজ কওমের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে এশার নামায পড়াতেন। এ নামায তাঁর জন্য নফল হিসেবে ছিল।

এ হাদীসের দ্বারা স্পষ্ট ভাবে জানা গেল যে, হযরত মা'য়ায ইবনে জবল হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে নফল পড়তেন না বরং ফরজই পড়তেন আর তিনি মুক্তাদীদেরকে নিয়ে নফল আদায় করতেন। সুতরাং এটা বলা যাবে না যে, তিনি হুযূরের পেছনে নফল আর মুক্তাদীকে নিয়ে ফরজ পড়তেন।

জবাব : এই হাদীস হযরত জাবের (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত মা'য়ায এর এ ঘটনা নিজ ধারণা মোতাবেক বলেছেন যে, হুযূর এর সাথে ফরজ পড়তেন। এতে এ কথা উল্লেখ নেই যে, হযরত মু'য়ায নিজ নিয়ত ও ইচ্ছা সম্পর্কে বলে দিয়েছেন। অন্যজনের নিয়ত বা ইচ্ছা সম্পর্কে তাঁর থেকে জিজ্ঞাসা ব্যতিত দৃঢ়ভাবে বলা যেতে পারে না। আর এ হাদীসে এ কথাও উল্লেখ করা হয়নি যে, তাঁকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহার অনুমতি দিয়েছেন। অতএব, এ হাদীস কোন ভাবেই আপনার দলীল হতে পারে না।

আপত্তি নং ৪: বোখারী শরীফে হযরত আমর ইবনে সালমা (রাদ্বি.) থেকে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে, যেটাতে তিনি বলেছেন- আমাদের গোত্র একটি বন্দরে অবস্থান করত, যেখান থেকে কাফেলা এদিক সেদিক যাতায়াত করত। আমি হিযাযী কাফেলাদের কাছে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিষয় এবং কোরআনী আয়াত জিজ্ঞাসা করতাম। মক্কা বিজয়ের পর আমার আব্বাজান মদীনা মুওয়ারাহ গিয়ে স্বীয় গোত্রের পক্ষ থেকে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নামাযে আহকাম জেনে নেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উনাকে বলে দিলেন যে, আযান যেকেউ দিয়ে দিবে,তবে. নামায সেই পড়াবে,

যার কোরআন শরীফ বেশী স্মরণ আছে। তিনি ফিরে এসে যাছাই করে দেখলেন যে, কোরআন করীম সবচেয়ে বেশী স্বরণ আছে আমার। তাই আমাকেই ইমাম নিয়োজিত করলেন। তখন আমার বয়স হয়েছিল মাত্র ছয় বছর। আমি আমার গোত্রের লোকদেরকে নামায পড়াতাম। হাদীসের শেষ অংশটি নিম্নরূপ:

فَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ قَلَصَتْ عَنِّي فَقَالَتْ اِمْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ اَلَاتُغَطُّوْنَ عَنَّا إِسْتَ قَارِيْكُمْ فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوْا لِي قَمِيْصًا

আমার শরীরে একটি চাদর থাকত। যখন সিজদায় যেতাম, সেটা খোলে যেত। গোত্রের এক মহিলা তা দেখে বললো- আপনাদের ক্বারী সাহেব (ইমাম) সতর কেন ঢাকেনা? তখন গোত্রের লোকেরা কাপড় খরিদ করে আমাকে কোর্তা সেলাই করে দিল।

দেখুন, আমর ইবনে সালমা হলেন একজন সাহাবী, অন্যান্য সাহাবীগণ তাঁর পিছনে ফরয নামায পড়েছেন। অথচ তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ছয় বছর এবং তাঁর উপর নামায ফরয ছিলনা। তাছাড়া শিশুদের নফলও খুবই নিম্ন স্তরের হয়ে থাকে। কিন্তু যুবক -বৃদ্ধ সবাই তাঁর পিছনে ফরয আদায় করতেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, নফল আদায়কারীর পিছনের ফরয আদায় হয়ে যায়।

জবাব : এ আপত্তির জবাব তুই, যা দুই নং আপত্তির জবাবে দেয়া হয়েছে। উনাদের এই আমাল হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশানুসারে ছিলনা; তাদের নিজস্ব রায় অনুসারে ছিল। তাঁরা সবে মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, শরীআতের আহকাম সম্পর্কে পুরাপুরি ওয়াকেফহাল ছিলেন না, অজান্তে এরকম করেছিলেন। তাঁরা যদি এ হাদীস থেকে অপ্রাপ্ত বয়স্কের ইমামতি প্রমান করতে চায়, তাহলে এটাও মেনে নিক যে, উলঙ্গ ইমামের পিছনে নামায জায়েয। কেননা হযরত আমর ইবনে সালমা নিজেই বলেন যে আমার কাপড় এতই ছোট ছিল যে, সিজাদায় গেলে সতর খুলে যেত এবং এ অবস্থায় তিনি নামায পড়াতেন। আফসোস! ওরা চোখ বন্দ করে হাদীস পড়ে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল, এ বিষয়ে ওদের কাছে কোন সুস্পষ্ট মারফু হাদীস নেই। নিছক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে এর পিছনে পড়ে রয়েছে এবং ইমাম আযম আবু হানিফা (রাদ্বি.) এর বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে এবং ওনার শানে অনর্থক যা-তা বলছে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

রক্ত ও বমির দ্বারা অযু ভেঙ্গে যায়

শরীয়তের মাসআলা হলো, আটটি কারণে অযূ ভেঙ্গে যায়- (১) পেশাব, পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু নির্গত হওয়া (২) ঘুমানো (৩) অজ্ঞান হওয়া (৪) নেশাগ্রস্ত মাতাল হওয়া (৫) মস্তিষ্ক বিকৃতি হওয়া (৬) নামাযে অট্টহাসি দেয়া (৭) রক্ত প্রবাহিত হওয়া ও (৮) মুখ ভরে বমি করা। এর বিস্তারিত বিবরণ ফিক্হের কিতাবগুলোতে দেখুন।

কিন্তু লা-মাযহাবী ওহাবীদের মতে প্রবাহমান রক্ত ও মুখ ভর্তি বমি অযূ নষ্ট করতে পারে না। এ জন্য কোন হানাফী মাযহাবের অনুসারী ওহাবীদের পিছে নামায পড়তে পারে না। কারণ এ লোকগুলোর আক্বীদাও খারাপ আবার তাদের অযুও বিবেচ্য নয়। যেহেতু লা-মাযহাবী সম্প্রদায় এ মাসআলার ব্যাপারেও খুব চিৎকার চেঁচামেচি করে, তাই আমরা এ অধ্যায়কে ও দু' পরিচ্ছেদে ভাগ করছি। প্রথম পরিচ্ছেদে এ মাসআলার প্রমাণ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এর উপর উত্থাপিত আপত্তি ও জবাবসমূহ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা কবূল করুন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বমি ও প্রবাহমান রক্তে অযু ভেঙ্গে যায়

হানাফীদের মতে মুখ ভর্তি বমি এবং শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে তা শরীরের উপরিভাগ দিয়ে প্রবাহিত হলে অযু নষ্ট হয়। শরীরের উপরিভাগ হচ্ছে তাই, যা গোসলের সময় ধৌত করা ফরয। দলীল সমূহ লক্ষ্য করুন-

হাদীস নং ১ : দারু কুতনী হযরত তামীম দারী (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوَضُوْءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ-

"তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, 'প্রত্যেক প্রবাহমান রক্তের কারণে অযু ফরয হয়।'

হাদীস নং ২ : ইবনে মাজাহ হযরত আয়িশা সিদ্দীকাহ (রাদ্বি.) থেকে

বর্ণনা করেন-

قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَصَابَهُ قَيْءٌ اَوْرُعَافٌ اَوْقَلْسٌ اَوْمَذِيٌ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ-

'তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যদি কারো বমি, নাক দিয়ে রক্ত অথবা মযী বের হয়, তাহলে সে নামায ছেড়ে দিবে এবং পূনরায় অযু করবে।

হাদীস নং ৩ : ইবনে মাজাহ হযরত আয়িশা সিদ্দীকাহ (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেছেন- এক দিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে ফাতিমা বিনত আবী জায়শ উপস্থিত হয়ে আরয করলো, আমার ইস্তিহাযার রক্ত (হায়যের নির্দিষ্ট সময় তথা তিন দিনের কম এবং দশ দিনের বেশী রক্ত প্রবাহিত হওয়াকে ইস্তিহাজা বলে - অনুবাদক) এত বেশী প্রবাহিত হয় যে, আমি কখনো পবিত্র হইনা। এমতাবস্থায় আমি কি নামায ছেড়ে দেবো? নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এটা হায়য নয়- রগ থেকে নির্গত হওয়া এক প্রকার রক্ত। সুতরাং

اِجْتَنِبِى الصَّلٰوةَ اَيَّامَ حَيْضِكِ ثُمَّ اِغْتَسِلِىْ وَتَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَاِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ-

"তুমি হায়য অবস্থায় নামায পরিত্যাগ করবে। অতপর তুমি গোসল করবে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করবে যদিও রক্ত চাটাইর উপর পড়তেই থাকে।"

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা গেলো যে, ইস্তিহাযার রক্তে অযু ভেঙ্গে যায়। নয়তো হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উক্ত মহিলার উপর ওজরগ্রস্থ তথা অপারগ ব্যক্তির বিধান আরোপ করতেন না। এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য তার উপর অযু আবশ্যক করে দিতেন না। দেখুন! যে ব্যক্তির বায়ু অথবা ফোটা ফোটা প্রশ্রাব পড়ার রোগ হয়, সে প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে একবার অযু করে নামায পড়তে থাকবে। কেননা বায়ু ও প্রশাব অযু বিনষ্টকারী বস্তু।

হাদীস নং ৪ : ইবনে মাজাহ হযরত আয়িশা সিদ্দীকাহ (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন, :

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَاءَ اَوْ رَعُفَ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّاْ وَلْيَبْنِ عَلٰى صَلٰوتِهٖ مَالَمْ يَتَكَلَّمْ-

"তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তির নামাযরত অবস্থায় বমি অথবা নাক দিয়ে রক্ত নির্গত হবে, সে নামায ছেড়ে দিয়ে উযু এবং পূর্বের নিয়তের উপরই যথারীতি বাকী নামায গুলো আদায় করবে, যদি সে কোন কথা বার্তা না বলে থাকে।

হাদীস নং ৫-৬ : তিরমিযী ও আবূ দাঊদ হযরত তালাক ইবন আলী থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ اَعْرَابِىٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُوْنُ فِى الْفَلَاةِ فَتَكُوْنُ مِنْهُ رُوَيْحَةٌ وَيَكُوْنُ فِى الْمَاءِ قِلَّةٌ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَاءَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ مُلَخِّصًا كَذَافِىْ جَمِيْعِ الْفَوَائِدِ مِنْ جَامِعِ الْاُصُوْلِ وَمَجْمَعِ الزَّوَائِدِ-

"এক বেদুঈন আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ যদি জঙ্গলে থাকে এবং তার বায়ু নির্গত হয় আর পানি নিতান্তই অল্প হয়; তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করলেন, তোমাদের কেউ যদি বমি করে তাহলে সে যেন অযূ করে নেয়।(সংক্ষেপিত)

হাদীস নং ৭ : তিরমিযী হযরত আবুদ দারদা (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন-

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَتَوَضَّأَ فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ فِىْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ صَدَقَ اَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْءَهُ وَحَدِيْثُ حُسَيْنٍ اَصَحُّ شَيْءٍ فِىْ هٰذَا الْكِتَابِ-

"এক বার নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র বমি আসলো। তখন তিনি অযূ করলেন। এরপর আমি দামশকের মসজিদে হযরত ছাওবান এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তার কাছে হযরত আবুদ্ দারদা'র এ হাদীসখানা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, আবুদ্ দরদা ঠিকই বলেছেন। আমিই তখন অযূর পানি ঢেলে দিয়েছিলাম অর্থাৎ আমিই অযূ করায়ে ছিলাম।' হুসাইন'র এ হাদীসটি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ।

হাদীস নং ৯ : তাবরানী 'কাবীর' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস

(রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন,

رَفَعَهُ قَالَ اِذَا رَعُفَ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْسِلْ عَنْهُ الدَّمَ ثُمَّ لِيُعِدْ وُضُوْءَهُ-

"তিনি মারফু বর্ণনা করে বলেন, যদি তোমাদের কারো নামাযরত অবস্থায় নাক থেকে রক্ত নির্গত হয়, তাহলে নামায ছেড়ে দিবে। এরপর রক্ত ধৌত করবে এবং অযূ করবে।

হাদীস নং ৯ : দারু কুতনী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন,

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَاءَ اَحَدُكُمْ اَوْ رَعُفَ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ اَوْاَحْدَثَ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ-

"তিনি বলেছেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যদি তোমাদের কারো নামাযরত অবস্থায় বমি অথবা নাক থেকে রক্ত নির্গত হয় বা 'হাদাস' করে, তাহলে সে নামায ছেড়ে দিবে এবং অযূ করবে।"

হাদীস নং ১০ : ইবনে আবী শায়বাহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন-

قَالَ مَنْ رَعُفَ فِىْ صَلٰوةٍ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ فَاِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَنٰى عَلٰى صَلٰوتِهٖ وَاِنْ تَكَلَّمَ اِسْتَأْنَفَ-

"তিনি বলেছেন, যদি কারো নামাযরত অবস্থায় নাক থেকে রক্ত নির্গত হয়, তাহলে সে নামায ছেড়ে দিবে এবং অযূ করবে। যদি সে কোন কথা-বার্তা না বলে তাহলে অবশিষ্ট নামাযগুলো পূর্ণ করবে, আর যদি কথা বলে ফেলে, তাহলে পূনরায় নতুন ভাবে পড়বে।"

হাদীস নং ১১ : ইমাম মালিক হযরত ইয়াযীদ ইবন কিস্ত লাইছি থেকে রিওয়ায়ত করেন,

أَنَّهُ رَاى سَعِيْدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ رَعُفَ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَأَتٰى حُجْرَةَ اُمِّ سَلْمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِىَ الْوُضُوْءُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فَبَنٰى عَلٰى مَاقَدْ صَلّٰى-

"তিনি হযরত সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যিবকে দেখলেন যে, নামাযরত অবস্থায় তার নাক থেকে রক্ত নির্গত হয়েছে। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র স্ত্রী উম্মে সালামা'র ঘরে এলেন। তখন তাকে পানি দেয়া হলো। তিনি অযূ করলেন এবং ফিরে গিয়ে অবশিষ্ট নামায গুলো পূর্ণ করলেন।"

হাদীস নং ১২ : আবূ দাউদ হযরত আয়িশা সিদ্দীকাহ (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন,

قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَحْدَثَ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلٰوتِهٖ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهٖ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ (مشكوة باب مايجوز من العمل)

"তিনি বলেছেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যদি নামাযে কারো অযূ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে নিজের নাক ধরবে এবং নামাযের স্থান ত্যাগ করবে।"

উল্লেখিত হাদীসটিতে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযীদেরকে এ পদ্ধতিটি শিক্ষা দিচ্ছেন যে, যদি কারো নামাযরত অবস্থায় বায়ু নির্গত হয়, তাহলে সে নিজের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য নাকের উপর হাত রাখবে, যাতে অন্যরা মনে করে যে, তার নাক দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। এরপর মসজিদ থেকে বের হয়ে অযূ করে নিবে। যদি নাক থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে অযূ নষ্ট না হতো, তাহলে এ নিয়মটি অনর্থক হতো।

আমরা উদাহরণ স্বরূপ বারোটি হাদীস উপস্থাপন করেছি। নয়তো এ সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস রয়েছে। ইচ্ছে হলে সহীহুল বিহারী শরীফ অধ্যয়ন করুন।

বিবেকের চাওয়াও এটাই যে, মুখ ভর্তি বমি ও প্রবাহমান রক্ত উযু ভঙ্গের কারণ হওয়া। কেননা, অযূ হলো পবিত্রতা। নাপাকী তথা অপবিত্র বস্তু নির্গত হলে অযূ ভঙ্গ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এ জন্য প্রশ্রাব, পায়খানা এবং বায়ু নির্গত হলে অযূ নষ্ট হয়ে যায়। প্রবাহমান রক্ত, মুখ ভর্তি বমি অপবিত্র, কুরআন করীম বলছে- اَوْدَمًا مَّسْفُوْحًا এ জন্যই প্রবাহমান রক্তওয়ালা প্রাণী যবেহ করার দ্বারা হালাল হয়। নাপাক রক্ত আল্লাহর নামে বেরিয়ে যায়। প্রশ্রাব, পায়খানা এবং বায়ু নির্গত হলে অযূ ভেঙ্গে যায় এ জন্যই যে, অপবিত্র বস্তু নির্গত হয়। এমনি ভাবেই প্রবাহমান রক্ত বের হলে এবং বমি হলেও অযূ নষ্ট হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কেননা এ গুলোও অপবিত্র যা শরীর থেকে নির্গত হয়েছে। এমনকি ইস্তিহাযা, অর্শরোগের কারণে প্রবাহিত রক্তের কারণে এবং পুরুষের

প্রশ্রাবের রাস্তা দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হলে সর্বসম্মত ভাবে অযূ নষ্ট হয়ে যায়। ইস্তিহাযার রক্ত সম্পর্কে তো 'মারফু' হাদীসও বিদ্যমান, যা আমরা এ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। যখন এ তিন প্রকারের রক্ত অযূ বিনষ্ট করে দেয়, তাহলে নিঃসন্দেহে অন্য স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হলেও অযূ নষ্ট হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলার ব্যাপারে আপত্তি ও জবাব সমূহ

বাস্তবতা হলো এ যে, লা-মাযহাবী ওহাবীদের কাছে এ মাসআলায় তাদের সপক্ষে কোন মজবুত দলীল নেই। কেবল কিছু সন্দেহ সংশয় ও ভুল ধারণা নিয়ে তাদের চেচাঁমেচি। তবুও এ অধ্যায়ের পরিপূর্ণতাদানের জন্য আমরা সেগুলোরও জবাব দিচ্ছি।

আপত্তি নং ১ : আহমদ ও তিরমিযী হযরত আবূ হুরায়রা (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاوُضُوْءَ اِلَّا مِنْ صَوْتٍ اَوْرِيْحٍ

"তিনি বলেছেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, শব্দ করে কিংবা নীচু স্বরে পায়ু পথে বায়ু নির্গত হওয়া ছাড়া অযূ করার প্রয়োজন নেই।"

এর দ্বারা বুঝা গেল, শুধুমাত্র পায়ু পথে বায়ু নির্গত হলেই অযূ নষ্ট হয়। রক্ত ও বমির হুকুম এর বিপরীত। তাই এর দ্বারা অযু নষ্ট না হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

জবাব : এর দু'টো জবাব রয়েছে- **এক,** এ হাদীসখানা তোমাদেরও বিরোধী। কেননা তোমরাও বলো যে, প্রশ্রাব, পায়খানা এমননি আওরাত বা লজ্জাস্থান স্পর্শ করলেও অযূ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এ হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে বায়ু নির্গত হওয়া ছাড়া আর কিছুতেই অযূ নষ্ট হয় না। এখন তোমরা যে জবাব দিবে, সেটাই আমাদের জবাব।

দুই, এ 'হাছর' তথা নির্দিষ্টকরণ হলো নির্দিষ্ট বস্তুর সাথে সম্পর্ক মূলক, বাস্তবে নয়। অর্থাৎ এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, যদি কারো বায়ু নির্গত হওয়ার সন্দেহ হয়, তাহলে কোন শব্দ, দুর্গন্ধ বা নিশ্চিতভাবে অনভূতি না হলে অযূ নষ্ট হয় না।

www.AmarIslam.com

এর ব্যাখ্যা হলো সেই হাদীসটি, যা মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রাদ্বি.) বর্ণনা করেছেন-

إِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ فِىْ بَطْنِهٖ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ اَخَرَجَ مِنْهُ شَيْئٌ أَمْ لَا فَلَايَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْيَجِدَرِيْحًا-

"যদি তোমাদের কেউ পেটের ভিতর নড়া-চড়া অনুভব করে এবং এর ফলে বায়ু নির্গত হয়েছে কিনা সন্দেহ হয়, তাহলে সে মসজিদ ত্যাগ করবে না যদি কোন শব্দ কিংবা দর্গন্ধ পাওয়া না যায়।"

এ হাদীস শরীফ দ্বারা বুঝা গেল যে, তোমাদের পেশকৃত (প্রথম) হাদীসটি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ব্যক্তির মনে বায়ু নির্গত হলো কিনা সন্দেহ রয়েছে। হাদীসের উদ্দেশ্য হলো একটা আর তোমরা বলছো অন্য কথা।

আপত্তি নং ২ : হাকিম হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

إِنَّهُ كَانَ فِىْ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِىَ رَجُلٌ مِنْهُ فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضٰى فِىْ صَلٰوتِهٖ-

"তিনি 'যাতুর রিক্বা' নামক যুদ্ধে ছিলেন। ঐ যুদ্ধে এক সাহাবীর গায়ে তীর বিদ্ধ হয় এবং শরীর থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। এমতাবস্থায় ঐ সাহাবী রুকূ সিজদাহ করেন এবং নামায পূর্ণ করেন।"

এ থেকে বুঝা গেলো যে, ঐ সাহাবীর নামাযরত অবস্থায় তীর লেগে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে কিন্তু তিনি নামায ছেড়ে দেননি বরং রুকূ সিজদাহ করে নামায পূর্ণ করেছেন।

জবাব : এ আপত্তির কয়েকটি জবাব রয়েছে। **এক,** এ হাদীসটি তোমাদের ও বিরোধী। কেননা যখন ঐ সাহাবীর গায়ে তীর লেগেছে এবং রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, তখন নিশ্চিতভাবেই তাঁর শরীর ও পোশাক রক্ত মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি নামাযে রত থাকলেন। তাই এখন তোমাদের উচিত হবে, প্রশ্রাব, পায়খানা ও রক্ত মিশ্রিত কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করা জায়েয বলা। অথচ সকল মুসলমান এ বিষয়ে একমত যে, নামাযীর শরীর ও কাপড় পবিত্র হওয়া বাঞ্চনীয়। তাই এ হাদীসটি কোন ভাবেই আমলযোগ্য নয়।

দুই, এ হাদীসে এ বিষয়টি উল্লেখ নেই যে, ঐ সাহাবী হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুমতিক্রমেই এ আমলটি করেছেন। বুঝা গেল, এ

মাসআলাটি সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল না। তাই এমনটি করেছেন।

তিন, এ হাদীসটি ঐ সব মারফূ ও মাওকূফ হাদীসের বিরোধী, যা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। তাই আমলযোগ্য নয়।

চার, এ হাদীসখানা কুরআনে করীমেরও বিরোধী। কেননা, আল্লাহ তায়ালা শরীর ও কাপড় পবিত্র রাখার হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ অর্থাৎ, 'দুর্গন্ধ থেকে দূরে থাক। এবং আরো ইরশাদ করেন, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ 'নিজের কাপড় পবিত্র রাখো।' আর উল্লেখিত হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, ঐ সম্মানিত সাহাবী দুর্গন্ধ যুক্ত শরীর এবং দুর্গন্ধ যুক্ত কাপড় নিয়ে নামায পড়েছেন। তাই এ হাদীসটি আমলযোগ্য নয়।

পাঁচ, এটা জানা যায়নি যে, ঐ সাহাবী কে ছিলেন। তিনি ফক্বীহ ছিলেন কিনা। আর যদি তিনি ফক্বীহ তথা ইসলামী আইনে বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি ইজতিহাদ করে এমন কাজ করেছেন- যা মারফূ' হাদীস ও সমস্ত ফক্বীহ সাহাবীগণের মতের বিরোধী। আর যে ইজতিহাদ হাদীসের বিরোধী হয়, তা ত্যাগ করা ওয়াজিব। আর যদি ফক্বীহ না হন, তাহলে এটা ভুলক্রমেই হয়েছে। যাই হোক হাদীসটি কোন মতেই আমলযোগ্য নয়।

আপত্তি নং ৩ : যদি রক্ত অযূ নষ্ট করে দেয়, তাহলে অল্প রক্ত যা প্রবাহিত হয় না, তাও অযূ নষ্ট করে দেয়াই উচিত। যেমন প্রশ্রাব অযূ নষ্ট করে দেয়-তা বেশী হোক বা এক ফোঁটা হোক। যখন অল্প রক্ত অর্থাৎ যা প্রবাহিত হয় না, তা অযূ নষ্ট না করে, তাহলে বেশী রক্তও অযূ বিনষ্টকারী নয়। একই হুকুম বমির ব্যাপারে। বমি অযূ বিনষ্টকারী। তা মুখ ভর্তি হোক বা অল্প হোক, অযূ ভেঙ্গে দেয়। সুতরাং তোমাদের উল্লেখিত পার্থক্যটি কোত্থেকে বের করলে?

জবাব : আলহাম্দু লিল্লাহ্'! তোমরা এখন কিয়াসের পক্ষে এলে। অর্থাৎ বেশী রক্তকে অল্প রক্তের উপর এবং রক্তকে প্রশ্রাবের উপর কিয়াস করতে শুরু করলে। তবে তোমরা যেমন তোমাদের কিয়াসও তেমন। জনাব, দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু বের হলে অযূ ভেঙ্গে যায়। প্রশ্রাব সাধারণতঃ দর্গন্ধ। তা কম হোক বা বেশী হোক। প্রবাহমান রক্তই দুর্গন্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, اَوْدَمًا مَّسْفُوْحًا যে রক্ত গড়িয়ে পড়ে না তা দুর্গন্ধ নয়। তোমাদের উক্ত কিয়াস কুরআনের আয়াতের পরিপন্থী। বস্তুত প্রত্যেক দুর্গন্ধ যুক্ত বস্তুই নিজের স্থানে অর্থাৎ যেখানে তা সৃষ্টি হয় পবিত্র হয়ে থাকে। নিজ স্থান থেকে বের হলেই নাপাক হয়ে যায়। দেখুন! অন্ত্রে পায়খানা এবং মুত্র থলি প্রশ্রাবে পূর্ণ, কিন্তু তা পবিত্র। তাই তোমাদের

www.AmarIslam.com

নামায শুদ্ধ হয়। যদি নাপাক হতো, তাহলে কোন ভাবেই নামায পড়া শুদ্ধ হতো না। কারণ দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু বহনকারীর নামায হয় না। এভাবে পঁচা ডিম, যেটা ভেতরে রক্ত জমাট বেঁধেছে , তা পকেটে নিয়ে নামায পড়া যাবে। এর ভেতরের রক্ত যেহেতু তার স্থানে আছে, তাই তা পাক। যখন এটা বুঝতে পেরেছো,তাহলে প্রশ্রাব ও রক্ত বের হওয়ার মধ্যে কি পার্থক্য আছে তা বুঝার চেষ্টা করো। প্রশ্রাবের স্থান হচ্ছে মুত্রথলি আর তা স্থান ত্যাগ করে প্রশ্রাবের রাস্তা দিয়ে নির্গত হয়েছে। তাই তা নাপাক। যদিও এক ফোঁটাই হয়। কিন্তু রক্ত সারা শরীরেই চলাচল করে। আর এর স্থান হচ্ছে ত্বকের নীচে। যদি কোথাও চামড়া উঠে যায় এবং রক্ত দেখা যায় তবে গড়িয়ে না পড়ে,তাহলে তা নিজ জায়গাতেই দৃশ্যমান হচ্ছে বলে তা নাপাক নয়। হ্যাঁ যদি প্রবাহিত হয়,তাহলে বুঝবে যে, তা স্থানচ্যুত হয়েছে, ফলে তা নাপাক। এ পার্থক্যের ভিত্তিতে প্রশ্রাব দৃশ্যমান হলেই অযু ভেঙ্গে যায়। কিন্তু রক্ত 'প্রবাহিত' হলে অযূ ভেঙ্গে যায়। তাই রক্ত বের হওয়া ও দেখা যাওয়া ভিন্ন ব্যাপার। এ জন্য রক্তকে প্রশ্রাবের উপর কিয়াস করা যায় না।

আপত্তি নং ৪ : বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা আইনী (রহ.) উল্লেখ করেছেন-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

" নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র বমি বের হয়েছিল কিন্তু তিনি উযু করেন নি।"

যদি বমি করলে অযু নষ্ট হতো,তাহলে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বমি হওয়ার পরও অযু করলেন না কেন?

জবাব : মা-শা-আল্লাহ্! কেমন প্রাণবন্ত আপত্তি। জনাব,এটাও বিভিন্ন হাদীসে এসেছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পায়খানা থেকে আসার পর উনার সামনে অযূ করার জন্য পানি রাখা হলে তিনি অযু করেন নি। এখন তোমরা বলো যে, পায়খানা ও প্রশ্রাব করলে অযূ নষ্ট হয় না। জনাব, অযূ না করার কারণ এটা ছিল যে, সে সময় অযু করার কোন প্রয়োজন ছিল না। অযু নষ্ট হওয়ার সাথে সাথে পূনরায় অযু করা ওয়াজিব নয়। হ্যাঁ, যদি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ বললেন যে, বমি করলে অযূ নষ্ট হয় না,তাহলে তোমরা প্রমাণ পেশ করতে পারবে। আর এ হাদীসগুলো যদি এ মাসআলার দলীল হতো,তাহলে ইমাম তিরমিযী (রহ:) অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন। ইমাম তিরমিযী (রহ:) রক্ত ও বমি অযু বিনষ্টকারী হওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ সহীহ হাদীস পেশ করেছেন। কিন্তু অযূ বিনষ্টকারী না হওয়ার পক্ষে কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। কেবলমাত্র উলামায়ে কিরামের মাযহাব বর্ণনা করেছেন। বুঝা গেল তাঁর মতে বমি ও রক্ত অযূ বিনষ্টকারী না হওয়ার ব্যাপারে কোন হাদীস নেই। কেননা তিনি প্রত্যেক মাসআলার ক্ষেত্রে হাদীস পেশ করে থাকেন।

www.AmarIslam.com

আপত্তি নং ৫ : বমি ও রক্ত সম্পর্কিত যে সব হাদীস আপনারা বর্ণনা করেছেন, যেগুলোতে ইরশাদ হয়েছে যে, যদি নামাযরত অবস্থায় ব্যক্তির বমি অথবা নাক থেকে রক্ত ঝরে,তাহলে সে অযূ করবে। সেখানে অযূ দ্বারা কাপড় থেকে বমি বা রক্ত ধুয়ে ফেলাই উদ্দেশ্য, শরয়ী অযূ নয়। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে-

اَلْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ-

"অর্থাৎ আগুনে পাকানো খাদ্য আহার করলে অযূ করতে হবে।" এখানে অযূ দ্বারা উদ্দেশ্য হাত ধোয়া ও কুলি করা,শরয়ী অযূ নয়। কেননা আহার করার পর হাত ধোয়া, কুলি করা সুন্নাত। এটা অযু বিনষ্টকারী নয়। তদ্রুপ বমি ও রক্তের ব্যাপারে একই হুকুম। তোমাদের দলীলগুলো ভুল।

জওয়াব : বাস্তবিক পক্ষে তোমাদের এ প্রশ্নটি এমন যে, যা আজ পর্যন্ত কারো মনেই আসেনি। এর নামই হলো বিকৃতি। প্রথমতঃ তোমরা এটা ভাবলে না যে, সেখানে তো আগুনে পাকানো খাদ্য আহার করার ব্যাপারটি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই অযূ শব্দের আরবী অর্থ বলে দিয়েছেন। যেমন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার আহার সমাপ্ত করে হাত ধৌত করলেন এবং কুলি করলেন। আর বললেন هٰذَا وَضُوْءٌ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ অর্থাৎ, "আগুনে পাকানো বস্তু আহার করার পর এ ভাবেই অযূ করবে (অর্থাৎ হাত ধুবে এবং কুলি করবে)।" এখানে তোমরা অযুর সর্ব জনবিদিত এ অর্থটি ত্যাগ করে অপ্রচলিত অর্থ কেন গ্রহণ করছো? অথচ উক্ত হাদীসে এটাও রয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তির নামাযরত অবস্থায় বমি বা নাক দিয়ে রক্ত ঝরে, তাহলে সে অযূ করবে এবং নামায শেষ করবে অর্থাৎ অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করবে আর যদি 'কাপড় ধোয়া' উদ্দেশ্য হতো তাহলে বাকী নামায পূর্ণ করা জায়েয হতো না। বরং দ্বিতীয়বার পুরো নামায পড়তে হতো। যদি কারো কাপড়ে নাপাকি লাগে এবং সে নামায ত্যাগ করে তা ধৌত করে, তাহলে সে বাকী নামায পূর্ণ করতে পারবে না। পূনরায় প্রথম থেকে আদায় করবে সুতরাং তোমাদের এ অভিমতটি সম্পূর্ণ বাতিল।

www.AmarIslam.com

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

নাপাক কূপ পাক করা

শরীয়তের মাসআলা হলো যদি কূপ, গর্ত ইত্যাদিতে নাপাকী অল্প পরিমাণও পতিত হয়, তাহলে ঐ কূপের পানি নাপাক হয়ে যাবে। তা পান করা যাবে না এবং অযূ গোসল ইত্যাদিও জায়েয নেই। এক ফোঁটা প্রশাব কূপের সমস্ত পানিকে আপবিত্র করে দেয়। তবে সমুদ্র, পুকুর বা প্রবাহমান পানির হুকুম ভিন্ন। কিন্তু গায়রে মুকাল্লিদ ওহাবীরা বলে যে, যদি পানি দু'মটকা পরিমাণ হয়, তাহলে তাতে যতই নাপাকী পতিত হোক, নাপাক হবে না,যতক্ষণ ঐ পানির রং গন্ধ অথবা স্বাদ পরিবর্তিত না হয়। তাই তাদের মতে কূপের মধ্যে যতই পায়খানা প্রশ্রাব করো, তা পাক। খুশী মনে তা থেকে পান করো, অযূ করো। আর তাদের যেটা সব চেয়ে বাড়াবাড়ি, তা হলো, তারা এ মাসআলার ব্যাপারে ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাদ্বি.) কে গালি দেয়। কারণ তিনি নাপাকী পতিত হলে সে কূপের পানি নাপাক কেন বললেন; আর মুসলমানদেরকে প্রশ্রাব পান করতে দিলেন না কেন; তাই হানাফীরা কখনো লা-মাযহাবী ওহাবীদের পিছনে নামায পড়বেনা এবং যাচাই-বাচাই করা ছাড়া তাদের কূপ থেকে পানি পান করবে না। তাদের কূপগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাপাক হয়ে থাকে। যা দ্বারা এ লোকগুলো তাদের কাপড় চোপড় ধৌত করে এবং অযূ করে, তাই, না তাদের শরীর পবিত্র, না কাপড়। যেহেতু এ মাসআলাটি নিয়ে এ সব লোক খুব ঠাট্টা বিদ্রুপ ও শোর গোল করে এবং বলে যে, এ মাসআলাটি হাদীস সমূহের সম্পূর্ণ বিরোধী। এ জন্য আমরা এ মাসআলাকেও দুটো পরিচ্ছেদে ভাগ করছি। প্রথম পরিচ্ছেদে এ মাসআলার দলীলসমূহ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এর উপর বিভিন্ন প্রশ্ন ও তার জবাব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কূপ নাপাক হওয়া প্রসঙ্গে

কূপ যতই গভীর হোক কিংবা যতই পানি থাকুক যদি তাতে এক ফোঁটা শরাব বা প্রশ্রাব অথবা ইঁদুর, বিড়াল ইত্যাদি পড়ে মারা যায়,তাহলে তা নাপাক। পাক করা ব্যতীত ঐ কূপের পানি ব্যবহার করা যাবে না। এ

সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এর মধ্য থেকে আমরা উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করছি। লক্ষ্য করুন-

হাদীস নং ১-৪ : মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও তাহাবী হযরত জাবির (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন-

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يُبَالَ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يُتَوَضَّأُ فِيْهِ-

" নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদ্ধ পানিতে প্রশ্রাব করতে এবং এরপর তাতে অযু করতে নিষেধ করেছেন।"

হাদীস নং ৫-৯ : মুসলিম, তাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْتَسِلُ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً-

"নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে 'জানাবাতের' গোসল না করে।' তখন আবূ সাইব রাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রাদ্বি.) থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ হুরায়রা, তাহলে জুনুবী (যার গোসল ফরয হয়েছে) কি করবে? হযরত আবূ হুরায়রা (রাদ্বি.) বলেন, সে আলাদা পানি ব্যবহার করবে।"

এ হাদীসটি আহমদ, ইবনে হাব্বান, আবদুর রায্যাক প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন রাবী থেকে শাব্দিক ভিন্নতার সাথে বর্ণনা করেছেন।

উপরোক্ত হাদীস সমূহ থেকে জানা গেল যে, গর্ত, কূপ এবং সকল বদ্ধ পানিতে প্রশ্রাব এবং জানাবাতের গোসল করবে না। যদি এরূপ করে,তাহলে পানি অপবিত্র হয়ে ব্যবহারের উপযোগী থাকবে না। যদি দু'মটকা পানিতে ময়লা পড়লেও নাপাক না হতো,তাহলে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতেন না।

হাদীস নং ১০-১২ তিরমিযী, হাকিম (মুসতাদরাক), ইব্ন আসাকির হযরত আবূ হুরায়রা (রাদ্বি.)) থেকে শাব্দিক ভিন্নতার সাথে রিওয়ায়াত করেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى

www.AmarIslam.com

اَلْاَنَاء غُسِلَ سَبْعُ مَرَّاتٍ اَوْ لُهُنَّ بِالتُّرَابِ وَاِذَا وَلَغَ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً اَللَّفْظُ لِابْنِ عَسَاكِرَ-

"তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যদি কোন পাত্রের মধ্যে কুকুর মুখ দেয়, তাহলে সাত বার ধৌত করতে হবে। প্রথমবার মাটি দ্বারা ঘষবে। যদি বিড়াল মুখ দেয়, তখন এক বার ধৌত করবে।"

এ হাদীসসমূহ দ্বারা জানা গেলো যে, যদি পাত্রের মধ্যে কুকুর মুখ দেয়, তাহলে তা সাতবার ধৌত করতে হবে। একবার মাটি দ্বারা ঘষে ধৌত করতে হবে। আর যদি পাত্রের মধ্যে বিড়াল মুখ দেয়, তাহলে একবারই ধৌত করতে হবে। পাত্র ছোট হোক যেমন হাঁড়ি, লোটা অথবা বড় হোক যেটাতে দু-চার মটকা পানি রাখা যায়। আর যদি কোন নাপাক বস্তু পড়ে ও দু'মটকা পানি অপবিত্র না হয়, তাহলে যে পাত্রের মধ্যে এ পানিগুলো রয়েছে সে পাত্র কি ভাবে নাপাক হয়ে যায়? কুকুরের মুখ পানির সাথে লেগেছে আর সে পানি পাত্রের সাথে লেগে আছে। যখন পাত্র নাপাক হয়ে গেছে,তাহলে নিঃসন্দেহে পানিও নাপাক হয়ে গেছে। তা দু'মটকা হোক বা এর কম বেশী হোক।

হাদীস নং ১৩-১৫ : দারু কুতনী ও তাহাবী হযরত আবূ তুফায়ল থেকে এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

اَنَّ غُلَامًا وَقَعَ فِىْ بِئْرِ زَمْزَمَ فَنُزِحَتْ-

"সাহাবীদের যুগে একবার এক বালক যমযম কূপে পড়ে মারা গিয়েছিল তখন এর সমস্ত পানি বের করে ফেলে দেয়া হয়েছিল।"

হাদীস নং ১৬-১৭ : ইবনে আবী শায়রা ও তাহাবী হযরত আতা (রাদ্বি.) (হযরত আতা (রাদ্বি.) তাবেয়ী ছিলেন) থেকে বর্ণনা করেন-

اَنَّ حَبْشِيًّا وَقَعَ فِيْ زَمْزَمَ فَمَاتَ فَاَمَرَبِهِ اِبْنُ الزُّبَيْرِ فَنُزِحَ مَاءُهَا فَجَعَلَ الْمَاءُ لَايَنْقَطِعُ فَنَظَرَ فَاِذَا عَيْنٌ تَجْرِىْ مِنْ قِبَلِ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ حَسْبُكُمْ-

"জনৈক হাবশী যমযম কূপে পড়ে মৃত্যু বরণ করে। তারপর হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রাদ্বি.) নির্দেশ দিলে এর পানি বের করা হয়। কিন্তু পানি শেষ হচ্ছিল না। দেখা গেল হাজরে আসওয়াদ এর দিক থেকে একটি প্রস্রবন প্রবাহিত হচ্ছে। এরপর ইবন যুবায়র (রাদ্বি.) বললেন, তোমাদের জন্য

এতটুকুই যথেষ্ট।"

হাদীস নং ১৮ : বায়হাকী হযরত কাতাদাহ (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ زَنْجِيًّ وَقَعَ فِىْ زَمْزَمَ فَمَاتَ فَاَنْزَلَ رَجُلًا اِلَيْهِ فَاَخْرَجَهُ ثُمَّ قَالَ اِنْزَحُوْا مَافِيْهَا مِنْ مَاءٍ-

"তিনি হযরত ইবন আব্বাস (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন, জনৈক হাবশী যমযম কুয়ায় পতিত হয়ে মারা গিয়েছিলো। হযরত ইবনে আব্বাস(রাদ্বি.) এক ব্যক্তিকে কূপে নামালেন। সে মৃত্যু ব্যক্তিকে কূপ থেকে বের করে আনলো। এরপর ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) বললেন, কূপের সমস্ত পানি বের করে নাও।"

এ হাদীস সমূহ থেকে কয়েকটি মাসআলা জানা গেল। **এক**, যদি কূপের মধ্যে কোন রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী পতিত হয়ে মারা যায়,তাহলে কূপ নাপাক হয়ে যাবে। **দুই**, নাপাক কুয়াকে পাক করার পদ্ধতি হলো, এর পানি বের করে ফেলতে হবে। এর দেয়াল ইত্যাদি ধোয়ার প্রয়োজন নেই। **তিন**, যদি কূপের পানি নিঃশেষ না হয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। নাপাকি পতিত থাকার সময় যে পরিমাণ পানি ছিল তাই ফেলে দিতে হবে। পরবর্তীতে আসা পানিগুলোর জন্য কোন অসুবিধা নেই। চার, যে বালতি বা রশি দিয়ে নাপাক কূপের পানি বের করা হবে,তা ধৌত করা আবশ্যক নয়। কুয়ার সাথে সাথে সেগুলোও পাক হয়ে যাবে। যদি লা মাযহাবী ওহাবীরা এ হাদীস গুলো নিয়ে চিন্তা করতো, তাহলে ইমামে আযম (রাদ্বি.) কে গালি দেয়া, হানাফীদের নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা চিৎকার ও চেঁচামেচি করা ছেড়ে দিত।

হাদীস নং ১৯ : তাহাবী ইমাম শাবী তাবেয়ী (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

عَنِ الشُّعْبِىْ فِى الطَّيْرِ وَالسِّنَّوْرِ وَنَحْوِهِمَا يَقَعُ فِى الْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ دَلْوًا-

"ইমাম শা'বী পাখি, বিড়াল ইত্যাদি সম্পর্কে বলেন যে, যদি এগুলো পানিতে পতিত হয়ে মারা যায়,তাহলে চল্লিশ বালতি পানি ফেলে দিতে হবে।"

হাদীস নং ২০ : তাহাবী হযরত হাম্মাদ ইবন সুলায়মান তাবিয়ী (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন-

اَنَّهُ قَالَ فِىْ دُجَاجَةٍ وَقَعَتْ فِى الْبِئْرِ فَمَاتَتْ قَالَ يُنْزَحُ قَدَرَ

www.AmarIslam.com

أَرْبَعِيْنَ دَلْوًا أَوْ خَمْسِيْنَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا-

"যদি কোন কূপে মুরগী পড়ে মারা যায়, তাহলে ঐ কূপ থেকে চল্লিশ বা পঞ্চাশ বালতি পানি ফেলে দিতে হবে। এরপর তা থেকে অযূ করা যাবে।"

হাদীস নং ২১ : তাহাবী হযরত মায়সারাহ ও যাদান থেকে রিওয়ায়াত করেন-

عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِذَا سَقَطَتِ الْفَارَةُ اَوِالدَّابَّةُ فِى الْبِئْرِ فَانْزَحْهُمَا حَتّٰى يَغْلِبَكَ الْمَاءُ-

"হযরত আলী (রাদ্বি.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যদি কূপের মধ্যে ইঁদুর অথবা অন্য কোন প্রাণী পতিত হয়ে মারা যায়, তাহলে ঐ কূপ থেকে পানি ফেলে দাও। যতক্ষণ না পানি তোমার উপর প্রবল হয়ে যায় (অর্থাৎ তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়।)

হাদীস নং ২২ : তাহাবী হযরত ইবরাহীম নাখঈ তাবিয়ী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন-

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْبِئْرِ تَقَعُ فِيْهَا الْفَارَةُ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ-

"ইবরাহীম নাখঈ (রহ.) বলেন, যদি কূপের মধ্যে ইঁদুর পড়ে মারা যায়, তাহলে তা থেকে বেশ কয়েক বালতি পানি ফেলে দিতে হবে।"

হাদীস নং ২৩ : শায়খ আলা উদ্দিন মুহাদ্দিস (রহ.) তাহাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আনাস (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করে (আল্লাহ অধিক জ্ঞাত)-

عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ فِى الْفَارَةِ إِذَا مَاتَتْ فِى الْبِئْرِ وَأُخْرِجَتْ مِنْ سَاعَتِهَا يُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُوْنَ دَلْوًا-

"হযরত আনাস (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যদি ইঁদুর কূপের মধ্যে পড়ে মারা যায় এবং সাথে সাথে তা ফেলে দেয়া হয়, তাহলে কূপ থেকে বিশ বালতি পানি ফেলে দিতে হবে।"

হাদীস নং ২৪ : আবূ বকর ইবনে আবী শায়বা হযরত খালিদ ইবন মাসলামাহ থেকে রিওয়ায়াত করেন-

أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَمَّنْ بَالَ فِىْ بِئْرٍ قَالَ يُنْزَحُ (انتصار الحق صـ٢٥٧)

"হযরত আলী (রাদ্বি.) কে ঐ কূপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো- যেটাতে কোন ব্যক্তি প্রশ্রাব করেছে। তখন হযরত আলী (রাদ্বি.) বললেন, কূপের পানি ফেলে দিতে হবে।

এ চব্বিশটি রিওয়ায়াত উদাহরণ স্বরূপ পেশ করা হলো। যা থেকে জানা গেল যে, নাপাক বস্তু পতিত হয়ার কারণে কূপ অপবিত্র হয়ে যায়। আর পানি বের করে ফেল্‌লেই তা পবিত্র হয়। বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেখতে চাইলে তাহাবী শরীফ এবং সহীহুল বিহারী শরীফ অধ্যয়ন করুন।

বিবেকের চাহিদাও হলো এটা যে, নাপাক বস্তু পতিত হওয়ার দ্বারা কূপ অপবিত্র হয়ে যায়। কেননা, যখন নাপাকী লাগার কারণে কাপড়, শরীর, পাত্র ইত্যাদি অপবিত্র হয়ে যায়, তাহলে পানি যা তরল বস্তু আর যাতে নাপাকী খুব সহজেই মিশে যায়,তা অপবিত্র হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। এমনকি যখন দু'মটকা দুধ, তৈল, তরল ঘি, মধু, দধি ইত্যাদিতে নাপাকী পড়লে, তা অপবিত্র হয়ে যায়, তাহলে এ গুলোর চেয়ে তরল পানি কেন নাপাক হবেনা? দু'মটকা দুধ নাপাক হলে নিশ্চয় সমপরিমাণ পানি নাপাক হবে,এ জন্যই সরকার দুআলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেন, ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর উভয় হাত ভাল ভাবে ধৌত না করে পানির পাত্রে ডুবাবে না। (বুখারী ও মুসলিম) দেখুন! অযু বিহীন লোককে পানির পাত্রে হাত দিতে নিষেধ করেছেন,হ্যাঁ! নাপাক বস্তুকে পাক করার পদ্ধতি ভিন্ন। তামা শীসার পাত্র কেবল ভাল ভাবে মুছে ফেললেই পবিত্র হয়ে যায়। নাপাক জুতা শুধু চলা ফেরা বা মাটির সাথে ঘষার ফলে পাক হয়ে যায়, নাপাক ভূমি কেবল শুকিয়ে গেলে এবং নাপাকীর চিহ্ন বিলুপ্ত হলে পাক হয়ে যায়, নাপাক কাপড়, শরীর ধুয়ে ফেললে পবিত্র হয়ে যায়, তদ্রুপ নাপাক কূপ পানি ফেলে দিলেই পাক হয়ে যায়। নাপাক দুধ ও তৈল পবিত্র দুধ ও তৈলের সাথে মিশে প্রবাহিত হলে পবিত্র হয়ে যায়। যাই হোক বাস্তবতা হলো এটাই যে, কুয়া ইত্যাদিতে নাপাকী পতিত হলে,তা নাপাক হয়ে যায়। তবে এ গুলোকে পবিত্র করার বিভিন্ন নিয়ম রয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলা সংক্রান্ত আপত্তি ও জবাব সমূহ

অদ্যাবধি লা মাযহাবী ওহাবীরা এ মাসআলার ব্যাপারে যে সব আপত্তি উত্থাপন করেছে,আমরা বিস্তারিতভাবে তার জবাব দিচ্ছি। এরপর আর কোন

www.AmarIslam.com

আপত্তি যদি আমাদের সামনে আসে, তাহলে ইনশাআল্লাহ এ গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে সে গুলোর জবাবও দেয়া হবে।

প্রথম আপত্তি : তিরমিযী শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত -

قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقٰى فِيْهَا الْحِيَضُ وَلُحُوْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَايُنَجِّسُهُ شَيْئٌ–

"বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমরা কি বীরে বুদাআর পানি দিয়ে অযু করবো? অথচ তা এমন (অরক্ষিত) কূয়া যেটাতে নারীদের হায়েযে ব্যবহৃত কাপড়ের টুকরা, কুকুরের গোশত এবং দুর্গন্ধময় বস্তু ফেলা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এ পানি তো পাক, একে কোন বস্তু কলুষিত করতে পারে না।" বুদা'আ ছিল মদীনা শরীফের একটি কুয়া, যেটাতে সব রকমের দুর্গন্ধময় বস্তু এমনকি মৃত কুকুরও ফেলা হতো। এতদসত্ত্বেও সরকারে দুআলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কূয়া নাপাক হওয়ার কথা বলেননি। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বীরে বুদা'আয় কুকুর, হায়যের কাপড় এবং সব ধরনের দুর্গন্ধময় বস্তু পতিত হওয়ার পরও নাপাক বলেন নি। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রাদ্বি.) এক ফোটা প্রশ্রাব পড়ার কারণে সমগ্র কূয়াকে নাপাক বলে দিচ্ছেন। হানাফীদের এ মাসআলাটি হাদীসের সম্পূর্ণ বিরোধী। আবূ হানীফা কি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চেয়েও অধিক পাক ও পরিচ্ছন্ন ছিলেন?

জবাব : এ আপত্তির কয়েকটি জবাব রয়েছে। **এক,** এ হাদীসটি তোমাদেরও বিরোধী। কেননা এখানে পানির ব্যাপারে কোন সীমা নেই যে, কতটুকু পানি হলে নাপাক হয় না। তাহলে তোমাদের উচিত হবে কলসি, লোটা ইত্যাদিতে হায়যের কাপড়, কুকুরের গোশত ফেলে সে পানি পান করা। কেননা পানিকে তো কোন বস্তুই নাপাক করতে পারে না। **দুই,** যদি এখানে পানি দ্বারা কূয়ার পানিই বুঝায় এবং এটাই উদ্দেশ্য হয় যে, কোন বস্তুই কূয়ার পানি নাপাক করতে পারে না, তাহলেও তা তোমাদের বিরোধী। কেননা তোমরা বলো যে যদি নাপাকী পড়ার পর কূয়ার পানির রং, গন্ধ বা স্বাদ পরিবর্তিত হয়ে যায়,তাহলে তা কুলষিত হবে। এমন কোন কূয়া আছে কি যেটাতে মৃত কুকুর, হায়যের

কাপড়, এবং দুর্গন্ধময় বস্তু পতিত হওয়ার পরও তার রং, গন্ধ ও স্বাদ অপরিবর্তিত থাকে? অভিজ্ঞতার আলোকে বাস্তব কথা হলো, যদি কূয়ার মধ্যে একটি মুরগীও ফুলে ফেটে যায়, তাহলে পানি দুর্গন্ধময় হয়ে যায়। এ হাদীসের আলোকে তোমাদের ফতোয়া দিতে হবে যে, 'ওহাবীদের কূয়াগুলোতে মৃত কুকুর, শুকর, হায়যের কাপড়, ইচ্ছামতে ফেলা যাবে এবং তোমরা ঐ দুর্গন্ধময় পানি পান করতে থাক।' তোমরা গন্ধ ও স্বাদে পরিবর্তিত হওয়ার শর্ত কোত্থেকে জুড়ে দিলে। **তিন,** এ হাদীসখানা ঐ সব হাদীসের বিরোধী, যা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্থির পানিতে প্রশ্রাব করতে পর্যন্ত নিষেধ করেছেন আর এখানে মৃত কুকুর ফেলতে বাধা দিচ্ছেন না। তাই এ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তা সমস্ত মাশহুর হাদীসের বিরোধী। **চার,** এ হাদীসখানা শরীআতের কিয়াসেরও বিরোধী, যেমন- আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। আর যখন কয়েকটি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়, তখন যে হাদীসটি কিয়াসের বিরোধী, তা পরিত্যাগ করা ওয়াজিব আর যেটা কিয়াস সম্মত তার উপর আমল করা ওয়াজিব। সুতরাং প্রথম পরিচ্ছেদে আমাদের উল্লেখিত হাদীস সমূহের উপর আমল করো। **পাঁচ,** বুদা'আ নামক কূয়াটি আমাদের দেশের কূয়াগুলোর মতো ছিলো না। বরং এর নীচের পানি প্রবাহমান ছিল। যেমন, বর্তমানে মক্কা মুআয্যামার কূয়াগুলো 'নাহরে যুবায়দা'র উপর ভিত্তি করেই নির্মিত। আর মদীনা মুনাওওয়ারার কূয়াগুলো 'নাহরে যারক্বা'র উপর অবস্থিত। দৃশ্যত কুয়া মনে হলেও আসলে সেগুলো হচ্ছে চলমান স্রোতধারা। যেহেতু পানি প্রবাহমান ছিল তাই যে সব নাপাকী পতিত হয়েছে তা ভেসে গিয়ে নতুন পবিত্র পানি এসেছে। না তাতে কোন গন্ধ ছিল, না কোন আপবিত্র বস্তু। প্রবাহমান নদী ও সমুদ্রের হুকুম এটাই। যেমন ইমাম তাহাবী হযরত ইমাম ওয়াকিদী থেকে বর্ণনা করেন-

اَنَّ بِئْرَ بُضَاعَةَ كَانَتْ طَرِيْقًا لِلْمَاءِ اِلَى الْبَسَاطِيْنِ فَكَانَ الْمَاءُ لَايَسْتَقِرُّ فِيْهَا–

"বীরে বুদা'আ ছিল বাগানসমূহে পানি প্রবাহিত হওয়ার একটি রাস্তা সেখানে পানি স্থির থাকতো না।"

এ ব্যাখ্যার পর হাদীস সমূহের মধ্যে আর কোন দ্বন্দ্ব থাকলো না এবং মাসআলাটিও সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে গেলো। তাই বুঝা গেল দুর্গন্ধময় বস্তু পতিত হলে কূয়া নাপাক হয়ে যায়।

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় আপত্তি : তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন-

قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْئَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ فِى الْفَلَاةِ مِنَ الْاَرْضِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ قَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ-

"তিনি বলেছেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জঙ্গলের পানির হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো- যেটাতে বিভিন্ন হিংস্র জন্তু অবতরণ করতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যদি পানি দু'মটকা হয় তাহলে নাপাকী বহন করে না।" এর দ্বারা বুঝা গেল, দু'মটকা পরিমাণ পানিতে নাপাকী বস্তু পতিত হলেও কুলষিত হয় না। ইমাম তিরমিযী মুহাম্মদ ইবন ইসহাক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন,দ'কুল্লা হলো পাঁচ মোশক (মোশক হলো চামড়ার থলি যেটা করে পানি বহন করা হয়)। যখন পাঁচ মোশক পানি কুলষিত হয় না তাহলে কূয়াগুলোতে তো শত শত মোশক পানি রয়েছে, তা কি ভাবে নাপাক হবে?

জবাব : এর কয়েকটি জবাব রয়েছে। **এক,** এ হাদীসটি তোমাদেরও বিরোধী। কেননা, এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, দু' মটকা পানি কখনো নাপাক হয় না, যতই নাপাক বস্তু পতিত হোক না কেন। হাদীসের উল্লেখিত خَبَث শব্দটিতে নাপাকীর পরিমানের শর্ত নেই। তাহলে উচিত হবে, যদি দু' মটকা পানিতে চার মটকা প্রশ্রাব পতিত হয় এবং এর গন্ধ, স্বাদ রং সব প্রশ্রাবের মতই হয়ে যায়,তখনও ওহাবীরা তা পান করতে থাকবে। রং ও গন্ধ পরিবর্তিত হওয়ার শর্ত তোমরা কোত্থেকে জুড়ে দিলে? এটাও হাদীসের পরিপন্থী। **দুই,** لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ এর অর্থ এটা কি ভাবে হলো যে, 'নাপাক হয় না'? এর অর্থ হলো 'নাপাক বস্তু বহন করে না।' অর্থাৎ নাপাক হয়ে যায়। যখন এ অর্থের সম্ভাবনাও থাকল,তাই তোমাদের দলীল বাতিল বলে গন্য হলো। **তিন,** যদি এ অর্থ করা হয় যে, দু'মটকা পানি কখনো নাপাক হয় না, তাহলে এ হাদীসখানা প্রথম পরিচ্ছেদে আমাদের উল্লেখিত হাদীস সমূহের বিরোধী। কেননা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বন্ধ পানিতে প্রশ্রাব করতে নিষেধ করেছেন,তা দু'মটকা হোক বা তারচেয়ে কম বেশী হোক। বরং সাইয়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাদ্বি.) জনৈক হাবশী যমযম কূপে পড়ে মারা গেলে এর সমস্ত পানি বের করে

ফেলেছেন। তিনি এটা কেন করলেন? সেখানে তো হাজারো মটকা পানি ছিলো। তাই এ হাদীসখানা আমলযোগ্য নয়। **চার,** قُلَّتَيْنِ শব্দটি قُلَّةٌ শব্দের দ্বিবচন। قُلَّةٌ মটকাকেও বলা হয় আবার মানুষের দেহের গঠন ও উচ্চতাও বুঝায়। قُلَّةٌ শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে পাহাড়ের চূড়া। এখানে قُلَّةٌ শব্দের অর্থ মানুষের দেহের গঠন ও উচ্চতা। এর দ্বারা কূয়ার গভীরতার পরিমাপ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়, বরং দৈর্ঘ্য বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যদি পানি প্রবাহমান হয় এবং তা প্রবাহিত হওয়ার স্থানটি হয় মানুষের শরীরের গঠন ও উচ্চতার সমপরিমাণ, তাহলে কোন কিছুতেই কুলষিত হবে না। কেননা তা নদীর মতোই প্রবাহমান হওয়ার কারণে দুর্গন্ধময় বস্তুকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং এরপর নতুন পানি আসছে। এ অর্থ গ্রহণ করা হলে হাদীসসমূহের মধ্যে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট থাকলোনা এবং প্রত্যেকটি হাদীসের উপরই আমল করা [illegible] হবে। এ ব্যাখ্যাটি উত্তম। কেননা যদি 'কুল্লা' শব্দের অর্থ মটকা ধরা হয়, তাহলে বুঝা যাবে না যে এটা কত বড় এবং কোথাকার মটকা। আর পাঁচ মোশক পরিমাণ নির্ধারণ করাও সঠিক নয়। কারণ হাদীসের মধ্যে এ পরিমাণটি নির্ধারিত নয়। এমনকি এটা ও জানা নেই যে, মোশকটি কত বড় ও কোথাকার। এ সব কারণে হাদীসটি মুজমাল তথা সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল। আর মুজমাল হাদীসের উপর আমল করা অসম্ভব। **পাঁচ,** অথবা হাদীসের উদ্দেশ্য হলো - দু 'কুল্লা' পানি জমিতে অবস্থিত প্রশস্ত হাউযের সমপরিমাণ। অর্থাৎ একশ হাত প্রশস্ত হ[illegible] এক্ষেত্রে এর হুকুম বড় পুকুরের মতই হবে। তাই এতে সামান্য নাপাক বস্তু পতিত হলেও কুলষিত হবে না। এতেও হাদীসগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকে না।

তৃতীয় আপত্তি : হানাফীদের বালতিগুলোর কতই মর্যাদা যে, নাপাক কুয়া থেকে কেবলমাত্র নাপাক পানিগুলো ছেঁকে বের করে আনে আর পাক পানিগুলো রেখে দেয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, যখন কুয়ার মধ্যে পাখি পড়ে মারা গেল, ফলে সমগ্র কুয়া নাপাক হয়ে গেল আর হানাফীরা তা থেকে মাত্র ত্রিশ বালতি পানি ফেলে দিলো। তাহলে তোমরা এটা বলো যে, সমগ্র কুয়া নাপাক হয়নি, শুধুমাত্র ত্রিশ বালতিই নাপাক ছিল যা এ 'কারামতী' বালতি ছেঁকে নিয়ে এসেছে। যদি সমগ্র কূয়াই নাপাক হয়ে যায়, তাহলে ত্রিশ বালতি পানি ফেলে দিলেই সমস্ত কুয়ো পাক হবে কিভাবে?

জবাব : এ (কথিত) 'কারামাত' তো ওহাবীদের বালতির মধ্যেও প্রকাশ পায়। যখন কুয়ার পানির গন্ধ, স্বাদ ও রং পরিবর্তিত হওয়ার কারণে পানি

নাপাক হয়ে যায় এবং কুয়াটি ঝর্ণার (প্রবাহমান স্রোত) সাথে সংযুক্ত হয় যা থেকে পানি সেচে শেষ করা যায় না, তখন ওহাবী সাহেবান ঐ কুয়া পাক করুক। বলো! এ ক্ষেত্রে সমগ্র কুয়া নাপাক হলো নাকি কয়েক বালতি? যদি কয়েক বালতি পানি নাপাক হয়, তাহলে ওহাবীদের বালতিও বাস্তবেই কারামাতী। কারণ তা ছেঁকে ছেঁকে কেবল নাপাক পানি গুলোই বের করে নিল এবং পাক পানিগুলো হাতও লাগলো না। আর যদি সমগ্র কুয়া নাপাক হয়ে থাকে, তাহলে কুয়ার সব পানি বেরও করা হলো না, কুয়ার চারদিকের দেয়ালও ধৌত করা হলো না। তবুও কি ভাবে কুয়ার পানি পাক হয়ে গেল? এ প্রশ্নের উত্তর ওহাবীরা যেটা দিবে, সেটাই আমাদের পক্ষ থেকে বুঝে নিবেন। জনাব, পাখি মারা যাওয়ার কারণে সমগ্র কুয়াই নাপাক হয়ে যায়। তবে নাপাক বস্তুকে পাক করার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কোন বস্তু শুকিয়ে গেলে, কিছু পুড়ে ফেললে, কিছু ভেসে গেলে এবং কিছু কেবলমাত্র মুছে ফেললেই পবিত্র হয়ে যায়। এ ভাবেই এ কুয়ার পানি সহজতার জন্য শুধুমাত্র চল্লিশ বালতি ফেলে দিলেই পবিত্র হয়ে যায়। দেখো, বীর্য হচ্ছে নাপাক। যখন তা কাপড়ে লেগে শুকিয়ে যায়, তখন তা খুটিয়ে তুলে ফেললেই কাপড় পবিত্র হয়ে যায়। এটা তোমাদেরও আক্বীদা। বলো তো দেখি এ কাপড় ধৌত করা ব্যতীত পাক হলো কি ভাবে? সেটা সহজতার জন্যই। তেমনি ভাবে সহজতার জন্য কেবলমাত্র চল্লিশ বালতি পানি ফেলে দিলে সমগ্র কুয়া পাক হয়ে যায়।

চতুর্থ আপত্তি : যদি পাখি বা ইঁদুর মারা যাওয়ার কারণে কুয়া নাপাক হয়ে যায়, তাহলে পানি নাপাক হওয়ার সাথে সাথে কুয়ার চতুর্দিকের দেয়ালও নাপাক হয়ে গেছে। আর তা পাক করার জন্য যে বালতি ও রশি ফেলা হয়েছে তাও নাপাক হয়ে গেছে, তাহলে উচিত হবে তা পাক করার জন্য কুয়ার চতুর্দিকের দেয়াল এবং বালতি ও রশি ধৌত করতে হবে।

জবাব : এ আপত্তির জবাব তৃতীয় আপত্তির জবাবে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে শরীয়ত সহজ পন্থা অবলম্বন করছে। কুয়ার দেয়াল এবং বালতি ও রশি ধৌত করা খুবই কঠিন ব্যাপার। এ জন্য এ থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়েছে। তোমরা ও তোমাদের দুর্গন্ধময় কুয়া পাক করার সময় না কুয়ার দেয়ালগুলো ধৌত করো, না বালতি ও রশি। তোমাদের এ কিয়াস হাদীসের বিপরীত। আর 'নাস' তথা সুদৃঢ় দলীলের বিপরীতে কিয়াস করা জায়েয নয়। আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে বলেছি যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম যমযম কূপ পবিত্র করেছেন। তারা না কূপের দেয়ালগুলো ধুয়েছেন, না বালতি ও রশি।

তাকলীদের গুরুত্ব

আমরা আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবাণীতে 'জাআল হক' প্রথম খন্ডে তাকলীদের মাসআলা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছি, যার জবাব ওহাবী গায়রে মুকাল্লিদরা আজও দিতে পারেনি। যদি ইচ্ছা হয় তা অধ্যয়ন করতে পারেন।

এখানে গ্রন্থের পূর্ণতাদানের জন্য তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা, তাকলীদের উপকারিতা তাকলীদ না করার ক্ষতিসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তাআলা কবূল করুন। আমীন।

স্মতর্ব্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মতদের মধ্যে এমন কিছু সৌভাগ্যবান ব্যক্তি রয়েছেন যাদের হুযুর সাইয়িদে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গ লাভ করার সুযোগ হয়েছে এবং তাঁরা নিজ চোখে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দর্শন লাভ করেছেন। তাঁরা নুবুওয়াতের আকাশের তারকা, সমগ্র উম্মতের পথ প্রদর্শক এবং ইমাম। তাঁদের সম্পর্কে স্বয়ং হুযূর আনওয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুসংবাদ দেন-

أَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ-

"আমার সাহাবীরা নক্ষত্রের ন্যায়। তোমরা তাঁদের মধ্য থেকে যার অনুসরণই করো হিদায়াত লাভ করবে। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে স্বীয় হাবীবের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গ লাভের বরকতে পথভ্রষ্টতা, বদ আক্বীদা পোষণ করা ও পাপাচার থেকে সংরক্ষিত ও নিরাপদ রেখেছেন। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন-

وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا-

"এবং (আল্লাহ তায়ালা) খোদাভীরুতার বাণী তাদের উপর অপরিহার্য করেছেন; এবং তারা এরই অধিকতর যোগ্য।" (সূরা ফাত্হ, আয়াত : ২৬) অন্য জায়গায় সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন করে ইরশাদ করছেন-

وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ

"আর কুফর, অবাধ্যতা ও গুনাহসমূহ তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন।" (সূরা হুজুরাত, আয়াত : ৭)

সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের সাথে আল্লাহ তাআলা জান্নাতী হওয়ার ওয়াদা করে ইরশাদ করেন-

وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى-

আল্লাহ সকলের সাথে কল্যাণের ওয়াদা করেছেন।" (সূরা নিসা, আয়াত : ৯৫)

আল্লাহ তাআলা সকল সাহাবীকে, সমগ্র বিশ্বের জন্য ঈমানের মাপকাটি বানিয়েছেন। অর্থাৎ যার ঈমান তাঁদের মতো হবে, সে মু'মিন আর যার ঈমান তাঁদের বিরোধী হবে, সে বেদ্বীন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا

"অতঃপর তারাও যদি এভাবে ঈমান আনতো, যেমন তোমরা এনেছো, তবেই তো তারা হিদায়ত পেয়ে যেতো।" (সূরা বাক্বারা, আয়াত : ১৩৭)

সাহাবায়ে কিরামের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে চাইলে আমার রচিত "আমীরে মুয়াবিয়া' (গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে- অনুবাদক) গ্রন্থখানা একবার পড়ুন। যাহোক হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র সাহচর্যের বরকতে সাহাবায়ে কিরামের অন্তর আলোকিত ও বক্ষ নূরানী ছিল। সেই সম্মানিত বুযর্গগণ পৃথিবীতে পবিত্র গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ধর্মীয় মত বিরোধ ছিল না, ছিল না বিভিন্ন দল উপদল, না মাযহাবগত দ্বন্দ্ব, ছিল না ফিতনা ফ্যাসাদ।

তাই ঐ স্বর্ণ যুগে নিয়মতান্ত্রিক তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা ছিল না। যারা সকলেই ছিলেন সমগ্র বিশ্বের ইমাম, তারা কার তাকলীদ করবেন?

পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের মধ্যে মাযহাবগত মতানৈক্য বিভিন্ন চিন্তা-চেতনার প্রসার, মাসআলা মাসাইলের আধিক্য, দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। তখন উলামায়ে কিরাম কুরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা সমূহ বের করে দ্বীনে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সকল ছোট বড় বিষয়কে দর্পনের মত পরিস্কার করে দিলেন। মুসলিম উম্মাহ উপলব্ধি করলো যে, ইমামগণের তাকলীদ করা ছাড়া উপায় নেই। অর্থাৎ পরবর্তীতে মুসলমানগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেলেন- (১) সাধারণ মানুষ (২) আলিমগণ (৩) মুজতাহিদগণ।

কুরআন হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ মুসলমানরা আলিমগণের অনুসরণ করলেন এবং উলামায়ে কিরাম মুজতাহিদ ইমামগণের তাকলীদকে আবশ্যক ও অপরিহার্য মনে করলেন। এ তাকলীদ ও ইজতিহাদ যুগের প্রয়োজনেই আবশ্যক হয়েছে।

এর উদাহরণ এভাবেই দেয়া যায় যে, শুরুতে যখন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি, তখন সাহাবায়ে কিরাম কুরআন করীমও গ্রন্থাকারে একত্রিত করেননি।

হযরত উসমান (রাদ্বি.) এর খিলাফাতের সময় প্রয়োজনের তাগিদে কুরআন করীম গ্রন্থাকারে একত্রিত করা হয়েছে। এর অনেক দিন পরে কুরআনে যের-যবর (হরকত) যুক্ত করা হলো। এর বেশ কিছুকাল পরেই একে রুকু পারা আকারে সাজানো হলো।

কোন সাহাবী হাদীস সংকলন এবং হাদীসের প্রকারভেদ ও আহকাম প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি। বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি সাহাবায়ে কিরামের যুগের অনেক পরের গ্রন্থ। মোটকথা দ্বীনি প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে এ সবের সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে তাকলীদের আবশ্যকতাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আজ যেমন এটা বলা যাবে না যে, কুরআনের একত্রিতকরণ ই'রাব, পারা বানানো, ইলমে হাদীস এবং হাদীসের কিতাব গুলো বিদআত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অথবা সাহাবায়ে কিরামের যুগে এসব ছিল না, তেমনি ভাবে এটা বলাও বোকামী যে, ইমামগণের তাকলীদ ও ইলমে ফিক্‌হ বিদআত। কারণ সাহাবীদের যুগে এর প্রচলন ছিল না।

আজ গ্রন্থাকারে কুরআন এবং মুসলিম, বুখারী ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থের যেমন প্রযোজন হয়, তেমন ইমামগণের তাকলীদও আবশ্যক।

আমরা এখানে একেবারে সংক্ষিপ্তভাবে তাকলীদের গুরুত্ব কুরআন, হাদীস, উম্মতের আমল ও যৌক্তিক দলীল দ্বারা প্রমাণ করছি। শুনুন এবং ঈমান সতেজ করুন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

(১) فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ-

"যদি তোমরা না জানো, তাহলে জ্ঞানবানদের কাছে জিজ্ঞেসা করো।" (সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৭)

এ আয়াত শরীফ দ্বারা প্রতিভাত হলো যে, দ্বীনি বিষয়ে অনুমান গ্রহণযোগ্য নয়। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোকের কাছে, অজ্ঞ লোক আলিমের কাছে, গায়রে মুজতাহিদ আলিম মুজতাহিদ আলিমগণের কাছে জিজ্ঞাসা করবে। এরই নাম তাকলীদ।

(২) يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ-

"হে ঈমানদারগণ, নির্দেশ মান্য করো আল্লাহর এবং নির্দেশ মান্য করো

রসূলের আর তোমাদের মধ্যে যারা বিজ্ঞ। (সূরা নিসা, আয়াত : ৫৯)

কুরআন করীমের উপর আমল হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য, হাদীস শরীফের উপর আমল হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ এবং 'ফিক্‌হ' এর উপর আমল হলো 'উলিল আম্‌র' এর নির্দেশ পালন। এ তিনটি আনুগত্যই আবশ্যক।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) 'তাফসীরে কাবীর' এ বলেন, পূর্বোল্লেখিত আয়াতে "উলুল আমর" দ্বারা দ্বীনের আলিমগণ বুঝানো হয়েছে, রাজা বাদশাহ্‌গণ নন। কেননা আলিমদের আনুগত্য করা বাদশাহদের উপর সর্বাবস্থায় জরুরী। কিন্তু আলিমগণের উপর বাদশাহদের আনুগত্য করা সর্বদা আবশ্যক নয়। শুধুমাত্র ঐ সব আহকামেই ওয়াজিব যা শরীয়ত সম্মত। এমনি ভাবেই রাজা-বাদশাহগণ উলামায়ে কিরামের কাজ থেকে শরীয়তের বিধি বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ– (৩)

"এবং সবার মধ্যে অগ্রগামী প্রথম মুহাজির ও আনসার আর যারা সৎকর্মের সাথে তাদের অনুসারী হয়েছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।" (সূরা তাওবা, আয়াত : ১০০)

এর দ্বারা প্রতিভাত হলো যে, আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের মধ্যে তিন শ্রেণীর উপর সন্তুষ্ট- (১) মুহাজির (২) আনসার, (৩) কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের অনুসরণ ও তাকলীদকারী মুসলমান।

গাইরে মুকাল্লিদরা এ তিন শ্রেণীর বাইরে। কেননা তারা না মুহাজির, সাহাবী, না আনসারী, না তাদের মুকাল্লিদ তথা অনুসারী। কারণ তাদের মতে তাকলীদ করা শিরক।

وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ– (৪)

"আর তারই পথে চলো, যে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছে।" (সূরা লুক্বমান, আয়াত : ১৫)

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর আল্লাহ তাআলার মাকবূল বান্দাগণের পথ অনুসরণ করা আবশ্যক। চার মাযহাবের ইমামগণ স্বয়ং আল্লাহ তাআলার মাকবূল বান্দা। এবং সমস্ত অলী, আলিম,

নেককার, মু'মিন তাঁদের মুকাল্লিদ তথা অনুসারী। তাই তাকলীদ হলো মাকবূল বান্দাদের রাস্তা আর তাকলীদের বিরোধিতা, অভিশপ্তদের পথ।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ– (৫)

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।" (সূরা তাওবা, আয়াত : ১১৯)

বুঝা গেলো যে, কেবলমাত্র তাকওয়া ও পরহেযগারী পুরস্কার ও প্রতিদান লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই পরহেযগারীর সাথে সৎলোকগনের সাহায্যও প্রয়োজন। নতুবা পথে ছিনতাই এর কবলে পড়ার আশংকা রয়েছে। চার মাযহাবের ইমামগণ সৎ এবং মুসলিম উম্মাহর সকল সৎলোকই তাদের অনুসারী।

সকল অলী, আলিম, মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সির মুকাল্লিদ ছিলেন। গায়রে মুকাল্লিদ তথা লা-মাযহাবীদের মধ্যে যদি কোন অলী থাকেন, তাহলে দেখিয়ে দিন। যে ডালে ফুল, ফল, পাতা কিছুই থাকে না, তা ইঁদুরের খাওয়ার উপযুক্ত। কেননা তা শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তদ্রুপ যে দলে আল্লাহর অলীগণ থাকে না, তা দোযখের উপযুক্ত। কেননা তাঁদের সম্পর্ক হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ছিন্ন হয়ে গেছে।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ– (৬)

"আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো। তাঁদেরই পথে যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো"। (সূরা ফাতিহা, আয়াত : ৫-৬)

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, সোজা পথের পরিচয় এটাই যে, যেটার উপর আল্লাহর অলী, আলিম ও নেককার লোকগণ থাকবেন। দেখুন, সকল অলী ও নেককার ব্যক্তি মুকাল্লিদ। হুযূর গাউছে পাক, খাজা আজমীরি, খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী, ইমাম তিরমিযী প্রমুখের মতো পরম সম্মানিত বুযর্গগণ মুকাল্লিদ হিসাবেই জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাই তাকলীদ জান্নাতের সহজ পথ আর ওহাবীবাদ ও মাযহাব বিদ্বেষ হলো বাঁকা পথ, যা দোযখ পর্যন্ত পৌঁছে দিবে।

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ– (৭)

"এবং যে ব্যক্তি সঠিক পথ প্রকাশ হওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুসলমানদের পথ থেকে আলাদা পথে চলে, আমি তাকে তার অবস্থার

www.AmarIslam.com

উপর ছেড়ে দেবো এবং তাকে দোযখে প্রবেশ করাবো।" (সূরা নিসা, আয়াত : ১১৫)

এ আয়াত দ্বারা প্রতিভাত হলো যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরোধিতাকারী কাফিরদের জন্য যে শাস্তি নির্ধারিত,সেই একই শাস্তি সেই কলেমা পড়ুয়া বেদ্বীনদের জন্য ও,যারা মুসলমানদের পথ ছেড়ে নিজেদের জন্য দেড় ইটের আলাদা মসজিদ তৈরী করে নিয়েছিল। তাকলীদ সকল মুসলমানের রাস্তা। গায়রে মুকাল্লিদরা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই তারা নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে নিজেরাই ভাবুক।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا- (৮)

"এভাবে আমি তোমাদেরকে মাঝামাঝি উম্মত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষী হও। আর এ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের সাক্ষী।" (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৩৪)

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, মুসলমান দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তাআলার সাক্ষী। যে মানুষ বা যে পথ বা যে মাসআলাকে সাধারণ মুসলমান সৎ ও সঠিক বলে, তা বাস্তবেই সঠিক। আর যাকে মন্দ বলে, তা আসলেই মন্দ।

সাধারণ মুসলমান তাকলীদকে সঠিক বলে এবং ইমামের অনুসারী আর গায়রে মুকাল্লিদদের মন্দ বলেই জানে। তাই তাকলীদই সঠিক ও নির্ভুল পথ এবং মুকাল্লিদরা সত্যাশ্রয়ী দল।

হাদীস শরীফসমূহ

এ সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কিছু হাদীস উপস্থাপন করা হচ্ছে-

হাদীস নং ১ : ইবনে মাজাহ হযরত আনাস (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন-

اِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَاِنَّهٗ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ

"তোমরা বড় দলের অনুসরণ করো। কেননা যে ব্যক্তি মুসলমানদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলো, সে দোযখেও একাকী যাবে।" (মিশকাত শরীফ) বুঝা গেলো, প্রত্যেক মু'মিনের উচিত মুসলমানদের বড় দলের সাথে থাকা। দল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা দোযখে যাওয়ার কারণ। সকল মুসলমান মুকাল্লিদ। এখন

www.AmarIslam.com

গায়রে মুকাল্লিদ নিজের পরিনতি বুঝে নিক।

হাদীস নং ২-৪ : মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ হযরত হারিছা আশয়ারী (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন-

مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ-

"যে ব্যক্তি মুসলমানের দল থেকে এক বিগত পরিমাণ দূরে গেলো, সে নিজ গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেললো।" (মিশকাত, কিতাবুল ইমারাহ)

হাদীস নং ৫ : মুসলিম ও বুখারী হযরত আবূ হুরায়রা (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْاِيْمَانَ لَيَأْرِزُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ اِلٰى جُحْرِهَا-

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- নিশ্চয়ই ঈমান মদীনা মুনাওয়ারার দিকে এমন ভাবে ফিরে আসবে, যে ভাবে সাপ নিজের গর্তে ফিরে আসে।" (মিশকাত, বাবুল ই'তিছাম)

বুঝা গেলো যে, মদীনা মুনাওওয়ারা শুরু থেকেই ইসলামের কেন্দ্রভূমি এবং সর্বদা তাই থাকবে। সেখানে ইনশাআল্লাহ কখনো শিরক হবে না। আলহামদুলিল্লাহ! সমগ্র হিজায বিশেষতঃ মক্কা মুয়ায্যামাহ ও মদীনায় সকল মুসলমান মুকাল্লিদ ছিলেন এবং আছেন। সেখানে একজনও লা মাযহাবী নেই।

নযীর হুসাইন দেহলভী, শরীফ হুসাইনের শাসনামলে হারামাইন শরীফাইনে গিয়েছিলেন। গায়রে মুকাল্লিদ হওয়ার কারণে তিনি গ্রেফতার হন। সেখানে 'তাক্বিয়্যাহ' তথা নিজের স্বরূপ গোপন করে জীবন বাঁচান। এরপর হিন্দুস্তানে ফিরে এসে আবার গায়রে মুকাল্লিদ হয়ে যান। নযীর হুসাইন আমরণ গায়রে মুকাল্লিদদের নেতা ছিলেন। এখন যদিও সেখানে নজদীদের রাজত্ব চলছে, তথাপি খোদ নজদীরাও নিজেদেরকে গায়রে মুকাল্লিদ বলতে ভয় পায়। তাই তারা হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলে দাবী করে। যদি তাকলীদ শিরক হতো, তাহলে 'হারামাইন তাইয়িবাইন' এর থেকে পবিত্র ও মুক্ত থাকতো।

হাদীস নং ৬ : ইমাম আহমদ হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রাদ্বি.) থেকে রিওয়ায়াত করেন-

www.AmarIslam.com

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاذَّةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ إِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ-

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, শয়তান হলো মানুষের জন্য বাঘের ন্যায়। বাঘ যেমনি পাল থেকে বিচ্ছিন্ন, এক প্রান্তে চলে যাওয়া ও বিক্ষিপ্তভাবে বিচরণরত ছাগলকে আক্রমণ করে, তেমনি শয়তানও মুসলমানদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থানকারীদেরকে আক্রমণ করে। তোমরা বিচ্ছিন্নবাদিতা থেকে বেঁচে থাকো এবং সকল মুসলমানদের সাথে সংঘবদ্ধ ভাবে থাকো।" (মিশকাত, বাবুল ই'ছিাম)

হাদীস নং ৭ ঃ

لَايَجْتَمِعُ أُمَّتِى عَلَى الضَّلَالَةِ وَيَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ-

"আমারা উম্মত কখনো পথ ভ্রষ্টতার উপর একমত হবে না। দলের উপর আল্লাহর রহমত রয়েছে। যে ব্যক্তি দল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলো সে দোযখেও একাকী যাবে।" (মিশকাত)

উপরোক্ত হাদীস সমূহের থেকে বুঝা গেলো যে, মুসলমানদের মুক্তির জন্য কেবলমাত্র একটি পথ আর তা হলো, নিজের আক্বীদাগুলোকে সকল মুসলমানের অনুকূলে রাখা। যে ব্যক্তি মুসলমানদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলো, সে শয়তানের আক্রমণের শিকার হলো। সাধারণত সকল মুসলমান মুকাল্লিদ। তাই গায়রে মুকাল্লিদ থাকা মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকারই নামান্তর।

মুসলমানদের আমল

প্রথম থেকেই সকল স্তরের মুসলমানগণ মুকাল্লিদ। মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফকীহ ও আল্লাহর অলীগণের মধ্যে কেউই গায়রে মুকাল্লিদ ওহাবী নন। যেমন ইমাম কুসতুলানী ও তাজুদ্দীন সুবকী সুস্পষ্টভাবে এবং ইমাম নববী ইঙ্গিতে বলেছেন, যে, ইমাম বুখারী তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, দারু কুতনী প্রমুখ মুহাদ্দিস শাফেয়ী ছিলেন। তাহাবী, ইমাম যায়লাঈ, বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা আইনী, ত্বীবি, মোল্লা আলী কারী, আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী প্রমুখ মুহাদ্দিস হানাফী ছিলেন।

তাফসীরে কাবীর, তাফসীরে খাযিন, বায়যাভী, জালালাইন, তানভীরুল মিকয়াস ইত্যাদি গ্রন্থের মুফাস্সিরগণ শাফেয়ী ছিলেন। তাফসীরে মাদারিক, তাফসীরে সাভীর প্রণেতা ও অন্যান্য মুফাস্সিরগণ হানাফী ছিলেন।

ফোকাহা ও আউলিয়ায়ে কিরাম সকলেই মুকাল্লিদ এবং প্রায় আওলিয়ায়ে কিরাম হানাফী ছিলেন, যা আমরা আগেই বর্ণনা করেছি। গায়রে মুকাল্লিদ ওহাবীরা ভেবে দেখতে পারে যে, তাদের মধ্যে ক'জন মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ফক্বীহ ও অলী আছেন? তাদের শিকড় কোন্ ভূমিতে প্রোথিত এবং তারা কোন্ বৃক্ষের শাখা কিংবা কোন্ শাখার ফল?

বিবেকের চাওয়াও এটা যে, তাকলীদ অধিকতর প্রয়োজনীয় ফরয এবং গায়রে মুকাল্লিদ ও নজদী মতবাদ প্রাণ হন্তারক বিষ এবং ঈমানের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তা কয়েকটি কারণে-

এক, কুরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা বের করা সহজ নয়; বরং খুবই কঠিন কাজ। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য এত মহান একজন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পাঠিয়েছেন। যদি কুরআন বুঝার জন্য শুধু মাত্র মানবীয় বোধশক্তিই যথেষ্ট হতো, তাহলে তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য হুযূর সাইয়িদুল আম্বিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পাঠানো হতো না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ "(ঐ রাসূল) তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) কুরআন ও পরিপক্ক জ্ঞান শিক্ষা দেবেন।" (সূরা বাকারা, আয়াত : ১২৯)

যেমনি ভাবে কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রেরণ করা হয়েছে, তেমনি হাদীস বুঝানোর জন্য মুজতাহিদ ইমামগণকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন যে ব্যক্তি তাকলীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে কুরআন ও হাদীস পড়তে ও বুঝতে পদে পদে হোঁচট খেতে থাকে। (আল্লাহ্র পানাহ)

আমি গায়রে মুকাল্লিদ ওহাবীদের বড় বড় নেতাদের বার বার বলেছি যে, হাদীস বুঝার কথা পরে,আগে আমাকে শুধু এটাই বলুন যে, হাদীস ও সুন্নাহ্র মধ্যে পার্থক্য কি? হাদীস কাকে বলে এবং সুন্নাত কাকে বলে? আপনারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলেন, আর আমরা হলাম আহলে সুন্নাত। বলুন, আপনাদের এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্য কী। তবে এ পার্থক্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে। আজ পর্যন্ত তারা বলতে পারেন নি। এবং ইনশাআল্লাহ

কিয়ামত পর্যন্ত বলতে পারবেন না।

আমাদের উপরোক্ত ঘোষণা উন্মুক্ত। বর্তমানেও কোন ওহাবী সাহেব কষ্ট করে এর জবাব দিক।

বেচারারা কি হাদীস বুঝবে আর তা থেকে কি মাসআলা বের করবে। তারা কেবল 'রফয়ে ইয়াদাইন' ও 'উচ্চস্বরে আমীন পড়া' সম্পর্কিত চারটি হাদীস না বুঝে মুখস্থ করে আহলে হাদীস হয়ে গিয়েছে। হাদীস বুঝা তো আল্লাহ্‌র দয়ায় মুকাল্লিদদেরই কাজ। যদি হাদীস বুঝার স্বাদ নিতে চান, তাহলে আমার প্রণীত বুখারী শরীফের আরবী হাশিয়া 'নঈমুল রাবী' অধ্যয়ন করুন। যার মধ্যে এ-কেকটি হাদীস থেকে আট দশটি করে মাসআলা উদ্ভাবন করেছি- যাতে ঈমান সতেজ হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ একটি প্রসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত হাদীস পেশ করছি- أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ "ওহুদ পাহাড় আমাকে ভালবাসে, আমি ও তাকে ভালবাসি।"

উক্ত হাদীস থেকে আমরা শরীয়ত ও তরীকত সম্পর্কিত নিম্নোল্লেখিত মাসআলাগুলো উদ্ভাবন করেছি। (১) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর প্রতি মুহাব্বত কেবল মানবজাতির কাম্য নয়, বিবেকহীন জন্তু, প্রাণহীন কাঠ, পাথর ইত্যাদি ও হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রত্যাশী। ইউসুফ (আ.) এর সৌন্দর্য লক্ষ মানুষ দেখেছে কিন্তু প্রেমিকা শুধুমাত্র যুলায়খা একজনই। হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রকৃত সৌন্দর্য আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি, কিন্তু তাঁর প্রেমে পাগল আজ কোটি মানুষ। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমগ্র সৃষ্টি জগতের মাহবুব। কেন হবেন না? কারণ তিনি তো স্বয়ং স্রষ্টার মাহবুব তথা প্রেমাস্পদ।

(২) যে মানুষ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভালবাসেনা, সে পাথরের চেয়েও কঠিন এবং চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট।

(৩) যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাথরের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত যেমন তিনি বলেন, 'ওহুদ আমাকে ভালবাসে' তাহলে মানুষের মনের ভেদ কেন জানবেন না? তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নয়।

(৪) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে প্রেম ভালবাসা এবং মনের অবস্থা মুখে বলার প্রয়োজন নেই। তিনি মনের ভেতরের খবরও জানেন। ওহুদ পাহাড় মুখে কিছুই বলেনি; কিন্তু তার মনের অবস্থা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে সুস্পষ্ট ছিলো। যদি হুযূর (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষের মনের অবস্থাদি না জানেন, তাহলে কাল কিয়ামতে কিভাবে শাফাআত করবেন। যে কেউ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে শাফায়াতের জন্য দরখাস্ত করলে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি বলেন যে, 'আমি জানিনা সে মু'মিন না কাফির'- তাহেল কি ভাবে শাফায়াত করবেন? কেননা এমন অনেকে থাকবে যে জীবনে কখনো নামায পড়েনি।

(৫) সমস্ত ইবাদাতের প্রতিদান হলো জান্নাত। কিন্তু মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভালবাসার প্রতিদান হলো ভালবাসা। যেমন তিনি বলেন, ওহুদ আমাকে ভালবাসে আমি তাঁকে ভালবাসি। সুতরাং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রেম সকল ইবাদাত থেকে উত্তম। কারণ জান্নাতের মালিক মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতিদান। বুখারী শরীফের আরেকটি হাদীস শুনুন এবং এর থেকে ঈমানী ও ইরফানী মাসআলা সমূহের উদ্ভাবন প্রত্যক্ষ করুন, ঈমান সতেজ করুন।

হাদীস : হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার খচ্চরের পিঠে চড়ে যাচ্ছিলেন। সামনে দুটো কবর দেখা গেলো। তখন খচ্চরটি থেমে গেলো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নেমে পড়লেন এবং বললেন, এ দু'কবরবাসীর উপর আযাব হচ্ছে, যা দেখে খচ্চর দাঁড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে একজন হলো উটের রাখাল। সে উটের প্রস্রাবের ফোটা থেকে সাবধান থাকতো না। দ্বিতীয় জন ছিলো চোগলখোর। এ জন্যই তারা কবরের আযাব ভোগ করছে। এটা বলার পর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খেজুর গাছের একটি ডালকে দু'টুকরো করে কবর দুটিতে পুঁতে দিলেন এবং বললেন, এ ডালটি যতক্ষণ কাঁচা থাকবে, ততক্ষণ তাদের কবরের আযাব লাঘব হবে।

ফলাফল : এ হাদীসের কয়েকটি ফলাফল -

(১) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চোখ মুবারক থেকে কোন কিছুই গোপন নয়। তিনি পর্দার অপর পাশেও দেখতে পান। দেখুন, আযাব হচ্ছে হাজার মন মাটির নীচে কবরের ভিতর। অথচ হুযূর মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র দৃষ্টি তা কবরের উপর থেকেই দেখতে পাচ্ছেন।

(২) যে জন্তুর উপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সওয়ার হন, সে জন্তুর চোখ থেকেও পর্দা উঠিয়ে নেয়া হয়। যেমন, খচ্চরটি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বরকতে কবরের আযাব দেখে ফেললো এবং ভয় পেয়ে গেলো। নতুবা আমাদের খচ্চর দিন রাত কবরস্থানের পাশ দিয়ে বিচরণ

করে, অথচ ভয় পায় না। তাই হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি কোন অলীর উপর করুনার দৃষ্টিতে তাকান, তাহলে তার দৃষ্টি থেকেও অদৃশ্যের পর্দা সরে যাবে।

(৩) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকাশ্য ও গোপন, পূর্বাপর সকল আমল সম্পর্কে জ্ঞাত। যেমন তিনি ইরশাদ করলেন যে, একজন ছিল চোগলখোর অন্যজন প্রশ্রাব থেকে বেঁচে থাকতো না। অথচ তাঁরা দু'জন এ আমলগুলি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সম্মুখে করেনি। সুতরাং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের প্রত্যেক আমল সম্পর্কে অবগত।

(৪) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্ তাআলার শাস্তি থেকে বাঁচাতে ও শাস্তি দূর করতেও জানতেন। যেমন তিনি রূহানী রোগ-ব্যাধি এবং সেগুলোর চিকিৎসা সম্পর্কে অবগত। যেমন ঐ কবরবাসীদের শাস্তি দূর করার জন্য কাঁচা ডাল কবরের উপর পুঁতে দিয়ে বললেন, এর দ্বারা আযাব হালকা হবে।

(৫) কাঁচা সবুজ ডালের তাসবীহ্র বরকতে মু'মিনের কবরের আযাব হালকা হয়। তাই যদি কবরের উপর কুরআন তিলাওয়াত অথবা আল্লাহ তাআলার যিকর করা হয়, তাহলে অবশ্যই মৃত ব্যক্তির উপকার হবে। কেননা মু'মিনের তাসবীহ-তাহলীল সবুজ ডালের তাসবীহ-তাহলীল থেকে উত্তম।

(৬) যদিও শুকনো পদার্থগুলোও তাসবীহ পড়ে (যেমন وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ) কিন্তু তাদের তাসবীহ দ্বারা কবরের আযাব দূর হয় না। যিকরের প্রভাবের জন্য মুখও প্রভাব সৃষ্টিকারী হতে হবে। তাই লা-মাযহাবীদের কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি নিস্ফল ও অনর্থক। মু'মিন ব্যক্তির অন্তরে মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুহাব্বতের আদ্রতা ও সতেজতা রয়েছে। তাই তার যিক্র প্রভাব সৃষ্টিকারী।

(৭) মু'মিনের কবরের উপর সবুজ উদ্ভিদ, ফুল ইত্যাদি দেয়া ফলদায়ক। এতে কবরবাসীর উপকার হয়। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবুজ ডাল কবরে পুঁতে দিলেন এবং বললেন, যতক্ষন পর্যন্ত এটা কাঁচা থাকবে, ততক্ষণ শাস্তি হালকা হবে।

(৮) হালাল জন্তুগুলোর প্রস্রাব নাপাক। এর থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন। এর ফোঁটাগুলো কবর আযাবের কারণ। দেখুন, উট হালাল অথচ এর প্রশ্রাব কবরের আযাবের কারণ হয়েছে।

এ পর্যন্ত তো আমরা আপনাদের সামনে আমার হাশিয়ায়ে বুখারী থেকে কিছু অংশ পেশ করলাম এখন আমার প্রণীত হাশিয়ায়ে কুরআনও একটু পর্যবেক্ষণ করুন। কেবলমাত্র একটি আয়াত থেকে উদ্ভূত ফায়দা উপস্থাপন করছি।

مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ

"জিনদেরকে তার (হযরত সুলায়মান (আ.) এর ওফাতের বিষয় জানায়নি, কেবল যমীনের উই-পোকা, যা তার লাঠি খাচ্ছিলো।" (সূরা সাবা, আয়াত : ১৪)

হযরত সুলায়মান (আ.) এর ওফাত হয়েছিল নামাযরত অবস্থায়। তখন বায়তুল মুকাদ্দিসের নির্মাণ কাজ চলছিলো। তিনি ওফাতের পরও একই ভাবে লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ছয় মাস পর উই পোকা লাঠিটি খেয়ে ফেললো। লাঠি ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে তাঁর পবিত্র শরীর যমীনের উপর পড়ে গেলো। তখনই 'বায়তুল মুকাদ্দাস' নির্মাণে রত জিনরা কাজ ছেড়ে পালিয়ে গেলো।

ফলাফল : উক্ত আয়াত ও ঘটনা থেকে কয়েকটি ফলাফল।

(১) সম্মানিত নবীগণের পবিত্র শরীর ওফাতের পর বিগলিত হওয়া ও বিকৃত হওয়া থেকে পবিত্র। যেমন হযরত সুলায়মান (আ.) এর পবিত্র শরীর ছয় মাস পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিলো কিন্তু কোন পরিবর্তন হয় নি।

(২) আম্বিয়ায়ে কেরামের শরীর মুবারক পোকা খেতে পারে না। দেখুন, উই পোকা হযরত সুলায়মান (আ.) এর লাঠি খেয়ে ফেললো কিন্তু পা মুবারক খেলো না। তদ্রুপ হযরত ইয়াকুব (আ.) এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, ইউসুফ (আঃ) কে বাঘে খায়নি, তাঁর সন্তানরা মিথ্যা বলছে।

(৩) নবীর কাফনের কাপড়ও গলে যাওয়া এবং ময়লাযুক্ত হওয়া থেকে পবিত্র। দেখুন, হযরত সুলায়মান (আ.) এর পবিত্র পোষাক ছয় মাস পর্যন্ত না নষ্ট হলো, না ময়লাযুক্ত হলো, না জিনরা তার ওফাত সম্পর্কে জানতে পারলো।

(৪) দ্বীনি প্রয়োজনে নবীদের দাফন কাফনে বিলম্ব করা আল্লাহ তাআলার সুন্নাত। দেখুন! আল্লাহ তাআলা বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ শেষ হওয়ার জন্য হযরত সুলায়মান (আ.) কে ওফাতের পর ছয় মাস পর্যন্ত কাফন-দাফন ব্যতীত রেখে দিয়েছেন। তদ্রুপ সাহাবায়ে কিরামের খিলাফত নির্ণয়ের জন্য হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাফন-দাফনে বিলম্ব করা যথার্থ ছিলো। কেননা খিলাফাতের বিষয়টি পূর্ণ মীমাংসা করা মসজিদের নির্মাণ কাজের পূর্ণতা দানের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

(৬) হার্ট ফেল অর্থাৎ হঠাৎ মৃত্যু আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জন্য রহমত। দেখুন! হযরত সুলায়মান (আ.) এর ওফাত হঠাৎ হয়েছিলো; কিন্তু তা রহমত ছিলো। হ্যাঁ গাফিলদের জন্য তা শাস্তিই বটে। কারণ এতে সে তাওবা করার সময় পায়না। সুতরাং হাদীস শরীফটি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট।

ওহাবীরা! বলো কুরআন ও হাদীসের এমন ঈমান সতেজকারী ও তত্ত্বসমৃদ্ধ মাসআলা কোন ওহাবীর মাথায় কি কভু এসেছে? এ অনুকম্পা তো আল্লাহ তাআলা কেবল মুকাল্লিদগণকেই দান করেছেন। তোমরা তো শুধুমাত্র ভুল-ভ্রান্তি পূর্ণ অনুবাদ করতেই শিখেছো।

হানাফী ভাইয়েরা! এক, যদি আপনারা এমন হাজারো তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ প্রেমময় ঈমানী মাসআলা সমূহ দেখতে চান,তাহলে আমার প্রণীত কুরআনের উর্দূ হাশিয়া এবং বুখারী শরীফের আরবী হাশিয়া অধ্যয়ন করুন।

দুই, কুরআন ও হাদীস ঈমানী রোগের ঔষধ। যেখানে ইউনানী ঔষধ কোন ব্যক্তি নিজ ইচ্ছামতো সেবন করতে পারে না, করলে জীবনের পাঠ চুকে যায়, তেমনি ভাবেই কুরআন ও হাদীস থেকে সবাই মাসআলা উদ্ভাবন করতে পারে না। যদি করে তাহলে ওহাবীদের মতো ঈমান হারিয়ে বসবে।

তিন, কুরআন ও হাদীস হলো সমুদ্র। যেমনি ভাবে সমুদ্র থেকে সবাই মুক্তা আহরণ করতে পারে না, তদ্রুপ কুরআন ও হাদীস থেকেও সবাই মাসআলা উদ্ভাবন করতে পারে না। সবাই সাগর থেকে মুক্তা আহরণ করতে পারে না। তবে মুক্তার দোকান থেকে নিতে পারে। একই ভাবে তোমরা কুরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা সমূহ আহরণ করতে পারবে না কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী (রহ.) প্রমুখের দরবার থেকে নিতে পারো।

চার, দুনিয়ায় প্রত্যেক ব্যক্তি কোনো না কোনো নেতার অনুসারী হয়ে থাকে। খাদ্য পাকানো, কাপড় সেলাই পরিধান ইত্যাদি মোট কথা পৃথিবীতে এমন কোন কাজ নেই, যেটার জন্য ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অনুসরণ করা হয় না। দ্বীন তথা ধর্মতো দুনিয়া থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাই দ্বীনের ক্ষেত্রে যদি সবাই লাগামহীন উটের মতো স্বাধীন ভাবে যার যে দিকে ইচ্ছা চলতে থাকে, তাহলে দ্বীন ধ্বংস হয়ে যাবে। গায়রে মুকাল্লিদ ওহাবীদের উচিত হবে পায়ে টুপি, মাথায় জুতা, শরীরের নিম্নাংশে কোর্তা, গায়ে পায়জামা পরিধান করা। কেননা সাধারণ মানুষের মতো পোষাক পরা তাকলীদ। এটা কেমন কথা যে, সব কাজে মুকাল্লিদ। শুধুমাত্র তিন চারটি মাসআলা- ইমামের পিছে

কিরাআত, উভয় হাত উত্তোলন ইত্যাদিতে গায়রে মুকাল্লিদ। গায়রে মুকাল্লিদ হলে পুরোপুরি হয়ে যাও। সব কাজ নতুন ভাবে করো, সব কথাই অদ্ভুত ভাবে বলো।

পাঁচ, বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে এমন বিরোধ দেখা যায় যে, আল্লাহর পানাহ একটি মাসআলা সম্পর্কিত সকল হাদীস যদি একত্রিত করা হয়, তাহলে মাথা চক্কর দিয়ে উঠে। যদি তাকলীদ না করা হয় শুধুমাত্র হাদীস সমূহই অনুসরণ করা হয়, তাহলে দিশাহারা ও হয়রান হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কোন ওহাবী কোন নামায এমন ভাবে পড়ে দেখাও যাতে সকল হাদীসের উপর আমল হয়। একেকটি মাসআলার ব্যাপারে দশ রকমের রিওয়ায়াত বিদ্যমান। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিতর এক রাকআত পড়তেন, তিন রাকআত পড়তেন, পাঁচ রাকআত পড়তেন, সাত রাকআত পড়তেন, নয়, দশ, এগারো, তেরো রাকআত পর্যন্ত পড়তেন। এখন গায়রে মুকাল্লিদরা এমন বিতর পড়ে দেখাও যাতে সকল হাদীসের উপর আমল হয়ে যায়।

এক ওহাবী 'আমীন' উচ্চ স্বরে পড়ার পক্ষে একটি হাদীস পড়লো । আমি 'আমীন' নীচু স্বরে পড়ার সপক্ষে পাঁচটি হাদীস পড়লাম। সে হা কার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। এটা মুজতাহিদের কাজ যে, তিনি দেখবেন কোন্ হাদীস নাসিখ তথা রহিতকারী আর কোন্ হাদীস হাদীস মানসূখ তথা রহিত। কোন্ হাদীস বাহ্যিক অর্থে প্রজোয্য আর কোন্টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। হাদীসের উপর সেই আমল করবে,যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত। যে ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রহস্যাবলী সম্পর্কে অবগত নয়, রহস্যভেদী হওয়া তার কাজ নয়।

ওহাবী এবং হাদীস

গায়রে মুকাল্লিদদের মূল নাম হলো ওহাবী। উপনাম হলো নজদী। কেননা তাদের প্রধান পূর্বসুরী হলো মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব। সে নজদের অধিবাসী ছিলো। যদি তাদেরকে প্রধান পূর্বসুরীর দিকে সম্পর্কিত করা হয়, তাহলে ওহাবী বলা যায়। আর তার জন্ম স্থানের দিকে সম্পর্কিত করলে নজদী বলা যায়। যেমন মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর উম্মতদেরকে মির্জায়ীও বলা হয়, আবার কাদিয়ানীও বলা হয়। প্রথমটি তাদের গুরুর দিকে সম্পর্কিত। আর দ্বিতীয় নামটি তার জন্ম স্থানের দিকে সম্পর্কিত। ইসলামের সকল উপদলের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো ওহাবী ফেরকা। যার উদ্ভবের ভবিষ্যদ্বাণী স্বয়ং হুযূর আনওয়ার

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছিলেন। যেমন নজদ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَيَخْرُجُ مِنْهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ-

"নজদে ভূমিকম্প ও ফিতনা ফাসাদ হবে। এবং সেখান থেকে একটি শয়তানী দলের উদ্ভব হবে।"

মোদ্দাকথা : উক্ত ফেরকার জন্মদাতা হলো মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী। হিন্দুস্তানে (উপমহাদেশে) এ দলের আমদানীকারক ও পৃষ্ঠপোষক হলো ইসমাঈল দেহলভী। উক্ত দলের পরিচিতি 'জা'আল হক্ব' প্রথম খণ্ডে দেখুন। এ ফেরকাটি সকল মুসলমানকে মুশরিক এবং শুধুমাত্র নিজেদের দলকে তাওহীদবাদী বলে থাকে, মুকাল্লিদদের জানের শত্রু এবং চার ইমাম হযরত ইমামে আযম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) প্রমুখের শানে এমন বিদ্বেষ পোষণ করে, যেমন শিয়ারা সাহাবায়ে কিরামের শানে করে থাকে।

কিন্তু নিজেদের অপরাধ ঢাকার জন্য নিজেদেরকে আহলে হাদীস বা হাদীসের উপর আমলকারী বলে। এরা আগে বেশ গর্বের সাথেই নিজেদেরকে ওহাবী নামে পরিচয় দিতো। যেমন, তাদের অনেক বইয়ের নাম 'তুহফায়ে ওহাবীয়া' ইত্যাদি । কিন্তু এখন 'ওহাবী' নামে বিরক্তি বোধ করে। তাদের আক্বীদা ও আমল সমূহ একেবারে দুর্গন্ধময়, ইসলামও মুসলমানদের আঁচলে কুৎসিত কলংক। আমরা এখানে 'আহলে হাদীস' নামটি নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা করছি। যাতে উদ্ভাসিত হয় যে, তাদের নামটিও ভুল। মুসলিম ভাইদের থেকে ইনসাফ আশা করবো। আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর মাহবূব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে কবূল হোক এ প্রার্থনা করছি।

স্মর্তব্য যে, পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিই আহলে হাদীস কিংবা হাদীসের উপর আমলকারী হতে পারেন না, কেউ আহলে হাদীস বা হাদীসের উপর আমলকারী হওয়া এমনই অসম্ভব যে, যে রকম অসম্ভব দুটি পরস্পর বিরোধী বা বিপরীত বস্তু একত্রিত হওয়া। কেননা হাদীসের শাব্দিক অর্থ হলো 'কথা', সংলাপ কিংবা বাক্য। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ-

"অতঃপর কুরআনের পরে কোন্ কথার উপর ঈমান আনবে?" (সূরা মুরছালাত, আয়াত : ৫০)

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ

"আল্লাহ তাআলা সর্বাপেক্ষা উত্তম কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।" (সূরা যুমার, আয়াত : ২৩)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

"এবং কিছু লোক খেলাধুলার বিবরণ, গল্প কাহিনী ক্রয় করে, যেন আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়।" (সূরা লুকমান, আয়াত : ৬)

এ তৃতীয় আয়াতে উপন্যাস গল্প কাহিনীকে 'হাদীস' বলা হয়েছে।

শরীয়তের পরিভাষায় হাদীস বলা হয়, যেটাতে হুযূর সাইয়িদে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা, কাজ, একই ভাবে সাহাবায়ে কিরামের কথা ও শব্দের বর্ণনা রয়েছে।

এখন হাদীসের উপর আমলকারী উক্ত দলের প্রতি প্রশ্ন হলো, তোমরা কোন ধরনের হাদীসের উপর আমলকারী, শাব্দিক অর্থে,না পারিভাষিক অর্থে? যদি শাব্দিক অর্থে হাদীসের উপর আমল করো তাহলে প্রত্যেক উপন্যাসিক, গল্পকারই আহলে হাদীস। যদি পারিভাষিক অর্থে হাদীসের উপর আমলকারী হও, তাহলে প্রশ্ন হলো, প্রত্যেক হাদীসের উপর আমল করো, না কিছু হাদীসের উপর? কিছু হাদীসের উপর আমল করা তো সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তিই হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোন না কোন নির্দেশ পালন করে থাকে। যেমন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন- 'সত্য মুক্তি দেয়, মিথ্যা ধ্বংস করে দেয়।" প্রত্যেক মুশরিক ও কাফির এটা মানে। সুতরাং তারা সকলেই আহলে হাদীস হয়ে গেলো।

তোমরা হানাফী, শাফিঈ, মালিকী, হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী মুসলমানদেরকে আহলে হাদীস মনে করো না কেন? তারা তো হাজার হাজার হাদীসের উপর আমল করে থাকে।

আর যদি 'আহলে হাদীস' মানে সকল হাদীসের উপর আমলকারী হয়, তাও অসম্ভব। কেননা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কিছু হাদীস মানসূখ তথা রহিত আর কিছু নাসিখ। কিছু হাদীসে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এমন কিছু বিশেষ আমল শরীফ বর্ণিত হয়েছে, যা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য মুবাহ কিংবা ফরয ছিলো। তা

আমাদের জন্য হারাম।

যেমন, মিম্বরের উপর নামায পড়া, উটের উপর বসে তাওয়াফ করা, সাইয়িদুশ শুহাদা হযরত হুসাইন (রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু) এর জন্য সিজদা দীর্ঘ করা, হযরত আমামা বিনতে আবিল আস'কে কাঁধে নিয়ে নামায পড়ানো, নয় জন বিবি বিবাহাধীন রাখা, মোহর ছাড়া শাদী হওয়া, পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে সমতা দান ওয়াজিব না হওয়া ইত্যাদি। এমনকি হাদীসের দ্বারা এটাও প্রমাণিত যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কালিমা পড়তেন যে, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَإِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ। "আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল।"

এখন গায়রে মুকাল্লিদরা এ হাদীসের ভিত্তিতে নিজেরাও কালিমা পড়ুক। তখন দেখতেন মির্জা কাদিয়ানীর মতো পুরো বিশ্ব তাদেরকে কিধরণের ধিক্কার ও অভিশাপ দেয়।

মোট কথা, হাদীসে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এমন সব আমল ও বাণীর উল্লেখ রয়েছে, যা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য অনুপম বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব আর আমাদের জন্য কুফর।

তদ্রূপ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঐ সব পবিত্র কাজ যা বিস্মৃতি কিংবা ইজতিহাদগত খাতা'র কারণে সংঘটিত হয়েছে। যা হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে, হাদীসের উপর আমলকারী দাবীদারদের উচিত ওগুলোর উপরও আমল করা। যাতে সব হাদীসের উপর আমল হয়ে যায়।

কোন ব্যক্তি সকল হাদীসের উপর আমল করতে পারে না। যারা এ অর্থে নিজেদেরকে আহলে হাদীস বা হাদীসের উপর আমলকারী বলে তারা মিথ্যুক। যখন তাদের নামই অসত্য ও ভুল, সুতরাং আল্লাহর ফজলে কাজও সবটাই মিথ্যাই হবে। এ জন্য হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ-

"তোমাদের জন্য আবশ্যক হলো আমার ও খোলাফা-ই রাশিদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরা।" এটা বলেননি যে, তোমরা আমার হাদীসকে অবশ্যই আঁকড়ে ধরো। কেননা প্রত্যেক হাদীস আমলযোগ্য নয়, সকল সুন্নাত আমলযোগ্য।

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঐ সব পবিত্র আমল, যা মানসূখ ও হয়নি, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য নির্দিষ্টও নয়,

বিস্মৃতি বা ভুলের কারণে সংঘটিত হয়নি, বরং উম্মতের জন্য আমলের উপযোগী সে গুলোকেই সুন্নাত বলা হয়। তাই আমাদের নাম 'আহলে সুন্নাত' সম্পূর্ণ সঠিক ও যথার্থ। কারণ আমরা আল্লাহর কৃপায় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সকল সুন্নাতের উপর আমলকারী। অপরদিকে ওহাবীদের 'আহলে হাদীস' নামটা একেবারে ভুল। কারণ সব হাদীসের উপর আমল করা অসম্ভব।

এখন হাদীস সমূহের বিচার-বিশ্লেষণ যেমন কোন্ হাদীস মানসূখ, কোন্‌টি 'মুহকাম' কোন্‌টি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য নির্দিষ্ট, কোন্‌টি সকলে মেনে চলার উপযোগী, কোন্ কাজ তাঁর অনুপম ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত আর কোন্‌টি নয়, কোন্ নির্দেশের কি উদ্দেশ্য, কোন্ হাদীস থেকে কোন্ মাসআলা স্পষ্টতঃ কোন্‌টি নির্দেশসূচক, কোন্‌টি ইখতিয়ার হিসাবে সাব্যস্ত, তা ইমাম মুজতাহিদই বলতে পারেন। আমাদের মত সাধারণ লোকেরা সে পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। যেমন, কুরআনের উপর আমল করানো হাদীসের কাজ। তেমনি হাদীসের উপর আমল করানো ইমাম মুজতাহিদের কাজ। এটাই বুঝুন যে, হাদীস শরীফ হচ্ছে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা এবং ইমাম মুজতাহিদগণ সে রাস্তার আলোকবর্তিকা। আলো ছাড়া যেমন পথ অতিক্রম করা যায় না, ইমাম ও মুজতাহিদ ছাড়া সুন্নাতের উপর আমল করা অসম্ভব। এ জন্য আলিমগণ বলেন-

اَلْقُرْاٰنُ وَالْحَدِيْثُ يُضِلَّانِ اِلَّا بِالْمُجْتَهِدِ-

"মুজতাহিদ ছাড়া কুরআন ও হাদীস গোমরাহীর কারণ।"

আল্লাহ তাআলা কুরআন করীম সম্পর্কে বলেন-

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا-

"আল্লাহ তা দ্বারা অনেককে গোমরাহ করেন এবং অনেককে হিদায়ত করেন।" (সূরা বাক্বারা, আয়াত : ২৬)

'চকড়ালভী' নামক ফেরকাটি এ জন্যই পথ ভ্রষ্ট যে, তারা কুরআন শরীফ বুঝতে চায় হাদীসের নূর ছাড়াই এবং সোজা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছ'তে চায়। ওহাবী গায়রে মুকাল্লিদ এ জন্যই পথ ভ্রান্ত যে, তারা হাদীসকে ইলমের প্রভা এবং ইমাম মুজতাহিদের আলো ব্যতীত অনুধাবন করতে চায়। মুকাল্লিদে আহলে সুন্নাত ইনশাআল্লাহ মুক্তি প্রাপ্ত দল। কারণ তাদের সাথে আল্লাহর কিতাব, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত এবং উম্মতের প্রদীপ ইমাম মুজতাহিদগণও আছেন।

আলোচনার সার সংক্ষেপ হলো, 'আহলে হাদীস' হওয়া অসম্ভব ও মিথ্যা। 'আহলে সুন্নাত' হওয়া হক্ব ও সঠিক। আহলে সুন্নাত সেও হতে পারে, যে কোন ইমামের অনুসারী হয়।

কিয়ামতে আল্লাহ তাআলাও তাঁর বান্দাদেরকে তাঁদের ইমামদের সাথে ডাকবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ

"যে দিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের ইমাম (নেতা) সহকারে আহবান করবো, ..." (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৭১)

স্মরণ রাখুন! কুরআন ও সুন্নাতের সমুদ্র আমরা মুকাল্লিদরাই পাড়ি দিতে পারি। আবার গায়রে মুকাল্লিদরাও ঐ সাগর পাড়ি দিতে চায়। কিন্তু আমরা পাড়ি দিই তাকলীদের জাহাজে চড়ে, যার কাপ্তান হলেন ইমাম আযম হযরত আবূ হানীফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)। তাঁর নেতৃত্বেই আমরা এ দুঃসাহসিক সফর করে থাকি। গায়রে মুকাল্লিদ ওহাবীরা নিজেদের উপর ভরসা করেই যাত্রা করে। ইনশাআল্লাহ মুকাল্লিদরা বিপদমুক্ত আর ওহাবীদের পরিণতি হচ্ছে নিশ্চিত নিমর্জ্জন।

আল্লাহর শোকরিয়া যে, এ কিতাবটি ১ রমাদ্বান ১৩৭৬ হিজরী, এপ্রিল ১৯৫৭ ঈসায়ী তারিখে শুরু করে ২ জিলহজ্ব ১৩৭৬ হিজরী, ১ জুলাই ১৯৫৭ ঈসায়ী সন রোজ সোমবার অর্থাৎ তিন মাস দু'দিনে সমাপ্ত হলো। আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাদকায় এটা কবূল করুন। আমার গুনাহ্র কাফ্ফারা ও সাদকায়ে জারিয়াহ এবং মুসলমানদের জন্য এটাকে উপকারী বানিয়ে দিন। যে কেউ এ কিতাব থেকে কিছুটা উপকৃত হলে এ গুনাহগারের জন্য উত্তম পরিণাম ও গুনাহ মাফের জন্য দু'আ করবেন। এ আশা নিয়েই আমি এ কষ্টটুকু করেছি।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰي عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ – اٰمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰاحِمِيْنَ–

আহমদ ইয়ার খান নঈমী আশরাফী বাদায়নী, ২ যিলহজ্ব ১৩৭৬ হিজরী, রোজ সোমবার মুবারক মুতাবিক ১ জুলাই ১৯৫৭ ঈসায়ী।

হযরত ইমাম আজম আবু হানিফা (রাদ্বি.) এর প্রশংসাপূর্ণ মর্যাদার বিবরণ

মাযহাব বিরোধী ওহাবীরা হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর কট্টর শত্রু হিসেবে পরিচিত। তারা তাঁর বিভিন্ন মাসয়ালার উপর কটুক্তি ও বিদ্রূপ করে থাকে। তন্মধ্যে তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর জন্ম তারিখ কুকুর এবং ওফাতের তারিখকে বোকা লিখতে দুঃসাহস করেছে। (নাউযুবিল্লাহ)। এর উত্তরে কোন কোন হানাফী মাযহাবের অনুসারী ওলামা বলেছেন ওহাবী এবং মুর্দা খেকো জন্তু এর আবজাদ সংখ্যা ২৪ (চব্বিশ)। গিদ নামক জন্তু মূর্দাখোর আর এরাও আগের যমানার বুজুর্গগনের গীবতকারী হিসেবেও মুর্দাখোর। গীবত বা পরনিন্দাকে কোরআন মজীদ মৃত ভাই এর গোশত খাওয়ার শামিল বলে ঘোষণা করেছে। উল্লেখ্য ওহাবী শব্দের আবজাদ সংখ্যা হচ্ছে ২৪ চব্বিশ। ইঁদুর শব্দের আবজাদ সংখ্যাও ২৪। ওহাবীরা ইঁদুরের মতই দ্বীন ইসলামকে কেটে কেটে নষ্ট করছে, আর মুর্দাখোর জানোয়ারের মত গীবত করে মরা লাশের গোশত আহার করছে। এতে আমি অন্তরে ব্যথা পেয়েছি। তাই আমার দৃঢ় ইচ্ছা হলো, এ মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারীর কিছু হালাত ও মর্যাদা মুসলমানদের সামনে তুলে ধরবো এবং বলবো যে, ইসলাম ধর্মে তাঁর মান ও মর্যাদা কতটুকু।

যেন আল্লাহ তা'আলা এ বুজর্গগণের প্রশংসা আমার গুনাহ সমূহের কাফফারা করে দেন। এবং আমাকে এ মহান বুজুর্গগনের গোলাম হিসেবে হাশর নছীব করুন।

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ : আমাদের ইমামের মর্যাদাপূর্ণ জীবনী শ্রবন করে ঈমানকে তাজা করুন।

ইমাম আজমের নাম ও বংশ পরিচিতি : হযরত ইমাম আবু হানীফার পবিত্র নাম নো'মান ইবনে সাবেত ইবনে জওত্বী। হযরত জওত্বী অর্থাৎ হযরত ইমাম আজম এর দাদাজান ফার্সী বংশদ্ভূত, তিনি হযরত আলী (রাদ্বি.) এর আশেক ও তাঁর খাছ ঘনিষ্টজনদের অন্যতম ছিলেন। তাঁরই মহব্বতে কুফা নগরকেই নিজ বাসস্থান হিসেবে এ জন্য বেছে নেন যে কুফা ছিল হযরত আলী (রাদ্বি.) এর রাজধানী। হযরত জওত্বী তাঁর প্রিয় শিশু সন্তান হযরত সাবেতকে হযরত আলী মুরতাজা (রাদ্বি.) দরবারে দোয়ার জন্য নিয়ে যান। হযরত আলী মুর্তাজা সাবেত এর জন্য দোয়া করেন এবং অনেক বরকত লাভের শুভ সংবাদ দেন। বস্তুতঃ হযরত ইমাম আজম স্বয়ং হযরত আলী মুর্তাজা (রাদ্বি.)

এরই কারামত ও সুসংবাদের জলন্ত প্রমান। হযরত ইমাম আবু হানিফা ৮০ হিজরীতে কুফায় জন্ম গ্রহন করেন। এবং ১৫০ হিজরীতে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। খেইরযান কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর কবর শরীফ সর্বস্তরের মুসলমানের জেয়ারত গাহ্ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর বয়স ৭০ বছর। হযরত ইমাম আজম অনেক ছাহাবায়ে কেরামের যুগ পেয়েছিলেন, তন্মধ্যে তিনি চারজন প্রখ্যাত ছাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাঁরা হলেন হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাদ্বি.), যিনি বসরায় ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা, (রাদ্বি.), যিনি কুফায় ছিলেন। হযরত সুহাইল ইবনে সায়াদ সায়েদী (রাদ্বি.), যিনি মদীনা মুনাওয়ারায় থাকতেন। হযরত আমের ইবনে ওয়াছেলা (রাদ্বি.), যিনি মক্কা মুয়াজ্জমায় বাস করতেন। এ সর্ম্পকে আরও অনেক রেওয়ায়েত আছে। তবে এ রেওয়ায়েতটিই সর্বাধিক গ্রহনযোগ্য।

হযরত ইমাম আজম হযরত হাম্মাদ ও হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাদ্বি.) এর প্রিয় ছাত্র এবং বিশেষ সহচার্য লাভ করেন। দু'বছর হযরত ইমাম জাফর ছাদেক (রাদ্বি.) এর সোহবত লাভে ধন্য হন। বাদশাহ মনছুর হযরত ইমাম আজমকে কুফা থেকে বাগদাদে এনে প্রধান বিচার পতির পদবী গ্রহন করার জন্য দরখাস্ত করতে বললে তিনি সে পদ গ্রহনে অস্বীকৃতি জানান। এতে বাদশাহ ক্ষুদ্ধ হয়ে তাঁকে জেলে বন্দী করেন এবং বন্দী অবস্থায় এলম ও আমল এর এ সূর্য চির তরে অস্তমিত হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

ইমাম আজম এর মর্যাদাময় জীবনী : ব াস্তবতা এ যে, হযরত ইমাম আজম(রাদ্বি.) এর মর্যাদাপূর্ণ জীবনী বর্ণনা করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে। হযরত ইমাম আজম হলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন্ত মু'জেযা এবং হযরত আমীরুল মুমেনীন আলী মুরতাজা হায়দরে কাররার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর কারামত। তিনি উম্মতে মোহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চেরাগ, ইসলাম ধর্মীয় সকল জটিলতা নিরসনকারী। আলহামদুলিল্লাহ! আহলে সুন্নাত হানাফী গণ অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আমাদের রসূল রসূলে আজম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, আমাদের পীর গাউছে আজম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আমাদের ইমাম ইমামে আজম। মহত্ত্ব ও মর্যাদা আমাদেরই ভাগ্যে জুটেছে। আল্লাহ তা'আলার ফজল ও করমে আমি বরকত লাভের জন্য কিছু বিবরণ পেশ করব হানাফীগণ শুনুন এবং আনন্দ লাভ করুন।

(এক) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইমাম আজম (রাদ্বি আল্লাহু তা'আলা আনহু) এর শুভসংবাদ ও মর্যাদা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছেন।

www.AmarIslam.com

ইমাম মুসলিম ও বুখারী হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বি.) হতে আর ইমাম তিবরানী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বি.) হতে আবু নঈম, শিরাজী ও তিবরানী কায়েস ইবনে সাবেত ইবনে উবাদাহ হতে রেওয়ায়েত করেছেন :

لَوْ كَانَ اْلاِ يْمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ اَبْنَاءِ فَارِسٍ وَفِىْ رِوَايَةِ الْبُخَارِىْ وَالْمُسْلِمِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ كَانَ الدِّيْنُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رَجُلٌ مِّنْ فَارِسٍ-

অর্থাৎ : যদি 'ঈমান' সুরাইয়া তারকার নিকট হতো, তা হলে ফার্সী বংশোদ্ভূত কোন কোন ব্যক্তি তথা হতে তা নিয়ে আসতো। মুসলিম ও বুখারীর অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, শপথ ঐ পবিত্র সত্ত্বার, যার কুদরতি হাতে আমার প্রান রয়েছে, যদি দীন (ইসলাম) উর্দ্ধাকাশের সুরাইয়া নামক তারকার নিকট ঝুলন্ত থাকতো, তাহলে ফার্সী দেশের এক ব্যক্তি উহাকে অবশ্যই লাভ করতো।

বলুন ফার্সী বংশে এমন মর্যাদা সম্পন্ন ইমাম আবু হানিফা নু'মান ইবনে সাবেত (রাদ্বি.) ব্যাতিত আর কে হয়েছেন?

(দুই) আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী শাফেয়ী (রহ.), হযরত ইমাম আজম (রাদ্বি.) এর ফজিলত বিষয়ে একটি কিতাব লিখেন, যার নাম হচ্ছে "খাইরাতুল হামসান ফি তরজুমাতে আবি হানিফাতান নু'মান" তিনি এ কিতাবে একটি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

تُرْفَعُ زِيْنَةُ الدُّنْيَا سَنَةَ خَمْسِيْنَ وَمِاْئَةٍ

অর্থাৎ : দেড়শত হিজরী সনে দুনিয়ার সৌন্দর্য তুলে নেয়া হবে। হিজরী দেড়শত সালেই হযরত ইমাম আজম (রাদ্বি.) এর ওফাত হয়েছিল। বুঝা গেল যে, ইমাম আজম পৃথিবীতে শরীয়তের সৌন্দর্য, ইলম ও আমলের উজ্জল প্রদীপ ছিলেন। ইমাম করদরী (রহ.) বলেছেন, এ হাদীস দ্বারা ইমাম আবু হানিফার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(তিন) ইসলামী বিশ্বে হযরত ইমাম আজম (রাদ্বি.) সর্ব পথম এমন এক আলেমে দ্বীন ছিলেন, যিনি ইলমে ফেক্হ এবং ইজতিহাদ (গবেষণা) এর মূল ভিত্তি স্থাপন করে রছুলে পাকের সমস্ত উম্মতের উপর মহান ইহসান করেছেন। অবশিষ্ট সকল ইমামগণ যথা ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) প্রমূখ ঐ ভিত্তির উপরই এমারত কায়েম করেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইসলাম ধর্মে যে ব্যক্তি কোন ভাল সৎপন্থা আবিস্কার করবে, তাহলে নিজে ঐ ভাল কাজের ছাওয়াব এবং সকল

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমলকারীর ছাওয়াব লাভ করবে।

(চার) হযরত ইমাম আজম (রাদ্বি.) বিশ্বের সমস্ত হাদীস ও ফেকহ বিশারদগনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষাগুরু। এরা সবাই ইমাম আজম (রাদ্বি.) এর শিষ্য। যেমন হযরত ইমাম শাফেয়ী, হযরত ইমাম মোহাম্মদ এর সৎ ছেলে এবং ছাত্র। তেমনি ভাবে ইমাম মালেক হযরত ইমাম আজম(রাদ্বি.) এর রচিত কিতাবাদি থেকে ফয়েজ লাভ করেছেন। হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) মুহাদ্দিছ গনের উস্তাদ আর ইমাম বুখারী (রহ.) এর বহু উস্তাদ হানাফী মাজ হাবের অনুসারী ছিলেন। বস্তুতঃ ইমাম আজম জ্ঞানাকাশের সূর্য। আর অবশিষ্ট সবাই তারকা সদৃশ।

(পাঁচ) ইমাম আজম (রাদ্বি.) এর সরাসরি শিষ্য সংখ্যা লক্ষাধিক। তম্মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছেন মুজতাহিদ। যথা ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম যুফার ও ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক প্রমুখ জ্ঞান জগতের উজ্জল তারকা ছিলেন। হযরত ইমাম মোহাম্মদ নয়শত নব্বইখানা জগদ্বিখ্যাত কিতাব লিখেছেন। তম্মধ্যে ছয় খানা কিতাব সর্বোচ্চমানের ছিল। যে গুলোকে 'কুতুবে জাহেরির রেওয়ায়েত" বলা হয়। এ কিতাব গুলো ফিকহ শাস্ত্রের মূল ভিত্তি হিসেবে সমাদৃত।

(ছয়) সমস্ত নবীগণের সরদার চারজন নবী। আসমানী গ্রন্থ সমূহের সেরা গ্রন্থ চারটি। ফেরেস্তাগনের সরদার হচ্ছেন চারজন। সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হচ্ছেন চারজন। গবেষণাকারী উলামাগনের সেরা হচ্ছেন চার ইমাম। উপযুক্ত চার নবীর মধ্যে সর্বোত্তম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। চারটি কিতাবের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে কোরআন মজীদ। চার ফেরেশতার মধ্যে সর্বোত্তম হযরত জিবরাঈল। চার সাহাবীর মধ্যে সর্বোত্তম হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাদ্বি.) । চার ইমামের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছেন হযরত ইমাম আজম (রাদ্বি.) । এ জন্যে হযরত ইমাম শাফেয়ী (রাদ্বি.) বলেছেন, সমস্ত ফকীহগণ হযরত ইমাম আবু হানিফা (রাদ্বি.) এর সন্তান আর তিনি হলেন তাদের পিতা।

(সাত) ইমাম আজম যেমনিভাবে জ্ঞানাকাশের সূর্য ছিলেন, তেমনি ভাবে আমল ও এবাদতের দিক দিয়ে সবার সেরা ছিলেন। যথা: তিনি একাধারে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এশার নামাযের অযু দিয়ে ফজর নামায আদায় করেছেন। চল্লিশ বৎসর যাবত এমন ভাবে রোজা রেখেছেন, তা কেউ টের পায়নি। তাঁর ঘর থেকে খাবার এনে বাইরে ছাত্রদেরকে দিয়ে দিতেন। ঘরের লোকজন মনে করতেন, তিনি ঘরে না খেয়ে বাইরে কোথাও আহার করতেন। বাইরের

লোকজন মনে করতো, তিনি ঘর থেকে আহার গ্রহন করেই তশরীফ এনেছেন। তিনি সর্বদা রমজান মাসে কুরআন মজীদ একষট্টি বার খতম করতেন। এক খতম দিনে আর এক খতম রাতে এবং এক খতম তারাবিহ এর জমাআতে সকল মুক্তাদিগনের সাথে করতেন। পঞ্চান্নবার হজ্ব করেছেন।

(আট) হযরত ইমাম আজম (রাদ্বি.) এর "মাজার শরীফ" দোয়া কবুল হওয়ার স্থান হিসেবে প্রসিদ্ধ। এ প্রসংগে হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, যখন আমার কোন প্রয়োজন হতো, তখন আমি বাগদাদ শরীফে ইমাম আজম (রাদ্বি.) এর মাজার শরীফে হাজির হতাম এবং দু'রাকাত নফল নামায পড়ে ইমাম আজম এর মাজার শরীফ এর উছিলা ধরে দোয়া করতাম। এতে খুব দ্রুত আমার উদ্দেশ্য সফল হতো। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম আজম এর মাজ ারে আসলে হানাফী মাজহাব অনুযায়ী নামায পড়তেন; কুনুতে নাযেলা পড়তেন না। কেউ তাঁকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি বলেন, এ কবরবাসীর প্রতি সম্মান ও আদব রক্ষার্থে আমি এ ভাবে করে থাকি। (শামী)

উল্লেখ্য, এর অর্থ এ নয় যে, ইমাম শাফেয়ী বাগদাদ শরীফে ইমাম আজম এর মাযার শরীফের আদব রক্ষার্থে সুন্নত বর্জন করতেন। বরং এর অর্থ হচ্ছে যে, কোন মাজহাবের ইমাম বা অনুসারী এ কথা দৃঢ়ভাবে বলতে পারে না, আমি সত্যের উপর রয়েছি আর অন্যান্য ইমামগণ ভুলের মধ্যে রয়েছে। বরং তাঁর নিজ মাজহাব হক হওয়ার ব্যাপারে প্রবল ধারণা পোষণ করেন এবং তাঁরা এটাও বলেন, অন্য ইমামের মতামতও সঠিক হতে পারে।

সকল ইমামগণ আক্বায়েদের মাসয়ালার ব্যাপারে সুদৃঢ় বিশ্বাসের উপর রয়েছেন। আর অন্যান্য বিষয়ে নিজস্ব ধারনার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।

আসলে ইমাম শাফেয়ী এখানে উপস্থিত হয়ে ঐ কাজ বা আমল করতেন, যা ইমাম আজম সুন্নাত হিসেবে পালন করতেন। ফলাফল হলো একটি সুন্নাত বর্জন করে আরেকটি সুন্নাত এর উপর আমল করা হলো, যাতে অভিযোগ করার কোন অবকাশ থাকলো না।

(নয়) ইমাম আযম (রাদ্বি.) স্বপ্ন যোগে আল্লাহ তাআলাকে একশত বার দেখেছেন। সর্বশেষ দীদার কালীন আল্লাহ তাআলার দরবারে যে দোয়া তিনি জানতে চেয়েছেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা 'রদ্দুল মুখতার' নামক ফতোয়ার কিতাবে বিস্তারিতভাবে আছে।

(দশ) উম্মতে মুহাম্মদিয়ার জগদ্বিখ্যাত আল্লাহর অলী, গাউছ, কুতুব, আবদাল, আওতাদ গনের সবাই, ইমাম আজম (রাদ্বি.) এর দামান ধরেছিলেন এবং তাঁরই মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। যত সংখ্যক আওলিয়া কেরাম হানাফী

মাজহাবের অনুসারী রয়েছেন, অন্য মাজহাবে এত সংখ্যক আওলিয়া কেরামের অস্তিত্ব নেই। যথা- হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম, হযরত শকীক বল্খী, হযরত মা'রুফ কারখী, হযরত বায়েজীদ বোস্তামী, হযরত ফুজায়েল ইবনে এয়াজ খোরাসানী, হযরত দাউদ ইবনে নসর, হযরত ইবনে নছীর ইবনে সুলায়মান ত্বায়ী, হযরত আবু আমেদ লুফাফ খায্‌রাযী বলখী, হযরত খলফ ইবনে অছিউব, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক অলী, ফকীহ, মুহাদ্দিস, হযরত ওয়াকী ইবনে জরেরাহ, শায়খুল ইসলাম হযরত আবু বকর ইবনে ওয়ারাক তিরমিযী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমের মত আওলিয়া কেরামের সরদারগণ সবাই হানাফী মাজহাবের অনুসারী হিসেবেই প্রসিদ্ধ।

বস্তুত: হানাফী মাযহাব আওলিয়া কেরামগণেরই মাজহাব। বর্তমানেও প্রায় সকল আওলিয়াগণ হানাফী মাযহাবেরই অনুসারী। পাক-ভারতের গর্ব হযরত দাতা গঞ্জ বখ্‌শ আলী হাজবিরী (রহ.) যার আস্তানা শরীফ (ধর্ম বর্ণ) নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রত্যাবর্তনস্থল, তিনিও হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি তাঁর রচিত 'কাশফুল মাহজুব' নামক কিতাবে হযরত ইমাম আজম (রাদ্বি.) এর বড় বড় মর্যাদার কথা নিজ আধ্যাত্মিক জ্ঞান দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে চিশতিয়া, কাদেরীয়া, নকশবন্দীয়া ও সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকার সকল ইমাম ও বুজর্গগণ হানাফী মজহাবের অনুসারী।

(এগার) হযরত ইমাম আজম (রাদ্বি.) এর মজহাব সারা বিশ্বে এমন ভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে, যেখানে ইসলাম সেখানেই হানাফী মাজহাব সমাদৃত। বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান হানাফী মাজহাবের অনুসারী। মক্কা মুয়াজ্জমা ও মদীনা মুনাওয়ারায়ও অধিকাংশই হানাফী মাজহাবের অনুসারী। বরং ইসলামী বিশ্বের কোন কোন জায়গা এমনও আছে, যেখানে শুধু হানাফী মজহাবের চর্চা রয়েছে। অন্য মাযহাব সম্পর্কে মুসলিম জনসাধারন কিছুই জানেন না। যথা বলখ, বুখারা, কাবুল, কান্দাহার সহ প্রায় সমগ্র হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানে শাফেয়ী, হাম্বলী ও মালেকী মাযহাবের অনুসারী নাই বললেই চলে। কতিপয় মাযহাব বিরোধী ওহাবী মাঝে মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তবে এদের সংখ্যা এত নগন্য যে এদের অস্তিত্ব নাথাকার মতই। সুতরাং হানাফী মাযহাব সর্বজন গৃহীত হওয়ায় প্রতিয়মান হলো ইমাম আজম (রাদ্বি.) আল্লাহ তা'লার দরবারে গৃহীত ও সমাদৃত।

(বার) ইমাম আজম (রাদ্বি.) এর বিপক্ষের উলামাগনও তাঁর মর্যাদা ও প্রশংসামূলক অনেক আজিমুশ্‌শান কিতাব রচনা করেছেন যেমন : আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী, 'খাইরাতুল হেসান ফি তরজুমাতে আবি হানিফা আন্ নো'মান' আর

www.AmarIslam.com

সিবত্বে ইব্‌নে জু'যী 'আল ইন্‌তিছার আল-ইমাম আইম্মাতুল আমছার' বিরাট দুই খণ্ড লিখেছেন। ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী শাফেয়ী 'তাব্‌য়াদ্দু হাইীফা ফি মানাক্বেবে আবি হানিফা লিখেছেন। আল্লামা ইউসুফ ইবনে আবদুল হাদী হাম্বলী 'তানবীরুস ছহীফা ফি তারজুমাতে আবি হানিফা' লিখেছেন, যার মধ্যে হযরত ইবনে আবদুল্লাহর রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি ইমাম আবু হানিফার মত আলেম ফেক্বহ বিশারদ ও খোদাভীরু ব্যক্তি দেখিনি। বস্তুতঃ পূর্বের সম্মানিত উম্মতের উলামাগণ ইমাম আবু হানিফার মর্যাদা ও বুজুর্গীর স্বাক্ষী হয়ে আছেন। যদি মুষ্টিমেয় নগন্য সংখ্যক লোক তার শানে কোন বাক বিড়ম্বনা লিপ্ত হয়, তার কিই বা গ্রহনযোগ্যতা থাকতে পারে? বাদুড় যদি প্রজ্জলিত সূর্যের সমালোচনা করে, তাতে সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে না। যেমন বর্তমানে রাফেজী উলামারা হযরতে সাহাবায়ে কিরামের শানে অশালীন কথা বলে থাকে, তেমনি ভাবে মাযহাব বিরোধী ওহাবীরাও ইমাম আজম এর শানে বেয়াদবী করছে।

(তের) সমস্ত মুজতাহিদ ইমামগনের মধ্যে হযরত ইমাম আবু হানিফার যুগ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগের অনেক কাছাকাছি। তাঁর জন্মকাল আশি হিজরী। তিনি তাবেয়ী। চারজন সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস রেওয়ায়েত ও সাক্ষাৎ লাভ করেছেন।

যারা তাঁর তাবেঈ হওয়াকে অস্বীকার করেছেন, তারা শুধু বিরোধীতার খাতিরেই তা বলেছেন। হযরত সাইয়্যেদেনা আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা এর মত বিখ্যাত সাহাবী হযরত ইমাম আজম এর যুগে কুফায় থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেননি, তা কি করে হতে পারে? বুজর্গগনের স্বাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবার জন্যে বর্তমান বিশ্বের মানুষ যে ভাবে ব্যাকুল দেখা যায়, সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে তৎকালীন বিশ্ববাসী কেমন ব্যাকুল ছিল, তা আর বলার অবকাশ রাখেনা।

অতএব, তিনি যে তাবেঈ, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আর তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনেক সহীহ হাদীস লাভ করেছেন, কেননা তিনি তো সর্বোত্তম যুগের লোক ছিলেন।

উল্লেখ্য * ইমাম আজম (রাদ্বি.) এর জন্ম সাল ৮০ হিজরী, তাঁর ইন্তেকাল ১৫০ হিজরী এবং বয়স সত্তর বছর। বাগদাদ শরীফে তাঁর পবিত্র মাজার অবস্থিত। * ইমাম মালেক (রহ.) জন্ম গ্রহন করেন ৯০ হিজরীতে। তিনি ইন্‌তিকাল করেন ১৭৯ হিজরীতে। তাঁর বয়স ছিল ৮৯ বছর। মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর মাজার শরীফ অবস্থিত। * ইমাম শাফেয়ী ১৫০ হিজরীতে জন

গ্রহন করেন। তাঁর ওফাত হয়েছে ২০৪ হিজরীতে। বয়স ৫৪ বছর। তিনি ইমাম আজম এর ওফাত দিবসে জন্মগ্রহন করেন। * ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এর জন্মকাল ১৬৪ হিজরী। ইনতিকাল ২৪১ হিজরী। বয়স ৭৭ বছর।

(চৌদ্দ) হযরত ইমাম আজম (রাদ্বি.), নবীজির আহলে বায়তের বিশেষ ফয়েজ ও বরকত লাভে ধন্য হয়েছেন, যা অন্য কোন ইমাম লাভ করেননি। কেননা ইমাম আজম হযরত ইমাম জা'ফর ছাদেক (রাদ্বি.) এর পবিত্র মজলিসে দুই বছরকাল উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, لَوْ لَا السَّنَتَانِ لَهَلَكَ النُّعْمَانُ। অর্থাৎ যদি ঐ দু'বছর ছোহবত নসীব না হতো তাহলে নো'মান অর্থাৎ আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম।

(পনের) হযরত ইমাম আজম (রাদ্বি.) হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাদ্বি.) এর পরিপূর্ণ বিকাশ স্থল ছিলেন। হযরত আবু বকর ছিদ্দিক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রথম খলীফা। আর ইমাম আজম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতের মধ্যে প্রথম গবেষক। হযরত ছিদ্দিকে আকবর হলেন, কোরআন মজীদ এর বিক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপিসমূহ একত্রিতকারী। আর ইমাম আজম হলেন, ইসলামী আইন ও ধর্মীয় বিধানাবলীর একত্রিতকারী। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাদ্বি.) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর পরে সর্বপ্রথম ন্যায় ইনসাফ ও খেলাফতের বিধানাবলীর ভিত্তি স্থাপন করেন। আর ইমাম আজম গবেষণাধর্মী চিন্তাধারার বুনিয়াদ রেখেছেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাদ্বি.) উম্মতে মুহাম্মদীকে সময়োচিত সাহায্য সহানুভূতি এমনিভাবে করেছেন যে, তাদেরকে পারস্পরিক মতানৈক্য থেকে রক্ষা করেন এবং ইসলামের শৃঙ্খলা নষ্ট হতে দেননি। ইমাম আজম (রাদ্বি.) সমগ্র মুসলিম জাতির উপর এতবড় সাহায্য করেছেন যে, তাদেরকে নাস্তিকতার ঝড়ঝাপ্টা থেকে রক্ষা করেছেন। আজ তাঁরই ইলমি গবেষণামূলক ভূমিকার ফলে মুসলিম মিল্লাত কাফির ও ধর্মত্যাগীদের বহুমুখী ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ রয়েছে।

(ষোল) যেমনিভাবে হুযূর গাউসে আজম ওলীগণের সর্দার সকলের কাঁধের উপর তাঁর কদম রয়েছে, তিনি তরীকত জগতের সর্বপ্রথম ইমাম, তেমনিভাবে ইমাম আজম সমস্ত আলেমদের সর্দার। সমস্ত ওলামা তাঁরই অধীনে রয়েছে। এ জন্যে তরীকতের প্রথম ইমামের উপাধি হয়েছে গাউসে আজম আর শরীয়তের প্রথম ইমামের উপাধি ইমামে আজম (রাদ্বি.)। বাগদাদ শরীফ দুই সমুদ্রের মিলনস্থল। কেননা উভয় ইমামই তথায় চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

সমাপ্ত